বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র

বঙ্কিম-উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র

সারোয়ার জাহান

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১
জুন ১৯৮৪

বাএ/১৪৪৮
পাণ্ডুলিপি : গবেষণা উপ-বিভাগ

প্রকাশনায়
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৪২এ, কাজী আবদুর রউফ রোড
কলতাবাজার, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ-শিল্পী
প্রাণেশ কুমার মণ্ডল

মূল্য : ত্রিশ টাকা মাত্র

BANKIM UPANNASE MUSLIM PRASANGA O CHARITTRA (A Study of the Muslim Topics and Characters in the Novels of Bankimchandra) by Sarwar Jahan. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh, June, 1984. Price : Tk. 30.00 only. US Dollar 3.

www.pathagar.com

দোলা ও নীতি
যারা অকালেই চলে গেছে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে স্থূলভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : রোমান্স, ঐতিহাসিক ও সামাজিক। বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত উপন্যাসসমূহ ঐতিহাসিক শ্রেণীভুক্ত। তাদের কাহিনী মুসলমান রাজত্বের পটভূমিতে বিন্যস্ত।

যদিও প্রাগুক্ত শ্রেণীকরণ আলোচিত উপন্যাসের কয়েকটিকে (যেমন 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি) রোমান্সের অন্তর্ভুক্ত করে, তবু প্রকৃত ঐতিহাসিক এবং ইতিহাসাশ্রয়ী উভয় শ্রেণীর উপন্যাসই আমাদের আলোচনার অন্তর্গত বলে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের পংক্তিতেই তাদের স্থান চিহ্নিত করা সম্ভব। বর্তমান গ্রন্থে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ' এবং 'সীতারাম' উপন্যাস আলোচিত হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি উপন্যাসের মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র সংবলিত অংশ নিয়ে উপন্যাসের একটি কাহিনী-প্রবাহ রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কাহিনী-ধারা বজায় রাখতে গিয়ে যতোদূর সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অনুসরণ করার ফলে বর্তমান গ্রন্থে উদ্ধৃতির প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু উদ্ধৃতি-বাহুল্য স্বীকার করে নিতে হয়েছে এজন্যে যে, এর ফলে মুসলিম-প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের মনোভঙ্গিকে অবিকৃতভাবে রক্ষা করা হয়তো সম্ভব হবে।

মুসলিম প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রয়োজনবোধে বর্ণিত ঘটনা বা চরিত্রের ঐতিহাসিকতা পরীক্ষা করে দেখাতে চেয়েছি, বঙ্কিমচন্দ্র কতোখানি ইতিহাসচ্যুত বা কি পরিমাণ ইতিহাসানুগ। কল্পিত মুসলিম চরিত্র, ঘটনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সে বিষয়ে আলোকপাত করতে চেয়েছি। শেষ পরিচ্ছেদে মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করার প্রয়াস আছে।

১৯৭১-৭৪ সালে বাংলা একাডেমীর বৃত্তিগবেষক হিসেবে, 'বাংলা উপন্যাসে মুসলিম-প্রসঙ্গ ও চরিত্র' শিরোনামে একটি গবেষণা/অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শুরু করি। নানা কারণে এই পরিকল্পনা পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়। বর্তমান গ্রন্থ সেই পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র।

www.pathagar.com

পাণ্ডুলিপি জমা দেবার দশ বছর পরে বইটি বেরুলো। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থের অনেক মতামত এবং মন্তব্য পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হতে পারতো। কিন্তু আমার অজান্তেই মুদ্রণের কাজ শুরু হয়ে যাবার ফলে সেটি করা সম্ভব হলো না।

তবু বাংলা একাডেমীর গবেষণা-সংকলন-কোকলোর বিভাগের বর্তমান পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান, এই বিভাগের প্রকাশন অফিসার জনাব আবদুস সাত্তারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে শেষপর্যন্ত বইটি প্রকাশিত হলো। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই বই প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর গবেষণা বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক ডঃ বদিউজ্জামান একসময়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, এই সুযোগে তাঁকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

'ভূমিকা' লিখে দিয়ে আমার শিক্ষক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল আমাকে অনুগৃহীত করেছেন।

বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সারোয়ার জাহান

www.pathagar.com

ভূমিকা

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ শিল্প সামর্থ্য সম্পর্কে এখন আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি শুধু বাংলা উপন্যাসেরই প্রধান স্থপতি নন, বাংলা গদ্যের অপূর্ব সম্ভাবনাও তাঁর হাতেই প্রথম উন্মোচিত হয়েছিলো। উনিশ শতকের বাংলাদেশে হিন্দু মধ্যবিত্তের সমাজ সত্তায় যে-কল্পনার আশ্চর্য শিহরণ জেগেছিলো তার প্রথম অভিব্যক্তি মধুসূদনের কাব্য-সাধনায় স্পন্দিত। একই আবেগ-জীবনের অন্যতর রূপায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মেলে। বিচিত্র রাজনৈতিক-সামাজিক পট-ভূমিতে লগ্ন এই সমাজ প্রথম পর্যায়ে ইয়োরোপের নির্বিচার অনুকরণে মগ্ন; আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষায় তার মর্মমূল পর্যন্ত আলোড়িত। প্রথম পর্বে কবি মধুসূদনের আবির্ভাব তাই বিস্ময়কর নয়—আর দ্বিতীয় পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্থানও একান্তই স্বাভাবিক। মোগল ভারতের পটভূমিকায় বিন্যস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসে ও আধা-ঐতিহাসিক রোমান্সগুলিতে মুসলিম প্রসঙ্গের অবতারণা, হিন্দু রাজশক্তির গুণ-কীর্তন এবং মুসলিম চরিত্রের আপাত অবমূল্যায়ন বঙ্কিম-রচনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে সহজেই চিহ্নিত। স্বভাবতই মুসলিম মধ্যবিত্তের উন্মেষের পরে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান পাঠকের কাছে আদৌ গৃহীত হননি। বরং ইংরেজ আমলের শেষ দিকে, হিন্দুমুসলিম সম্পর্কের অবনতির কালে, বঙ্কিমের উপন্যাস সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বার বার অন্তরায় হয়েই দেখা দিয়েছে।

পাকিস্তান আমলে ঐ তিক্ততার স্মৃতি প্রবল ছিলো বলেই বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে উৎসাহ ছিলো ক্ষীণ। তরুণ আনিসুজ্জামান ১৯৫৩ সালে 'আনন্দমঠ'-এর আলোচনায় মুসলিম সমালোচকদের অনুসৃত ধারা মেনে চলেন নি বলে কেউ কেউ তাঁকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কারের কথাও বিবেচনা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর স্বাধীন বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে নিরাবেগ ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত তৈরী হয়েছে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি এখনো আমাদের ব্যাপক কৌতূহল আকর্ষণ করেনি। ইতঃপূর্বে কেবল অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বঙ্কিম সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই অধ্যাপক চৌধুরীর আলোচ্য বিষয়। ডক্টর সারোয়ার জাহানের গ্রন্থ সেদিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। দীর্ঘকাল ধরে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে উল্লেখিত মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র সম্পর্কে যে-বিভ্রান্তি জমে উঠেছে—সারোয়ার জাহান অত্যন্ত দক্ষ হাতে তার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রামাণ্য ইতিহাসের সাক্ষ্য তিনি গ্রহণ করেছেন,

www.pathagar.com

ভ্রান্ত ইতিহাসের উপাদান নির্ভুল যুক্তির সাহায্যে বাতিল করেছেন। আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থের সাতটি পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস ও রোমান্সে বর্ণিত মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি পরীক্ষিত হয়েছে। এবং লেখক অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন-যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত ঐতিহাসিক মুসলিম চরিত্রগুলি সম্পর্কেই ছিলেন বিদ্বিষ্ট। কিন্তু কাল্পনিক মুসলিম চরিত্র সমূহ শিল্পী বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ আবেগ ও মমতায় অবিস্মরণীয় দীপ্তি পেয়েছে। আয়েশা অথবা ওসমান খাঁ তারই দৃষ্টান্ত। আবার কখনো ভ্রান্ত ইতিহাসের প্রভাবে মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধেয় নরনারীও-যে মহিমাচ্যুত হয়েছেন—তার প্রমাণ বঙ্কিম-সৃষ্ট আওরঙ্গজেব ও জেব উন্‌নিসা। পরবর্তীকালে এ-বিষয়ে স্যার যদুনাথ সরকারের গবেষণা-লব্ধ তথ্য ডক্টর সারোয়ার জাহান যথাস্থানে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়—'বঙ্কিম-উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ: সমকালীন প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিচার'—একটি অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা। ১৮৮৮ সালে সেখ আবদুস সোবহানের 'হিন্দু মোসলমান' গ্রন্থে সর্ব প্রথম 'বঙ্কিম-উপন্যাসে চিত্রিত মুসলমান চরিত্রের বিকৃতিতে ক্ষোভ' প্রকাশিত হয়। অতঃপর উনিশ শতক অতিক্রম ক'রে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার এই ধারা অব্যাহত থাকে। অধ্যায়ের শেষে ডক্টর সারোয়ার জাহান বলেছেন: "বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে বেশ কয়েকটি মুসলিম চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছেন, মুসলিম-প্রসঙ্গ তাঁর হাতে বিকৃত হয়েছে এবং মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যায় ও অসঙ্গত মন্তব্য করেছেন, এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধ নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু যে-কোনো শিল্পীর মানস-বিশ্লেষণের পক্ষে এ-জাতীয় সরল-রৈখিক বিচার কোনো সময়েই অভ্রান্ত হয় না। বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে (অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি) বঙ্কিম-বিচার করার সময়ে পূর্বোক্ত কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। নিরপেক্ষ এবং ভাবাবেগহীন দৃষ্টিতে যদি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিকে দেখি, তা' হলে দেখবো 'মুসলমান-বিদ্বেষী' বঙ্কিমের হাতে এমন কিছু মুসলিম চরিত্র নির্মিত হয়েছে যা পাশাপাশি হিন্দু চরিত্রের তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত ও শিল্প-বিভাসিত।"

বলা প্রয়োজন, ডক্টর সারোয়ার জাহান বর্তমান গ্রন্থে সেই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা ও অন্তর্দৃষ্টির সহযোগে 'বঙ্কিম-উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র' আমাদের সমালোচনা ও গবেষণা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে মর্যাদা পাবে।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ছ-জ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুর্গেশনন্দিনী ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কপালকুণ্ডলা ১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃণালিনী ২৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রশেখর ৪০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজসিংহ ৫৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আনন্দমঠ ৯১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতারাম ১০১

অষ্টম অধ্যায়

বঙ্কিম-উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ :
সমকালীন প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিচার ১১৮

গ্রন্থপঞ্জী ১৬১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুর্গেশনন্দিনী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) স্থায়ী আসন চিহ্নিত দ্বিবিধ কারণে; প্রথমত, 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমের প্রথম বাংলা উপন্যাস; দ্বিতীয়ত 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস। এবং এই জন্যই বাংলা উপন্যাসের নির্মাতার মর্যাদা বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য।[১]

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা স্পষ্ট অনুমান করা যায়। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা এই উপন্যাসের প্রশংসাসূচক সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। গ্রন্থকারের উদ্দেশে অভিনন্দনপত্রও মুদ্রিত হয়।[২] এ-জাতীয় অভিনন্দনবাণী রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকেও আমরা শুনেছি, 'বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।'[৩] মোট কথা সকলেই প্রায় এক বাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে, 'বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।'[৪]

অবশ্য সে সময়ে *Hindoo Patriot* পত্রিকা 'দুর্গেশনন্দিনী'র উপর স্কটের 'আইভ্যান হো'র প্রভাব আবিষ্কার করেন।[৫] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার পূর্বে 'আইভ্যান হো'র সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি।[৬]

---

১ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৪।

২ সংবাদ 'প্রভাকর'-এ প্রকাশিত অভিনন্দন বাণী :
'আপনি এক্ষণে আমাদিগকে নব পল্লবিত অক্ষয় বৃক্ষের অমৃত ফলের রসাস্বাদন করাইলেন।'
—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'দুর্গেশনন্দিনী', বঃ সাঃ পরিষৎ প্রকাশিত, শঃ সঃ, পৃঃ ৸৶. থেকে উদ্ধৃত।

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আধুনিক সাহিত্য", 'রবীন্দ্র রচনাবলী', নবম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ৩৯৯।

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৸৶.

৫ *Hindoo Patriot*, ২৪শে এপ্রিল ও ১৫ই মে, ১৮৬৫, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনী-কান্ত দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৸৶. দ্রষ্টব্য।

৬ চন্দ্রনাথ বসু বলেন : 'তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র] বলিয়াছিলেন—"দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে আইভ্যান হো পড়ি নাই।" "বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র"', 'প্রদীপ', আষাঢ়, ১৩০৫, পৃঃ ২১৫।

www.pathagar.com

'দুর্গেশনন্দিনী' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বঙ্কিমের জীবিতাবস্থায় এর ত্রয়োদশ সংস্করণ (১৮৯৩) এই বিপুল জনপ্রিয়তার নির্ণায়ক।[১]

উড়িষ্যা বিজয়কে কেন্দ্র করে মোগল-পাঠানের বিরোধের কাহিনী 'দুর্গেশনন্দিনী'র একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলেও এই উপন্যাসের প্রাণবিন্দু আয়েষা-জগৎসিংহের প্রণয়-চিত্র।

'দুর্গেশনন্দিনী'র মূল ঘটনা আহৃত হয়েছে, চার্লস স্টুয়ার্ট-এর *History of Bengal* থেকে। কিন্তু স্টুয়ার্ট-এর ইতিহাস প্রামাণ্য নয়। কেননা 'ডাও সাহেবের মেকী ইতিহাস হইতে লইয়াছেন ক্যাপ্টেন চার্লস স্টুয়ার্ট, আর ডাও সাহেব ফিরিস্তার রচিত হিন্দুস্থানের ইতিহাস ইংরেজীতে প্রায়শ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন বলিয়া এবং নিজ গ্রন্থের নামপত্রে ফিরিস্তার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্যাপ্ত মেকী কথা চালাইয়াছেন যাহা ফিরিস্তা তো লেখেন নাই ; এমন কি, কোন পারসিক লেখকের পক্ষে সেরূপ লেখাও সম্ভব ছিল না।'[২] এই কারণে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অনেক প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যত্যয় ঘটেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইতিবৃত্তের কথা এবং মানসিংহের যুদ্ধ যাত্রার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এ-ভাবে : ৯৯৬ সালে মানসিংহ পাটনা নগরীতে এসে বিভিন্ন উপদ্রব দমন করার পর উৎকলের দিকে অগ্রসর হলেন।[৩] সে সময়ে ঈশা খাঁ বঙ্গদেশের শাসক। মানসিংহ সৈদ খাঁকে সসৈন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সংবাদ দিলেন। কিন্তু বর্ধমানে গিয়ে শোনা গেল, সৈদ খাঁ বর্ষাশেষে আসবেন। সুতরাং মানসিংহ দারুকেশ্বরের তীরে শিবির স্থাপন করে সৈদ খাঁর প্রতীক্ষায় রইলেন।

এই অংশ স্টুয়ার্ট-এর বঙ্গানুবাদ মাত্র।[৪] মানসিংহ সংবাদ পেলেন এই সুযোগে কতলু খাঁ 'মন্দারণের অনতিদূর মধ্যে সসৈন্য আসিয়া দেশ লুঠ করিতেছে।' তখন মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কতলু খাঁকে দমন করার অভিপ্রায়ে 'শত্রু শিবিরোদ্দেশে' যাত্রা করলেন। এই কার্যোপলক্ষে যাবার সময় ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে এক মন্দিরে তাঁর সঙ্গে বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমার পরিচয় ও প্রণয় ঘটে।

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৸৶।

২ যদুনাথ সরকার, "ভূমিকা", "দুর্গেশনন্দিনী", বঃ সাঃ পঃ প্রকাশিত, শঃ বাঃ সংস্করণ, পৃঃ ।।/.

৩ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ৯৯৬ সালে মানসিংহ যুদ্ধ যাত্রা করেন, কিন্তু স্টুয়ার্ট বলেন 'In the year 998 The Raja planned of expedition for the recovery of Orissa out of the hands of the Afgans.'—C. Stewart, *History of Bengal*, London, 1913, p. 115.

৪ See, Stewart, *Ibid*, p. 115.

www.pathagar.com

বীরেন্দ্র সিংহের কাছে কতলু খাঁ দূত প্রেরণ করে লিখেছিলেন, 'এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গড় মন্দারণে প্রেরণ করিবেন।' উত্তরে বীরেন্দ্র সিংহ বলেছিলেন, 'দূত। তোমার প্রভুকে কহিও তিনি সেনা প্রেরণ করিবেন।' বীরেন্দ্র সিংহের ধৃষ্টতায় পাঠানপতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

জগৎসিংহ তিলোত্তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এক রাত্রে বিমলার সঙ্গে কতলু খাঁর দুর্গে প্রবেশ করলেন। তিলোত্তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, কিন্তু আবার দুর্যোগ, 'অকস্মাৎ তূর্যনিনাদ হইল', বিমলার সামনে এসে দাঁড়ালেন জনৈক অস্ত্রধারী, 'তাঁহার পরিচ্ছদ পাঠান জাতীয় সৈনিক পুরুষদিগের ন্যায়। পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও মহৎগুণ দেখিয়া অনায়াসে প্রতীতি হইতে পারিত, এ ব্যক্তি কোন মহৎ পদাভিষিক্ত। অদ্যাপি তাঁহার বয়স ত্রিংশতের অধিক হয় নাই, কান্তি সাতিশয় শ্রীমান, তাঁহার প্রশস্ত ললাটোপরি যে উষ্ণীষ সংস্থাপিত ছিল, তাহাতে একখণ্ড মহার্ঘ হীরক শোভিত ছিল। বিমলার যদি তৎক্ষণে মনের স্থিরতা থাকিত তবে বুঝিতে পারিতেন যে, স্বয়ং জগৎসিংহের সহিত তুলনায় এ ব্যক্তি নিতান্ত ন্যূন হইবেন না, জগৎসিংহের সদৃশ দীর্ঘায়ত বা বিশালোরস্ক নহেন, কিন্তু তৎসদৃশ বীরত্বব্যঞ্জক সুন্দর কান্তি, ততোধিক সুকুমার দেহ। তাঁহার বহুমূল্য কটি বন্ধে প্রবাল জড়িত কোষ মধ্যে দামাস্ক ছুরিকা ছিল, হস্তে নিষ্কোশিত তরোবার।' ইনি কতলু খাঁর সেনাপতি ওসমান খাঁ।

পাঠানেরা দুর্গ জয় করে বীরেন্দ্র সিংহকে বন্দী করলো এবং 'শিকার [জগৎ সিংহ] সম্মুখে পাইয়া "আল্লা-ল্লা-হো" চীৎকার করিয়া, পিশাচের ন্যায় লাফাইতে লাগিল।[১].. সেই চীৎকার শেষ হইতে না হইতে জগৎসিংহের অসি একজন পাঠানের হৃদয়ে আমূল সমারোপিত হইল। ভীম চীৎকার করিতে করিতে পাঠান প্রাণ ত্যাগ করিল।' অনেকক্ষণ জগৎসিংহ পাঠানদের সঙ্গে একক যুদ্ধ করলেন। তিনি ক্ষত-বিক্ষত হলেন, কিন্তু পশ্চাদ্‌পদ হলেন না। কোন পাঠান 'সেনার মস্তক দুই খণ্ড হইয়া পড়িল', কোন 'যবন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল'। একজন পাঠান বলল, "রে নফর। অস্ত্র ত্যাগ কর : তোরে প্রাণে মারিব না।" নির্বাণোন্মুখ অগ্নিতে যেন কেহ ঘৃতাহুতি দিল। অগ্নি শিখাবৎ লম্ফ দিয়া, কুমার দাম্ভিক পাঠানের মস্তকোচ্ছেদ করিয়া নিজ চরণ তলে পাড়িলেন। অসি ঘুরাইয়া ডাকিয়া কহিলেন, "যবন। রাজপুতেরা কি প্রকারে প্রাণ ত্যাগ করে, দেখ।"

১ পাঠানদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র সহানুভূতিশীল ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজকুমারের (অর্থাৎ হিন্দুর প্রতি) প্রতি পাঠানদের এই দুর্ব্যবহার তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। তার সহানুভূতি অকস্মাৎ পাঠান থেকে স্বজাতির প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে।

www.pathagar.com

অবশেষে ক্লান্ত রাজকুমার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ওসমান খাঁ নির্দেশ দিলেন, "রাজপুত্রকে কেহ প্রাণে বধ করিও না, জীবিতাবস্থায় ব্যাঘ্রকে পিঞ্জিরা বদ্ধ করিতে হইবে।" বিংশতি পাঠান রাজপুত্রের উষ্ণীষের রত্ন অপহরণ করিতে ধাবমান হইল। ওসমান বজ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কেহ রাজপুত্রকে স্পর্শ করিও না।" ওসমান এবার স্ত্রীলোকদের খোঁজ করতে হুকুম দিলেন, "কিন্তু সাবধান। বীরেন্দ্রের কন্যার প্রতি যেন কোন অত্যাচার না হয়।"

জগৎসিংহ চৈতন্য লাভ করে প্রথম কতলু খাঁর কন্যা আয়েষাকে দেখলেন। ঔপন্যাসিক মধ্যযুগীয় কাব্যের রীতিতে আয়েষার রূপের সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন : 'আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক। আয়েষা দেখিতে পরমা সুন্দরী; কিন্তু সেই রীতির সৌন্দর্য্য দুই চারি শব্দে প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য্য সেই রীতির নহে, স্থির যৌবনা বিমলারও একাল পর্য্যন্ত রূপের ছটা, লোক মনমোহিনী ছিল, আয়েষার রূপরাশি তদনুরূপও নহে।..যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে—তেমনই আয়েষা... আয়েষার সৌন্দর্য্য সার যে সমুদ্রের কৌস্তভ রত্ন, তাহার ধীর কটাক্ষ। সন্ধ্যা-সমীরণকম্পিত নীলোৎপলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ। কি প্রকারে লিখিব?'...ইত্যাদি।

লক্ষণীয় ঔপন্যাসিক ওসমানের বীরত্বব্যঞ্জক দৈহিক গঠন এবং বেশভূষার বর্ণনায় যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি আয়েষার অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্য বর্ণনায় অকৃপণ। দিন কয়েক আয়েষা ও ওসমান আহত জগৎসিংহের সেবায় নিযুক্ত থাকলেন। জগৎসিংহ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই সময়ে একদিন নিভৃতে ওসমান তার বহু দিনের অবরুদ্ধ প্রেমাকাঙ্ক্ষা আভাসে আয়েষার কাছে ব্যক্ত করলেন, "...আয়েষা নিজ সবিদ্যুৎ মেঘতুল্য চক্ষু ওসমানের বদনের প্রতি স্থির করিলেন। ওসমান কহিলেন, "আমি আশালতা ধরিয়া আছি, আর কতকাল তাহার তলে জল সিঞ্চন করিব?"

আয়েষার মুখশ্রী গম্ভীর হইল। ওসমান এ ভাবান্তরেও নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন। আয়েষা কহিলেন, "ওসমান, ভাই বহিন বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।"

ওসমানের হর্ষোৎফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল। কহিলেন, "এই কথা চিরকাল। সৃষ্টিকর্তা। এই কুসুমের দেহ মধ্যে তুমি কি পাষাণের হৃদয় গড়িয়া তুলিয়াছ?"

এবার বীরেন্দ্র সিংহের বিচারের দৃশ্য,—'কতলু খাঁ নিজ দুর্গমধ্যে দরবারে বসিয়াছেন। দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পারিষদগণ দণ্ডায়মান আছে। সম্মুখস্থ ভূমি খণ্ডে বহু সহস্র লোক নিঃশব্দে বসিয়া রহিয়াছে। অদ্য বীরেন্দ্র সিংহের দণ্ড

www.pathagar.com

হইবে।...শৃঙ্খলাবদ্ধ বীরেন্দ্র সিংহকে কতলু খাঁ বললেন, "কি জন্য আমার আদেশ-মত আমাকে, অশ্ব আর সেনা পাঠাইতে অসম্মত হইয়াছিলে ?"

বীরেন্দ্রসিংহ অকুতভয়ে কহিলেন, "তুমি রাজবিদ্রোহী দস্যু। তোমাকে কেন অর্থ দিব ? তোমায় কিজন্য সেনা দিব ?" কতলু খাঁ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ; এতদূর নিষ্ঠুর যে, পর পীড়ায় তাহার উল্লাস জন্মিত। দাম্ভিক বৈরীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল'। তিনি বীরেন্দ্রকে মৃত্যুর পূর্বে আর একবার মানসিক যন্ত্রণা দেবার উদ্দেশে বললেন : "মৃত্যুকালে তোমার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না ?"

বীরেন্দ্রসিংহ বললেন, "যদি কন্যা তোমার গৃহে জীবিতা থাকে, তবে সাক্ষাৎ করিব না। যদি মরিয়া থাকে লইয়া আইস, কোলে করিয়া মরিব।"

মৃত্যুর পূর্বে বধ্যভূমিতে ওসমানের সহায়তায় বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে বিমলার সাক্ষাৎ হলো। বিমলা বললেন..."এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিব।" ...পরমুহূর্তে বীরেন্দ্রসিংহের রক্তাক্ত মস্তক ধূলায় লুন্ঠিত হলো।

বীরেন্দ্রসিংহের মৃত্যুর পর বিমলা ও তিলোত্তমা কতলু খাঁর দুর্গে বন্দিনী থাকলেন। 'কতলু খাঁর এই নিয়ম ছিল, কোন দুর্গ বা গ্রাম জয় হইলে, তন্মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট সুন্দরী যদি বন্দী হইত, তবে সে তাঁহার আত্মসেবার জন্য প্রেরিত হইত। গড় মন্দারণ জয়ের পর দিবস, কতলু খাঁ তথায় উপনীত হইয়া বন্দীদিগের প্রতি যথাবিহিত বিধান ও ভবিষ্যৎ দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ পক্ষে সৈন্য নিয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন। বন্দীদিগের মধ্যে বিমলা ও তিলোত্তমাকে দেখিবা মাত্র নিজ বিলাস গৃহ সাজাইবার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইলেন।' তারপর অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করার পর মোগলদের সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিরোধের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। 'এই জন্য এ পর্য্যন্ত কতলু খাঁ নূতন দাসীদিগের সঙ্গ সুখ লাভ করিতে অবকাশ পান নাই'।[১]

এ প্রসঙ্গে ওসমানের চারিত্রিক উদারতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিক বলেন, 'ওসমান পাঠান-কুলতিলক। যুদ্ধ তাঁহার স্বার্থ সাধন ও নিজ ব্যবসায় এবং ধর্ম্ম : সুতরাং যুদ্ধ জয়ার্থ ওসমান কোন কার্য্যেই সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু যুদ্ধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি কদাচিৎ নিষ্প্রয়োজনে তিলার্দ্ধ অত্যাচার

১ কতলু খাঁর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সম্পর্কে প্রফুল্ল কুমার দাশ গুপ্ত বলেন, 'আকবরনামায় তাঁহাকে 'crafty' এবং 'scoundrel' বলা হইলেও (এই নিন্দাবাদের কারণ এই যে, তিনি দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন) তাঁহার উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তির উল্লেখ নাই।' —প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম', কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ৫০।

www.pathagar.com

করিতে দিতেন না। যদি কতলু খাঁ স্বয়ং বিমলা, তিলোত্তমার অদৃষ্টে এ দারুণ বিধান না করিতেন, তবে ওসমানের কৃপায় তাঁহারা কদাচ বন্দী থাকিতেন না। তাঁহারই অনুকম্পায় স্বামীর মৃত্যুকালে বিমলা তৎ সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।' ..তদুপরি জগৎসিংহকে লিখিত বিমলার পত্র পাঠ করে ওসমান জানলেন, বিমলা একদা এক বালক-চোরের হাত থেকে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তিনি বললেন, 'মা! আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।' ...ওসমান হস্ত হইতে একটি অঙ্গুরীয় মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর, দুই এক-দিনের মধ্যে কিছু সাধন হইবে না। কতলু খাঁর জন্ম দিন আগত প্রায়, সে দিবসে বড় উৎসব হইয়া থাকে। প্রহরীগণ আমোদে মত্ত থাকে। সেই দিবসে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি সেই দিবস নিশীথে অন্তঃপুরদ্বারে আসিও। যদি তথায় কেহ তোমাকে এইরূপ দ্বিতীয় অঙ্গুরীয় দৃষ্ট করায়, তবে তুমি তাহার সঙ্গে বাহিরে আসিও।"...

ইতিমধ্যে জগৎসিংহ একদিন বিদ্যাদিগ্‌গজের সাক্ষাৎ পেলেন। বিদ্যাদিগ্‌গজ জানালেন, "আমি মোছলমান হইয়াছি," যখন মোছলমান বাবুরা গড়ে এলেন, তখন আমাকে কহিলেন যে, "আয় বামুন তোর জাতি মারিব ...।" সে আরো সংবাদ দিল অন্যান্য আরো ব্রাহ্মণকে এভাবে বলপূর্বক 'মোছলমান' করা হয়েছে।

রাজপুত্র ওসমানের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। ওসমান রাজপুত্রকৃত নির্ব্বাক তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র ইহাতে দোষ কি? মোছলমানের বিবে-চনায় মোহাম্মদীয় ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, বলে হোউক, ছলে হোউক, সত্য ধর্ম্ম প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে।"

ব্রাহ্মণের কাছ থেকে বীরেন্দ্র সিংহের মৃত্যু-দণ্ড, বিমলা ও তিলোত্তমাকে বলপূর্বক কতলু খাঁ কর্তৃক উপপত্নী করার সংবাদে জগৎসিংহ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন; 'ওসমান লজ্জিত হইয়া মৃদুভাবে কহিলেন, "আমি সেনাপতি মাত্র।" রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "আপনি পিশাচের সেনাপতি।"

পরের ঘটনা ওসমান কর্তৃক জগৎসিংহের নিকট কতলু খাঁর প্রস্তাব—"রাজপুত পাঠানের যুদ্ধে উভয় কুল ক্ষয় হইতেছে।"

রাজপুত্র বললেন, "পাঠানকুল ক্ষয় করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য।" ওসমান বললেন '...মোগল সম্রাটের সহিত চিরদিন বিবাদ করিয়া পাঠানের উৎকলে তিষ্ঠান সুখের হইবে না। কিন্তু মোগল সম্রাটও পাঠানদিগকে কদাচ নিজ করতলস্থ করিতে পারিবেন না।... পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে, কখনও অধীনতা স্বীকার করে নাই।

www.pathagar.com

একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখন করিবেও না ; ইহা নিশ্চিত কহিলাম।'[১] তবে আর রাজপুত পাঠানের শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া কাজ কি ?"

ওসমান ও জগৎসিংহের এই কথোপকথন থেকে অনুমান করা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন পাঠান ও মোগল দ্বন্দ্বে সাধারণ প্রজাসাধারণের বিনষ্টি, দেশের ক্ষতি। অতএব পরস্পরের সম্প্রীতির মধ্যেই ভারতবর্ষের যথার্থ শুভ নিহিত।[২]

ওসমান জগৎসিংহকে মানসিংহের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যেতে অনুরোধ করলে জগৎসিংহ বললেন, "...দিল্লীর সম্রাট আমাদিগকে পাঠানজয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাঠানজয়ই করিব। সন্ধি করিতে নিযুক্ত করেন নাই, সন্ধি করিব না। কিম্বা সে অনুরোধ করিব না।"

এরপর সংযোজিত হয়েছে, কতলু খাঁর জন্মদিন উৎসবের সুদীর্ঘ চিত্রময় বর্ণনা, 'মহোৎসব উপস্থিত। অদ্য কতলু খাঁর জন্ম দিন। দিবসের রঙ্গ, নৃত্য, দান, আহার, পান ইত্যাদিতে সকলেই ব্যাপৃত ছিল। রাত্রিতে ততোধিক। এই মাত্র সায়াহ্নকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, দুর্গমধ্য আলোকময়; সৈনিক, সিপাহী, ওমরাহ, ভৃত্য, পৌরবর্গ, ভিক্ষুক, মদ্যপ, নট, নর্তকী, গায়ক, গায়িকা, বাদক, ঐন্দ্রজালিক, পুষ্পবিক্রেতা, গন্ধবিক্রেতা, তাম্বুল বিক্রেতা, আহরীয় বিক্রেতা, শিল্পকার্য্যোৎপন্ন-জাত বিক্রেতা, এই সকলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। যথায় যাও, তথায় কেবল দীপমালা, গীতবাদ্য, গন্ধবারি, পান পুষ্প, বাজি-বেশ্যা।...আজ নবাব প্রমোদ মন্দিরে আসিয়া সকলকেই লইয়া প্রমোদ করিবেন ; নৃত্যগীত হইবে।'... ইত্যাদি।

এই উৎসবের দিনে জগৎসিংহের সঙ্গে আয়েষার পুনরায় সাক্ষাৎ। আয়েষা জগৎসিংহকে বললেন, "...আমা হইতে যদি কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, তবে বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না, আমি আপনার কার্য্য করিতে পরম সুখী হইব।"

রাজকুমার কহিলেন, "...নবাবপুত্রি..আপনার কাছে যে ঋণে বদ্ধ আছি তাহা কথায় প্রতিশোধ কি করিব? ...তবে এই ভিক্ষা যে, যদি কখন সাধ্য হয়, যদি

---

১ ওসমানের এই স্বাধীন চিন্তা, তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। সম্ভবত বঙ্কিম এই বৈশিষ্ট্য, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' থেকে আহরণ করেছেন—

'.....ইহারা (পাঠানেরা) স্বভাবতঃ অতি নিষ্ঠুর নহে এবং স্বাধীনতা স্বদেশানুরাগ এতদ্‌জাতীয় দিগের প্রধান ধর্ম্ম। ...আমরা সকলেই তুল্য ও তুল্যতা রক্ষার্থে সর্ব্বদা কলহ ও শত্রুতা ভয় ও পরস্পর রক্ত শোষণ করিয়া সুতৃপ্ত আছি, কিন্তু কদাপি পরাধীনতা সহ্য করিতে পারিবনা।' —'বিবিধার্থ' সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ১৭৭৪, বৈশাখ, ৮ম সংখ্যা।—বিজিত কুমার দত্ত, 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস', কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ৭৬, উদ্ধৃত।

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬-৭৭।

www.pathagar.com

অন্য দিন হয়, তবে আমার প্রতি কোন আজ্ঞা করিতে সঙ্কোচ করিবেন না। ...আমার মনের সকল দুঃখ আপনি জানেন না, আমি জানাইতেও পারিব না।"

আয়েষা বিস্মিত হইলেন। ..তখন আর নবাবপুত্রি ভাব রহিল না, দূরতা রহিল না, স্নেহময়ী রমণী রমণীর ন্যায় যত্নে কোমল করপল্লবে রাজপুত্রের কর ধারণ করিলেন, আবার তখনই তাহার হস্ত ত্যাগ করিয়া রাজপুত্রের মুখপানে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "কুমার এ দারুণ দুঃখ তোমার হৃদয় মধ্যে কেন? আমাকে পর জ্ঞান করিও না। যদি সাহস দাও তবে বলি—বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা কি ...—"

আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতে রাজকুমার কহিলেন, "ও কথায় কাজ কি? সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে।" ...উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন। রাজপুত্র আকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার কর পল্লবে কবোষ্ণ বারি বিন্দু পড়িল। জগৎসিংহ দৃষ্টি নিম্ন করিয়া আয়েষার মুখ পদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, আয়েষা কাঁদিতেছেন, উজ্জ্বল গণ্ডদেশে দরদর ধারা বহিতেছে।

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি আয়েষা তুমি কাঁদিতেছ? আয়েষা কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে গোলাব ফুলটি নিঃশেষে ছিন্ন করিলেন। পুষ্প শত খণ্ড হইলে কহিলেন, "যুবরাজ! আজ যে তোমার নিকট হইতে এ ভাবে বিদায় লইব, তাহা মনে ছিল না। আমি অনেক সহ্য করিতে পারি। কিন্তু কারাগারে তোমাকে একাকী যে এ মনঃপীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিয়া যাইব, তাহা পারিতেছি না। জগৎসিংহ! তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস, অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব, অদ্য রাত্রেই নিজ শিবিরে যাইও।" কিন্তু আয়েষার সম্ভাব্য বিপদের কথা স্মরণ করে জগৎসিংহ দুর্গ থেকে যেতে সম্মত হলেন না, বললেন, "তোমার নিকট প্রাণ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, তোমার যাহাতে যন্ত্রণা হইবে, তাহা আমি কদাচ করিব না।"

আয়েষা পুনর্ব্বার নীরব হইয়া রহিলেন। আবার চক্ষে দরদর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। আয়েষা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র বললেন, "আয়েষা, আমার অনুরোধ রাখ, রোদনের কারণ যদি প্রকাশ্য হয়, তবে আমার নিকট প্রকাশ কর। যদি আমার প্রাণ দান করিলে তোমার নীরব রোদনের কারণ নিরাকারণ হয়, তাহা আমি করিব।"

আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথায় উত্তর না করিয়া অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিলেন। ক্ষণেক নীরব নিস্পন্দ থাকিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র। আমি আর কাঁদিব না।"

www.pathagar.com

এমনি সময়ে অকস্মাৎ ওসমান সেখানে উপস্থিত হলেন। ওসমান "ক্রোধ প্রকাশক স্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিলেন...নিশীথে একাকী বন্দী সহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্যে নিশীথে কারাগারে অনিয়ম প্রবেশও উত্তম।"

আয়েষার পবিত্র চিত্তে এ তিরস্কার সহনাতীত হইল...আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ববৎ স্থির দৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার বিশাল লোচন আরও যেন বদ্ধিতায়ন হইল। মুখপদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমর কৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ এক দিকে হেলিল; হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবালজলবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল, অতি পরিষ্কার স্বরে কহিলেন, "ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।"

যদি তন্মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপাত হইত, তবে রাজপুত্র কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতে পারিতেন না। ...আয়েষা পুনরায় কহিতে লাগিলেন, শুন ওসমান, আবার বলি এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইহার শোণিতে আর্দ্র হয়—বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন; তথাপি দেখিবে, হৃদয় মন্দিরে ইহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর যদি আর চিরন্তন ইহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী দাসী রহিব। আরও শুন, মনে কর একাকিনী কি কথা বলিতে ছিলাম? বলিতেছিলাম দৌবারিকগণকে বাক্যে পারি, ধনে পারি, বশীভূত করিয়া পিতার অশ্বশালা হইতে অশ্ব দিব; বন্দী পিতৃ শিবিরে এখনই চলিয়া যাউন। বন্দী নিজে পলায়নে অস্বীকৃত হইলেন। নচেৎ তুমি এতক্ষণ ইহার নখাগ্রও দেখিতে পাইতে না।"...

"ওসমান এ সকল কথা বলিয়া তোমাকে ক্লেশ দিতেছি, অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি আমায় স্নেহ কর, আমি তোমায় স্নেহ করি, এ আমার অনুচিৎ। কিন্তু তুমি আজি আয়েষাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছ। আয়েষা অন্য যে অপরাধ করুক, অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে কর্ম্ম করে, তাহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারে। এখন তোমার সাক্ষাৎ বলিলাম, প্রয়োজন হয় কাল পিতার সমক্ষে বলিব। ...রাজপুত্র, তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওসমান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্য কর্ণগোচর হইত না। ...ওসমান, আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ

www.pathagar.com

মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্ববৎ স্নেহপরায়ণা ভগিনী ; ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ব্ব স্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, ভ্রাতৃ-স্নেহে নিরাশ করিয়া আমায় অতল জলে ডুবাইও না।"—আয়েষা প্রস্থান করলেন।

আয়েষা-জগৎসিংহের এই প্রণয়-চিত্র অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কেউ কেউ (বিশেষতঃ মুসলমান সমালোচকগণ) এই ঘটনাকে বঙ্কিমের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির ফসল বলে চিহ্নিত করেছেন (আমাদের মনে হয় ব্যাপারটি বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে দ্রষ্টব্য)।[১] কোনো কোনো সমালোচক আয়েষা কর্তৃক জগৎসিংহের পরিচর্যা ও উভয়ের প্রণয়ে অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।[২]

এই প্রসঙ্গে জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের মন্তব্য স্মরণীয়, 'আপাতঃদৃষ্টিতে জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার ভালোবাসা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে পাঠানদের অন্দর মহলের অবরোধ প্রথাকে অস্বীকার করে মুসলমানীর এই চিত্র উদ্‌ঘাটন একদিকে তার নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃসহ বেদনা, অন্যদিকে অপরিমিত জীবন পিপাসা ও প্রাণ শক্তির পরিচায়ক। আয়েষা বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যেও ছিলো একটি নির্জন ও নিঃসঙ্গ আত্মা...এই অন্তরে-বাইরে একাকিনী আয়েষার ভালবাসার স্বাভাবিক অধিকার কতলু খাঁর প্রাসাদের কামকেলি কৌতূহলের মধ্যে স্বীকৃতি পায়নি বলেই শেষ পর্যন্ত তার হৃদয়ের বিস্ময়কর আত্মঘোষণা : এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'[৩]

পরের চিত্র, জন্ম দিনের মহাসমারোহের কেন্দ্রস্থলে সুরা-উন্মত্ত কতলু খাঁ কর্তৃক বিমলাকে আলিঙ্গন ; 'তুমি কোথা, প্রিয়তমে!' বিমলা কতলু খাঁর স্কন্ধে এক বাহু রাখিয়া কহিলেন, 'দাসী শ্রীচরণে!'—অপর করে ছুরিকা—

'তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর চিৎকার ধ্বনি করিয়া বিমলাকে কতলু খাঁ দূরে নিক্ষেপ করিল ; এবং যেই নিক্ষেপ করিল, অমনি আপনিও ধরাতলশায়ী হইল। বিমলা

১ এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

২ 'কতলু খাঁর দুর্গে আয়েষা কর্তৃক জগৎসিংহের শুশ্রূষা সম্পূর্ণ অসম্ভব কাহিনী।... পাঠানের দুর্গে বন্দী আহত রাজপুত যুবার পরিচর্য্যার জন্য নবাব নন্দিনীর প্রয়োজন ছিল না এবং এরূপ চিত্র ইতিহাসসম্মত নহে। ...যেখানে ঐতিহাসিক পটভূমি রহিয়াছে সেখানে সম্পূর্ণ ইতিহাস-বিরুদ্ধ কল্পনা সমর্থন করা যায় না।' —প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২।
আরো দ্রষ্টব্য, 'রহস্য সন্দর্ভ' : 'বর্ত্তমান গ্রন্থকারের [বঙ্কিমের] বর্ণনায় প্রধান সেনাপতি কতলু খাঁর কন্যা আয়েষী [আয়েষা] যে প্রকারে মানসিংহের বন্দী ও পীড়িতাবস্থায় সেবা করিয়াছে তাহা কদাপি যবন সম্বন্ধে সংলগ্ন বোধ হয় না।'—"নূতন গ্রন্থের সমালোচনা" 'রহস্য সন্দর্ভ', ২১শ খণ্ড, ২য় পর্ব, ১৯২০-২১ (সংবৎ), পৃঃ ১৪৪।

৩ জীবেন্দ্র সিংহ রায়, সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, ২য় পর্ব, কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ৩০।

www.pathagar.com

তাহার বক্ষস্থলে আমূল তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছিলেন।' বিমলা তাঁর বৈধব্য-যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিয়ে পলায়ন করলেন। ওসমান প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ের সাহায্যে তিলোত্তমা ও বিমলা দুর্গ থেকে মুক্ত হলেন।

মৃত্যুকালে কতলু খাঁ কাতর স্বরে জগৎসিংহকে বলে গেলেন, "যুদ্ধ—কাজ——নাই—সন্ধি" জগৎসিংহ বললেন, "পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিলে আমি সন্ধির জন্য অনুরোধ করিতে স্বীকার করিলাম। ...যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি তবে আপনার পুত্রেরা উড়িষ্যাচ্যুত হইবেন না।'

'জগৎ সিংহ কারামুক্ত হইয়া পিতৃশিবিরে গমনান্তর নিজ স্বীকারানুযায়ী মোগল পাঠানে সন্ধি করাইলেন। পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও উত্তরাধিকারী হইয়া রহিলেন।'

এখানে কতলু খাঁর মৃত্যু এবং মোগল-পাঠানের সন্ধিতে জগৎসিংহের মধ্যস্থতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতামত বিচার্য।

দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনীর উৎস স্টুয়ার্ট-এর *History of Bengal* ; কিন্তু বিমলা কর্তৃক কতলু খাঁর নিহত হবার কথা, একটি কল্পিত ঘটনা মাত্র। স্টুয়ার্ট বলেন, 'Fortunately, for the royal cause, Cuttlu Khan, who had been for some time much indisposed, died a few days after this event : and his children were not arrived at the age of manhood, the Afgan Chiefs released the son of the Raja [জগৎসিংহ] and through him send for peace.'[১]

যদুনাথ সরকার 'আকবরনামা' থেকে অনুবাদ করেছেন, 'এই সময় শাহানশাহের ভাগ্য ফলিল। দশ দিন পরে কতলু মারা গেলেন, তাঁহার রোগ হইয়াছিল এবং শীঘ্রই জীবন শেষ হইল।'[২] কিন্তু যদুনাথ সরকার আবার বলেছেন,...'বঙ্গদেশ পাঠান শের শাহের হাতে পড়িবার পর হইতে মানসিংহ কর্তৃক বঙ্গ বিজয় পর্যন্ত এই ষাট বৎসরে পাঠানদের রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী ও সেনাপতির মধ্যে এতগুলি লোক খুন হন যে, তাহার তালিকা ছাপিলে এক পৃষ্ঠারও অধিক হইবে। সুতরাং কতলু খাঁর অপঘাত মৃত্যু বঙ্গীয় লেখকের অসম্ভব কল্পনা ছিল না।'[৩] (সেই সুবৃহৎ তালিকায় নিশ্চয়ই কতলু খাঁর নাম নেই) এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন, 'কিন্তু অসম্ভব কল্পনা না হইলেও

১ Stewart, *op. cit*, p. 116.

২ যদুনাথ সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ।।৶০।

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৸০।

www.pathagar.com

ইহা কি সমর্থনযোগ্য ? ...বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের লেখনীতে কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের পরিণতির বিকৃতির বিপদ এই যে, ইহার ফলে ঐতিহাসিক চরিত্রের সত্যকার কাহিনী লুপ্ত হইলেও ঐতিহাসিক নামধারী কল্পিত চরিত্র চিরদিন বাঁচিয়া থাকে।'[১]

স্টুয়ার্ট, জগৎসিংহের মাধ্যমে মোগল-পাঠানের মধ্যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপিত হয় বলে আভাস দেন, কিন্তু যদুনাথ সরকার এই অভিমত অস্বীকার করে বলেন, '...খ্বাজা ঈসা (কতলুর দেওয়ান এবং ওসমানের পিতা) ...সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহী সৈন্যরা অতিবৃষ্টি এবং মনঃপীড়াতে অভিভূত ছিল, এজন্য সন্ধি করিতে সম্মত হইল। আফগানেরা বাদশাহকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করিল।...'[২]

জগৎ সিংহের দুর্গ ত্যাগের প্রাক্কালে ওসমান তাঁকে নিবিড় শালবনের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে 'এক পার্শ্বে যাবনিক সমাধি খাত প্রস্তুত রহিয়াছে, অথচ শব নাই ; অপর পার্শ্বে চিতা সজ্জা রহিয়াছে, অথচ কোন মৃত দেহ নাই।' ওসমান বললেন, 'এ সকল আমার আজ্ঞাক্রমে হইয়াছে ; আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে মহাশয় আমাকে এই কবর মধ্যে সমাধিস্থ করিবেন, কেহ জানিবে না ; যদি আপনি দেহ ত্যাগ করেন, তবে এই চিতায় ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনার সৎকার করাইব।'

রাজকুমার এই অভিনব ব্যবস্থায় বিস্মিত হইলেন। ওসমান পুনরায় বলিলেন '...আমরা পাঠান,—অন্তঃকরণ প্রজ্জ্বলিত হইলে উচিতানুচিৎ বিবেচনা করি না ; এ পৃথিবী মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, একজন এইখানে প্রাণ ত্যাগ করিব।"

ওসমান যুবরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করে অস্ত্রাঘাত করলেন। যুবরাজ তখন 'কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন' এবং 'ফলতঃ যবনের অস্ত্রাঘাতে রাজপুত্রের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল ; রুধিরে অঙ্গ প্লাবিত হইল,..' শেষে তিনি বললেন, "ওসমান ক্ষান্ত হও, আমি পরাভব স্বীকার করিলাম। ...আমি যুদ্ধ করিব না। তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছ...।"

এবার ওসমান জগৎসিংহকে পদাঘাত করলেন। 'রাজকুমারের আর ধৈর্য্য রহিল না। শীঘ্র হস্তে ত্যক্ত প্রহরণ ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া শৃগাল দংশিত সিংহবৎ প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া রাজপুত্র যবনকে আক্রমণ করিলেন। সে দুর্দ্দম প্রহার

১ প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯।

২ যদুনাথ সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ।।৶০।

www.pathagar.com

যবন সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজপুত্রের বিশাল শরীরাঘাতে ওসমান ভূমিশায়ী হইলেন। রাজপুত্র তাঁহার বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া কহিলেন, "কেমন সমর সাধ মিটিয়াছে ত'?"

তারপর রাজপুত্র ওসমানকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে বললেন, "তুমি যবন হইয়া রাজপুতের শরীরে পদাঘাত করিয়াছিলে, এই জন্য তোমার এই দশা করিলাম নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নহে যে, উপকারীর অঙ্গ স্পর্শ করে।"

ওসমান মুক্ত হইলে আর একটি কথা না কহিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একবারে দুর্গাভিমুখে দ্রুত গমনে চলিলেন।[১]

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ওসমান এবং জগৎসিংহের এই যুদ্ধকে 'দুর্গেশনন্দিনী'র সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিষয় বলে উল্লেখ করে বলেছেন, '...উপন্যাসের আরম্ভ হইতে এই মল্লযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওসমান বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রশস্ততা ও মার্জ্জিত রুচির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এইরূপ বর্বরতা শুধু যে অশোভন তাহা নহে, অবিশ্বাস্যও। যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া প্রণয়িনীকে লাভ করার চেষ্টা বিরল নহে। কিন্তু ওসমান সেই মানুষ নহেন।[২]'

বিজিত কুমার দত্ত মনে করেন "প্রেমের ঈর্ষাকুটিল মনোভাব ওসমানের এই আচরণকে মানবিক রূপদান করেছে।"[৩] কিন্তু ওসমান চরিত্রের সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে এই আচরণ সঙ্গতিশূন্য।

ওসমানের ঐতিহাসিক পরিচয়, তিনি কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।[৪] একজন অসমসাহসী যোদ্ধা বলে ইতিহাসে তিনি পরিচিত। বঙ্গদেশে, মোগলদের দ্বারা পাঠান

১ আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি, পাঠান এবং রাজপুতের সংঘর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠানদের প্রতি বিষোদ্‌গার করেছেন। এখানেও দেখা যাচ্ছে, ওসমান চরিত্রে মানবিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটলেও, জগৎসিংহকে বলপূর্বক যুদ্ধে প্ররোচিত করে পদাঘাত করা, ওসমানকে অমানবিকতা এবং অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ওসমানের এই আচরণ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

২ সুবোধচন্দ্র গুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র', কলিকাতা, ৩য় সং, ১৩৬৮, পৃঃ ৬৪।

৩ বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।

৪ 'Sulaiman and Usman (the nephew of Qutlu Khan)'...—Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, Vol. II, Dacca, 1948, p. 210. 'রিয়াজ-উস-সালাতিন বলা হয়েছে, 'Osman, according to the Makhzan-i-Afghani was the second son of Miyan 'Isa Khan Lohani,'—Moulavi Abdus Salam, *Riyaz u-s-Salatin*, Calcutta, 1702, p. 178.

www.pathagar.com

বিজিত হবার সময় (১৬১২) ওসমান অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি।[১] যদুনাথ সরকারকৃত 'বহারিস্তান-ই-ঘাইবী'র বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে, 'ওসমানের বীরচরিত্র সত্য ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।'[২]

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয় উল্লিখিত হতে পারে, শত্রুকে আতিথ্যদান, ওসমানের চরিত্রে যে মহত্ত্ব দান করেছে, তা পাঠানদের চারিত্রিক বিশিষ্টতার অনুগামী। সেকালে পাঠানদের জাতিগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে তথ্য লাভ করেছিলেন, তার সহায়তায় ওসমান-চরিত্র-পরিকল্পিত। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ 'আফগান বা পাঠান জাতি' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'পাঠানদিগের প্রধান ধর্ম্ম অতিথি সপর্য্যা ; তৎসাধনে তাহারা সর্বদা অনুরক্ত থাকে, সহস্র অনিষ্ট ঘটিলেও কোনক্রমে ত্যকর্ম্মে বিরত হয় না। ..তাহাদিগেরও প্রধান পৌরুষ অতিথিসেবা।'[৩]

জগৎসিংহ দুর্গত্যাগ করার সময় আয়েষা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না। কিন্তু জগৎসিংহকে লিখিত পত্রে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত হলো। তিনি প্রথমে পত্রের শিরোনামায় লিখলেন, 'প্রাণাধিক' পরে 'প্রাণাধিক' কেটে লিখলেন 'রাজকুমার' এবং "প্রাণাধিক" শব্দ কাটিয়া 'রাজকুমার' লিখিতে গিয়া আয়েষার অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পড়িল।'

তিনি লিখিলেন, ..'আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নহি। যদি কখন সুখী হও, আয়েষাকে স্মরণ করিয়া সংবাদ দিও। ....যদি কখন অন্তঃকরণে ক্লেশ পাও, তবে আয়েষাকে কি স্মরণ করিবে ? ..তুমি চলিলে, আপাততঃ এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিলে। এই পাঠানেরা শান্ত নহে। সুতরাং পুনর্ব্বার তোমার এদেশে আসাই সম্ভব। কিন্তু আমার সহিত আর সন্দর্শন হইবে না। পুনঃ পুনঃ হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিয়া ইহা স্থির করিয়াছি। রমণীহৃদয় যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত।..

তোমার নিমিত্ত সিন্ধুক মধ্যে যাহা রহিল, তাহা আমার অনুরোধ গ্রহণ করিও।...'

জগৎসিংহ প্রত্যুত্তরে লিখলেন, 'আয়েষা তুমি রমণীরত্ন। ...আমি তোমার কোন প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিলাম না। তোমার পত্রে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।

১ V.A. Smith, *Oxford History of India*, London, 1919, p. 380.

২ যদুনাথ সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ।৵০—।৶০

৩ উদ্ধৃত, বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।

www.pathagar.com

এ পত্রের যে উত্তর, তাহা এক্ষণে দিতে পারিলাম না। আমাকে ভুলিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে এক বৎসর পরে ইহার উত্তর দিব।"

অল্পদিন পর জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিয়ের বিপুল আয়োজন হলো। সেই আনন্দানুষ্ঠানে আয়েষাও আমন্ত্রিত হলেন। আয়েষা স্বহস্তে তিলোত্তমাকে অলঙ্কারাদি পরালেন।

'আয়েষা যবনী হইয়াও তিলোত্তমা আর জগৎসিংহের অধিক স্নেহবশতঃ সহচরী-বর্গের সহিত দুর্গান্তঃপুরবাসিনী হইলেন। পাঠক মনে করিতে পারেন যে, আয়েষা তাপিত হৃদয়ে বিবাহের উৎসবে উৎসব করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। আয়েষা নিজ সহর্ষ চিত্তের প্রফুল্লতায় সকলকেই প্রফুল্ল করিতে লাগিলেন; প্রস্ফুট শারদ সরসীরুহের মন্দান্দোলন স্বরূপে সেই মৃদুমধুর হাসিতে সর্বত্র শ্রীসম্পাদন করিতে লাগিলেন।'

'আয়েষা তিলোত্তমার কাছে বিদায় নিয়ে ভারাক্রান্ত চিত্তে ফিরে এলেন। জগৎ-সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না। তিনি বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলী হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে করিতেছিলেন, 'এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি।" আবার ভাবিতেছিলেন, "এই কাজের জন্য বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলাম, তবে নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?'

আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, 'এ লোভ সংবরণ করা রমণীর আসাধ্য; প্রলোভনকে দূর করাই ভাল।'

এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম নারী চরিত্রগুলির মধ্যে আয়েষা সর্বশ্রেষ্ঠা। ঔপন্যাসিকের আন্তরিকতার স্পর্শে আয়েষা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল।

প্রশ্ন হতে পারে, আয়েষা চরিত্র সৃষ্টি করতে ঔপন্যাসিক যে আয়োজন করেছেন, গল্পের দিক থেকে তা হয়তো সর্বাংশে উপযোগী হয়নি; 'তথাপি, যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত, বিধর্মী ও বিজাতি বীর যুবকের শুশ্রূষা-ভার লইয়া এবং দিবারাত্রি সেই নির্বাণোন্মুখ প্রাণশিখার পানে চাহিয়া নারীর চিত্তে যে অপরিসীম করুণার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক, সেই করুণাই এরূপ প্রেমে পরিণত হইয়াছিল; অথবা সেই মরণাহত

www.pathagar.com

অসহায় যুবার দেহ-কান্তি ও শৌর্য-বীর্য তাহার কুমারী হৃদয় জয় করিয়াছিল—এই দুই-ই সম্ভব।'[১]

আয়েষা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা, 'কতলু খাঁর প্রাসাদের কলুষিত আব-হাওয়ায় বাস করিয়াও আয়েষা তাহা হইতে মুক্ত।'[২] এই রমণীর মধ্যে বঙ্কিম-চন্দ্র অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। তাই 'ওসমানের সামনে জগৎসিংহকে প্রাণেশ্বর বলতে যেমন তার দ্বিধা নেই, তেমনি বিবাহের বধূ তিলোত্তমাকে অলঙ্কারে সাজিয়ে দিতেও তার আপত্তি নেই।'[৩]

আর একটি কথা, উপন্যাসে, পাঠান নারী আয়েষার আচরণ কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত মনে হতে পারে; কিন্তু স্মরণীয়, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ আফগান রমণীদের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করি। উক্ত প্রবন্ধে আছে 'পাঠান নারীর স্বাধীন এবং গোপন প্রণয় একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না।...'

সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'কিন্তু আয়েষার মধ্যে পাঠান বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা নারীর চিরন্তন আদর্শই প্রবল হয়েছে। বাঙালী চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও সে একেবারে বর্জন করেনি।'[৪]

ওসমান ও আয়েষা 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রধান মুসলিম চরিত্র। এই চরিত্র দুটি বঙ্কিমের অকৃত্রিম সহানুভূতির রসে সঞ্জীবিত। ইতিহাসের সেনাপতি ওসমান—সমর কৌশলী বীর, বিশ্বস্ত এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রণক্ষেত্রে আত্মসমর্পণে বিমুখ। উপন্যাসেও তার উপর এই গুণাবলী আরোপিত, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের বৃত্ত থেকে ওসমানকে মুক্ত করে বাস্তব পৃথিবীর আলোকে অবলোকন করেছেন। এখানে ওসমান ধৈর্যশীল, অভিজ্ঞ, সংযতবাক্, কিন্তু প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'উচিতা-নুচিৎ' জ্ঞানশূন্য। 'আমরা পাঠান—অন্তঃকরণ প্রজ্জ্বলিত হইলে উচিতানুচিৎ বিবেচনা করি না'—ওসমানের এই উক্তি, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের মানবিক উক্তির প্রতিধ্বনি। বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে ঈর্ষান্ধ প্রণয়ীর বর্ণে চিত্রিত করে তাকে আরও সজীব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই চরিত্রের আনুপূর্বিক পরিকল্পনায় তা অসঙ্গত বলে প্রতিভাত।

১ মোহিতলাল মজুমদার, "দুর্গেশনন্দিনী", 'বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা', কলিকাতা, ১৩৬০ পৃঃ ১২।

২ অরবিন্দ পোদ্দার, 'বঙ্কিম-মানস', কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬৬, পৃঃ ৫৬।

৩ জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২০।

৪ বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯।

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য, এই অসঙ্গতির অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও ওসমান বঙ্কিমচন্দ্রের সমদর্শী এবং নিরপেক্ষ শৈল্পিক দৃষ্টির দ্যোতক।

জগৎসিংহ এবং ওসমানের, দ্বৈরথে ওসমানের পরাভবে কাতর কোনো কোনো সমালোচক বঙ্কিমের পক্ষপাত-দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করার প্রয়াসী[১], আবার কেউ কেউ ওসমানকে, ইতিহাস-অবহেলিত পাঠানজাতির প্রতি বঙ্কিমের মমত্ববোধের প্রতীক বলে চিহ্নিত করেছেন।[২] কিন্তু আমাদের ধারণা তাঁদের কাছে বঙ্কিমের তীক্ষ্ণ এবং নিরপেক্ষ অন্তর্দৃষ্টি উপেক্ষিত।

আয়েষা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার ফসল, ইতিহাসের পাতায় তার নাম নেই। সে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না, কিঞ্চিৎ প্রগলভা। আয়েষা ওসমানকে বলছে, 'আয়েষা যে কর্ম্ম করে, তাহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারে'—তার প্রমাণ তার ঘোষণা, 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'। প্রণয় ঘোষণায় এই নারী যেমন মুক্ত কণ্ঠ, হৃদয়ের বেদনা দমনেও তেমনি অচঞ্চল। তাই তিলোত্তমাকে বধূ সজ্জায় সজ্জিত করতে সে নির্দ্বিধ। নিজের দুর্বলতা এবং প্রণয়াবেগ দমনের এই দুর্লভ ক্ষমতা তাকে আশ্চর্য মানবিক মহিমায় মণ্ডিত করেছে।

কেবল পাঠান রমণী বলেই বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষাকে এমন জীবন্ত বর্ণে অঙ্কিত করেন নি, তিনি আয়েষার মধ্যে প্রণয়-দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত অন্তরের একটি অবিকল চিত্র রূপায়িত করেছেন। ঔপন্যাসিক এক স্থানে আয়েষাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'তখন আর নবাবপুত্রী ভাব রহিল না ; স্নেহময়ী রমণী' বস্তুতঃ আয়েষা নবাবপুত্রী নয়—বঙ্কিমের দৃষ্টিতে সে প্রেম-বঞ্চিতা মানবীর প্রতীক, স্নেহময়ী রমণীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি।[৩]

১ ডঃ হাবিবর রহমান 'ওসমান ও জগৎসিংহ' প্রবন্ধে বলেন, '.....ওসমান জগৎসিংহ হইতে কোন অংশে হীন ছিলেন না।' —'নবনূর', ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১২। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শেষ পরিচ্ছেদ।

২ জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত বলেন ; 'Bankim Chandra introduced the Pathans in a mere favourable light than they had been placed hitherto. He thought that...it would ... go long way towards vindicating those virtues of the Pathans that had received scant justice at the hands of historians.'—Jayanta Kumar Das Gupta, *A Critical Study of the Life and Novels of Bankim Chandra*, Calcutta, 1937, p. 39.

৩ বঙ্কিমচন্দ্রের রসদৃষ্টি আয়েষা এবং জগৎসিংহকে জাতিধর্মের ঊর্ধ্বে, মানবধর্মের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নিয়ে গিয়েছে ; এ প্রসঙ্গে জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'আয়েষা ও জগৎসিংহ প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের কথা বড়ো নয়, বড়ো সেই নরনারী ধর্ম—যে ধর্ম জাতি, সমাজ ও পরিবার বন্ধনকে উপেক্ষা করে বিপন্ন পুরুষ জগৎসিংহকে ভালোবাসতে যুবতী আয়েষাকে প্রেরণা দিয়েছে। রসের দিক থেকে এই ভালোবাসার সত্য 'বহুমূল্যবান এবং সে কারণেই বঙ্কিমের রসদৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়।' —জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৭।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কপালকুণ্ডলা

'দুর্গেশনন্দিনী', উপন্যাসের মূল কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে মোগল পাঠানের বিরোধকে কেন্দ্র করে। সুতরাং সমগ্র উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র কাহিনীর প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'য় (১৮৬৬) মুসলিম প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাকে কাহিনীর নিয়ন্ত্রক বলা চলে না।

এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের রোমান্টিক কাহিনী। অবশ্য এই কাহিনীকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে, মতিবিবি ওরফে লুৎফ-উন্নিসা। বলা বাহুল্য, মতিবিবি মুসলমান রমণী নয়, সে আসলে ব্রাহ্মণ কন্যা। নিয়তির পরিহাসে তার ধর্মান্তর হয়, ব্রাহ্মণ কন্যাকে লুৎফ-উন্নিসা নাম ধারণ করে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হয়। উপন্যাসে তাকে মুসলিম রমণী হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে, তার আচার-আচরণ, বেশভূষা সবই মুসলমানী। কিন্তু ব্যাভিচারিণী মতিবিবি শেষে ইন্দ্রিয়বশ্যতা থেকে মুক্তি লাভ করে নিজেকে আবিষ্কার করলো—মুসলমান রমণীর নির্মোকের অন্তরালে ব্রাহ্মণ কন্যা পদ্মাবতীর হাহাকার সে শুনতে পেলো।

'কপালকুণ্ডলা'য় মুসলিম প্রসঙ্গের সূত্রপাত হয়েছে, নবকুমারের কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসার সময়, পথে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত ও লুণ্ঠিতা মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে। আহত মতিবিবি যখন নবকুমারের সঙ্গে রাতের আশ্রয়ের জন্য এক চটিতে গেল, তখন সেখানে দীপালোকে এই রমণীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে নবকুমার মুগ্ধ হলেন। '…নবকুমার দেখিলেন যে ইনি অসামান্যা সুন্দরী। রূপ রাশির তরঙ্গে যৌবন শোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।' অবশ্য ঔপন্যাসিক বলেন, 'ইনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নহেন' কারণ 'প্রথমতঃ ইঁহার শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরোষ্ঠ কিছু চাপা; তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন।' তথাপি এই রমণীর রূপ বর্ণনায় তাঁর লেখনী স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, 'সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশ বৎসর—ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্র মাসের নদী জলের ন্যায়, ইঁহার রূপ রাশি টলমল করিতেছিল উছলিয়া পড়ি-

www.pathagar.com

তেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্য্যের পরিপ্লবে মুগ্ধকর। পূর্ণ যৌবনভরে সর্ব্ব শরীর সতত ঈশচঞ্চল; বিনা বায়ুতে শরতের নদী যেমন ঈশচঞ্চল; তেমনি চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য মুহুঃর্মুহুঃ, নূতন নূতন শোভা বিকাশের কারণ। নবকুমার নিমেষশূন্য চক্ষে এই নূতন নূতন শোভা দেখিতেছিলেন।'

নবকুমারের কাছে মতিবিবি আত্ম-পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 'অভাগিনী বাঙ্গালী নহে, পশ্চিমপ্রদেশীয় মুসলমানী।' নবকুমার 'পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরিচ্ছদ পশ্চিমপ্রদেশীয় মুসলমানের ন্যায় বটে।'

ঔপন্যাসিক মতিবিবির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—'মতিবিবির পিতা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করার পর তাঁর নাম দিয়েছিলেন লুৎফ-উন্নিসা। 'মতিবিবি' কোন কালেও ইঁহার নাম নহে। তবে কখন কখন ছদ্মবেশে দেশে বিদেশে ভ্রমণকালে ঐ নাম গ্রহণ করিতেন।' মতিবিবির পিতা রাজকার্য নিয়ে সপরিবারে ঢাকায় আসেন। 'আকবর শাহের নিকট কাহারও গুণ অবিদিত থাকিত না; শীঘ্রই ইঁহার গুণ গ্রহণ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসার পিতা শীঘ্রই উচ্চ পদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরাহের মধ্যে গণ্য হইলেন।' লুৎফ-উন্নিসা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পারসিক, সংস্কৃত নৃত্য গীত প্রভৃতিতে পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন। কিন্তু 'দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই হয় নাই। ..যৌবনকালে মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফ-উন্নিসা সম্বন্ধে জন্মিল। তাঁহার পূর্ব্বস্বামী বর্ত্তমান,— ওমরাহরা কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কানাকানি, শেষে কালিমাময় কলঙ্ক রটিল।..'

একারণে তাঁর পিতা তাঁকে বহিষ্কার করেন। 'লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাহাদিগকে কৃপা করিতেন তন্মধ্যে যুবরাজ সেলিম একজন।[১] একজন কুল-কলঙ্ক জন্মাইলে পাছে আপন অপক্ষপাতী পিতার কোপানলে পড়িতে হয়, সেই আশঙ্কায় সেলিম এ পর্য্যন্ত লুৎফ-উন্নিসাকে আপন অবরোধবাসিনী করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সুযোগ পাইলেন।'

১ ...in 1597 Prince Selim had twenty lawful wives...'এঁদের মধ্যে পনের জন মহিষীর নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া আরও অনেক পরিচারিকাও ছিল। সেখানে মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসার সন্ধান মেলে না। —Beni Prasad, *History of Jahangir*, Allahabad, 5th ed. 1962, p, 28 (footnote).

www.pathagar.com

যুবরাজ লুৎফ-উন্নিসাকে তাঁর প্রধানা মহিষীর সহচরী করলেন। লুৎফ-উন্নিসা সহজেই সেলিমের চিত্ত জয় করলেন। এবং মনে মনে নিশ্চিত হলেন যে, যথা সময়ে তিনি সেলিমের 'প্রধানা মহিষীর আসন গ্রহণ করিবেন।' কিন্তু এমনি সময়ে লুৎফ-উন্নিসার ভাগ্যবিপর্যয়ের সূচনা হলো। 'আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ (আকাতমাদ-উদ্দৌলা) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবন কুলে প্রধানা সুন্দরী।' মেহের-উন্নিসার সৌন্দর্যের কথা সর্বকাল এবং সর্বজনবিদিত: 'Only thirtyfour at the time of her second marriage Miherunnisa or Nur Mahal 'Light of the palace' or Nurjahan 'Light of the world,' as she was styled, retained her charms in all their Neshness. No gift of nature seemed to be wanting to her. Beautiful with rich beauty of Persia, her soft featury were lighted up with spring letly vivality and supprable loveliness....Her name calls up at once slim lender frame, an oral face, and ample forehead large blue eyes, close lips.'[১]

সেলিম এর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পাণি গ্রহণ করতে মনস্থ করলেন। শের আফগানের সঙ্গে মেহের-উন্নিসার সম্বন্ধ পূর্বেই স্থির হয়েছিল। তাই সেলিম পিতার কাছে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে তিরস্কৃত হলেন। শের আফগানের সঙ্গে মেহের-উন্নিসার পরিণয় সম্পন্ন হলো। লুৎফ-উন্নিসা বুঝলেন সেলিম আকবরের মৃত্যুর পর অবশ্যই মেহের-উন্নিসাকে প্রধানা মহিষীর মর্যাদা দিয়ে নিয়ে আসবেন।

কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক সেলিম ও মেহের-উন্নিসার এই কাহিনীকে একটু অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, বাংলায় তখন নানা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সূচনা হয়। সে সময়ে শের আফগান বর্ধমানে জায়গীরদার ছিলেন। এই বিদ্রোহের সঙ্গে শের আফগানের যোগ আছে সন্দেহে, কুতুবউদ্দিন খাঁন (Governor of Bengal) তাঁকে বর্ধমানে গ্রেফতার করেন। সেখানে উভয়ের উত্তেজিত বিতর্কের সময় শের আফগান তরবারি দিয়ে কুতুবউদ্দিনের শিরচ্ছেদন করেন। কুতুবউদ্দিনের পারিষদবর্গ শের আফগানকে সঙ্গে সঙ্গে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। তারপর "Sher Afgun's widow and daughter Ladili Begum were sent to Court where Itimad ud-dullah held high office. Miherunnesa was soon after appointed a lady-in-waiting of the daughter Empress Sultan Selima

১ Beni Prasad, *op, cit.* p. 168.

www.pathagar.com

Begum. In March 1611 Jahangir happened to see at the vernal fancy bazar, fell in love with her and married her towards to close of May.'[১]

বেণীপ্রসাদ আরও বলেন আকবরের জীবিতাবস্থায় সেলিমের সঙ্গে মেহের-উন্নিসার প্রণয়, পরে শের আফগানের সঙ্গে তার বিয়ে বা শের আফগানের মৃত্যুর পর সেলিমের বিয়ের প্রস্তাব এবং মেহের-উন্নিসার প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি '...finds absolutely no support in the contemporary authorities.'[২]

মতিবিবি প্রধানা মহিষী হবার বাসনা ত্যাগ করলেন। 'অনতিকাল পরে মহম্মদীয় সম্রাট কুল গৌরব আকবরের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। যে প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভায় তুর্কী হইতে ব্রহ্মপুত্র প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে সূর্য্য অস্তগামী হইল। এ সময়ে লুৎফ-উন্নিসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিলেন।'

মানসিংহের ভগিনী সেলিমের প্রধানা মহিষী। লুৎফ-উন্নিসা তাঁর কানে কুমন্ত্রণা দিলেন। যুক্তি দিলেন সেলিমের পরিবর্তে তাঁর পুত্র খসরুকে সিংহাসন দান করার। বেগম সম্মত হলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা মানসিংহ ও খাঁ আজিমের শরণাপন্ন হলেন। খাঁ আজিম এই প্রস্তাবে আগ্রহী হলেন এবং অন্যান্য ওমরাহকে প্রভাবিত করলেন। কিন্তু যদি এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, এই ভেবে ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য লুৎফ-উন্নিসাকে উড়িষায় তাঁর ভ্রাতার কাছে পাঠালেন। তাঁর ভ্রাতা উড়িষ্যার মনসবদার। উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে লুৎফ-উন্নিসার সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়।

এই ষড়যন্ত্রের কথা ঐতিহাসিক। ইতিহাসে পাওয়া যায়, বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য মানসিংহ সেলিমকে বাংলায় যাবার নির্দেশ দেন। কিন্তু সেলিম আশঙ্কা করলেন, এই সুযোগে হয়তো তাঁর পুত্র খসরুকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার জন্য পথ পরিষ্কার করবে। সুতরাং তিনি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজি হলেন না এবং 'decided to retire no further than Allahabad where he had partisans.'[৩] তবে 'Intrigue in the palace continued and a powerful party, led by Aziz Koka and Raja Man Singh, desired that Selim should be set aside in favour of his son Khusra.'[৪]

---

১ Beni Prasad, *op. cit.* p. 162.

২ *Ibid*, p. 163.

৩ V.A. Smith, *Akbar The Great Moghul*, 2nd ed. Bombay, 1962, p. 219.

৪ *Ibid*, p. 231.

www.pathagar.com

নবকুমারের সাথে সাক্ষাতের পর লুৎফ-উন্নিসা বর্ধমানের পথে যাত্রা করলেন। পথে তিনি খাঁ আজিমের পত্রে জানলেন তাঁদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। বাদশাহ আকবর মৃত্যুকালে সেলিমকেই সিংহাসন দান করে গেছেন। লুৎফ-উন্নিসা দুর্ভাবিত হলেন। শেষে মেহের-উন্নিসা সত্য সত্যই তাঁর অনুরাগিনী কিনা তা নিশ্চিত হবার মানসে সেলিম মেহের-উন্নিসার বাড়ী উপস্থিত হলেন।

এখানে ঔপন্যাসিক পুনরায় মেহের-উন্নিসার রূপ ও গুণ বর্ণনা করেছেন :'.....মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধানা রূপবতী ও গুণবতী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুত তদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সৌন্দর্য্যে ইতিহাস কীর্ত্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তৎকালীন পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্যগীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া; কবিতা রচনায় বা চিত্র লিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সরল কথা তাঁহার সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও স্নেহময়ী ছিল...।' ইতিহাসে এই বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। 'Nature had endowed her with a quick understanding, sound intellect, a versatile temper, sound common sense,...she was versed in Persian literature and composed verses, limped and flowing, which associated her in capturing the heart of her husband.'[১]

লুৎফ-উন্নিসা কৌশলে জানলেন মেহের-উন্নিসা সেলিমের অনুরাগিনী এবং যখন তিনি শুনলেন সেলিম ইতিমধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তখন 'তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। মেহের-উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?'

পরে তিনি লুৎফ-উন্নিসাকে বললেন, যদি যুবরাজ তাঁর কথা জিজ্ঞেস করে তবে '...এই কহিও যে মেহের-উন্নিসা হৃদয় মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্ম-প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিবে। কিন্তু কখনও আপন কুলমান সমর্পণ করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনও দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামী হন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবে না।'[২]

১ Beni Prasad. *op. cit.*, p. 168.

২ মেহের-উন্নিসার এই কথা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না। —দ্রষ্টব্য, Beni Prasad, *op. cit.*, p. 163.

www.pathagar.com

মতিবিবির উদ্দেশ্য সফল হলো। তিনি মেহের-উন্নিসার মনের খবর জানতে পারলেন।

আগ্রায় ফিরে এসে তিনি সেলিমকে মেহের-উন্নিসার কথা বিস্তৃত বললেন এবং নিজে বিয়ে করে অন্যত্র যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেলিম বললেন 'কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র-সূর্য উভয়ে বিরাজ করে না?'

মতিবিবি এবার মনের অতলান্ত থেকে সত্য আবিষ্কার করে সহচরী পেষমনের কাছে ব্যক্ত করেছেন। সেটি হাহাকারের মত শুনিয়েছে। 'আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইতেছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরা বিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই। ...আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকে ভাল ভালবাসিয়াছি?'

লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রামে নবকুমারের গৃহের কাছেই এক অট্টালিকায় বসবাস শুরু করলেন। এরপরের চিত্র, নবকুমার লুৎফ-উন্নিসার ঘরে বসে আছেন।

লুৎফ-উন্নিসা নবকুমারকে বললেন, 'তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছুই কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ-রহস্য, পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে সকলই দিব; কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী।'

নবকুমার বললেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধন সম্পদ লইয়া যবনীদার হইতে পারিব না।'

'যবনীদার। নবকুমার এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে, এই রমণী তাঁহার পত্নী।'

লুৎফ-উন্নিসা শেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন,'..আর কিছু চাহি না, এক একবার এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও।'..

নব। 'তুমি যবনী পরস্ত্রী—তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।'

তখন স্রোতবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতি-বিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়ায়, দলিত-ফণা ফণিনী তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন 'এ জন্মে না তুমি আমারই হইবে।'

www.pathagar.com

নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' যবনীর নয়ন তারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন, 'আমি পদ্মাবতী।'

বিস্মিত নবকুমার প্রস্থান করলেন। লুৎফ-উন্নিসা দুই দিন রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে থাকলেন। তারপর একদিন ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে কৌশলে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এক অরণ্যে। আত্মপরিচয় দেবার পর বললেন, 'আমি তোমার সপত্নী।' তারপর আরও বিস্তৃত ঘটনা বর্ণনা করে কপালকুণ্ডলার কাছে প্রার্থনা জানালেন '...আমারও প্রতিদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।'

কপালকুণ্ডলা সেখান থেকে চলে গেলেন।

দূর থেকে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার পালক পিতা কাপালিক সব দেখলেন। বলা বাহুল্য এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কপালিকও যুক্ত ছিলেন। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে অবিশ্বাসিনী ও কুচরিত্রা বলে বিশ্বাস করলেন।

অবশেষে, কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার উভয়েই নদীবক্ষে আত্মবিসর্জন দিলেন। —পদ্মাবতী ওরফে লুৎফ-উন্নিসার ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হলো, কিন্তু তিনি কিছুই পেলেন না।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে মুসলিম চরিত্র তিনটি—মতিবিবি, নূরজাহান ও সেলিম। মুখ্য মতিবিবি। মতিবিবি-চরিত্রে ঔপন্যাসিকের সহানুভূতির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এর ব্যতিচারী জীবনের অন্তরালবর্তী নারী হৃদয়ের শাশ্বত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র মমতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'মতিবিবি মোগল রাজধানীর লালসা কলুষিত বিলাস সরোবরে রাজহংসীর মত ভাসিয়া স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়াও শান্তি ও সুখ পায় নাই।'[১] মোহিতলাল মজুমদার 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে মতিবিবি চরিত্রের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'প্রকৃতি ও পল্লী সমাজের যে মূল বর্ণভূমিকায় এই আখ্যান চিত্রিত হইয়াছে তাহার উপরে একটি বিপরীত বর্ণের অত্যুজ্জ্বল ছটা উদ্ভাসিত করিয়াছে এই মতিবিবির আবির্ভাব। উহার দ্বারা মোগল যুগের সভ্যতা সংস্কৃতি বিলাস ও ঐশ্বর্য, বৈদগ্ধ ও শিষ্টাচার যেমন ঐ পল্লী প্রতিবেশের মধ্যে আরও প্রেক্ষণীয় হইয়াছে, তেমনি মতিবিবি-চরিত্রে নারী প্রকৃতির যে আরেক রূপ তাহার সেই দুরন্ত ভোগপিপাসা—তাহাও কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের অতিশয় বিপরীত হইয়া, এই কাব্যের ভাব বস্তুকে অতিশয় পরিস্ফুট করিয়াছে।'[২]

১ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', কলিকাতা, ১৮৮৪ শক:, পৃ: ৪৩।

২ মোহিতলাল মজুমদার, 'বঙ্কিম-বরণ', কলিকাতা, ১ম সং, ১৩৫৬, পৃ: ৭৮।

www.pathagar.com

সুকুমার সেনের মত ভিন্ন, তিনি বলেন, 'মতিবিবির ভূমিকা সর্বত্র স্বাভাবিক নয়। নবকুমারের প্রতি মতিবিবির হঠাৎ অনুরাগ বাল্য বিবাহের সংস্কারজনিত বলিয়া মানিয়া লইলেও আকস্মিক ঠেকে।'[১]

নূরজাহান, উপন্যাসের প্রায় নেপথ্যেই থেকে গেছেন। উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমির সূত্র রক্ষা করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই তাঁকে পাওয়া যায়। তবু 'কপালকুণ্ডলায় নূরজাহানের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন, তা কল্পনাপ্রসূত হলেও ইতিহাসের সত্যকে লঙ্ঘন করেন নি। ...এই নারী পরবর্তীকালে যে বিচক্ষণতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার ইঙ্গিত বঙ্কিম এই উপন্যাসে দিয়েছেন।'[২]

নূরজাহান চরিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস-অনুসারী সন্দেহ নেই; কিন্তু এখানে তাঁর কল্পনার রং এবং কবিদৃষ্টির বিস্তন দুর্লভ নয়। এখনও কোনো পরমা সুন্দরী রমনীর সৌন্দর্য নূরজাহানের মানদণ্ডে বিচার করা হয়ে থাকে; বঙ্কিমচন্দ্রও যেন নূরজাহানকে নারী সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর গুণাবলীর সশ্রদ্ধ উল্লেখও উপন্যাসে লভ্য।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সেলিমের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। মতিবিবির সঙ্গে মাত্র কয়েকটি সংলাপেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। এই অত্যল্প অবকাশে সেলিমের যে পরিচয় বিধৃত, তা তাঁর বংশানুক্রমিক রমণী-বিলাসিতারই নানান্তর। ইতিহাসের ন্যায় উপন্যাসেও সেলিম সিংহাসন-লোলুপ, বহুনারী পরিবৃত। বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ নির্ণয়ের সুযোগ এখানে নেই। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুসলমান নারী চরিত্র অঙ্কনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন তিনি সহানুভূতিশীল, পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে তেমন নন।

১ সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৮।

২ বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃণালিনী

'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসে বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পটভূমিতে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তবে সমগ্র উপন্যাসেই মুসলিম প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতা সর্ব প্রথম সূচিত হয়। বখ্‌তিয়ার খিলজি অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ জয় করেন, "এই কাহিনী বা গল্প বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালী জাতির শৌর্য বীর্যের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। উক্ত জাতীয় কলঙ্ক বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি পুস্তকখানি প্রথম দুই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ইহাকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' আখ্যা দেন। পরবর্তী সংস্করণে তিনি উক্ত আখ্যা বর্জন করেন। কারণ তাঁর মতে বখ্‌তিয়ারের বঙ্গ-বিজয় উপলক্ষ করিয়া রচিত হইলেও ইহার ঐতিহাসিকতা সামান্য।"[১]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্য সন্দর্ভে' বলেন '...বঙ্গ ভাষার গদ্যে মৃণালিনীর সদৃশ সুচারু গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই, ...তাঁহার রচনা চাতুর্য্যের ও গল্প বিন্যাসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সমধিক উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে।'[২]

'মৃণালিনী' উপন্যাসের আখ্যায়িকার সূত্রপাত হয়েছে এইভাবে—হেমচন্দ্র দিল্লীতে বখ্‌তিয়ার খিলজির সামরিক অবস্থার গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে ফেরার পথে মথুরাতে মৃণালিনীর সাক্ষাৎ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে মাধবাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মাধবাচার্য মৃণালিনীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছিলেন।

মাধবাচার্য বললেন, '...তুমি দেব কার্য্য না সাধিলে কে সাধিবে? (উল্লেখযোগ্য যে 'দেবকার্য্য' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র 'যখন নিপাতকে' নির্দেশ করেছেন) তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবন নিপাত তোমার একমাত্র ধ্যান হওয়া উচিৎ। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন?' ...তিনি আরো স্মরণ করিয়ে

---

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, "উপন্যাস প্রসঙ্গ", 'মৃণালিনী', 'বঙ্কিম রচনাবলী' ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ৫ম সং, ১৩৭৬, পৃ : ৩১।

২ 'রহস্য সন্দর্ভ', ১২২৭-২৮, সংবৎ, ৫৭ খণ্ড, পৃ: ১৪২।

www.pathagar.com

দিলেন, এর আগে 'যবনাগমনকালে হেমচন্দ্র মৃণালিনীর মোহে মথুরায় ছিল বলেই মগধ শত্রু দখল করতে সক্ষম হয়েছে।'

হেমচন্দ্র 'যবন বধে' প্রতিশ্রুত হলে মাধবাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি দিল্লী গিয়া যবনের মন্ত্রণা কি জানিয়া আসিয়াছ?'

হেমচন্দ্র বললেন, 'যবনেরা বঙ্গ বিজয়ের উদ্যোগ করিতেছে। অতি ত্বরায় বখ্‌তিয়ার খিলজি সেনা লইয়া গৌড় যাত্রা করিবে।'

মাধবাচার্য উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'গণিয়া দেখিলাম যে, যবন সাম্রাজ্য ধ্বংস বঙ্গ রাজ্য হইতে হইবে।' মাধবাচার্য গৌড়ের প্রধান রাজার (লক্ষ্মণ সেন) সমীপে নিবেদন করলেন, '...আপনার অবিদিত নয় যে শত্রু দমন রাজার প্রধান কর্ম্ম। আপনি প্রবল শত্রু দমনের কি উপায় করিয়াছেন...? ...মহারাজ তুরকীয়েরা আর্যাবর্ত্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড় রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে।'

বৃদ্ধ রাজার অসহায় উক্তি '...আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। ...তুরকীয়েরা আসে আসুক।'

এই কথায় মাধবাচার্য দুঃখিত হলেন। 'তাহার চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রুপাত হইল। সভা-পণ্ডিত দামোদার বললেন, '.....শাস্ত্রে ঋষিবাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়েরা এদেশ অধিকার করিবে।' স্মরণ করা যেতে পারে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে গভীর বিশ্বাস এবং তুর্কী আক্রমণের ভয়ে ভীত পারিষদবর্গের এই পলায়নী মনোবৃত্তি মিনহাজের বর্ণনাতেও আছে।[১]

তুর্কীদের বঙ্গ-বিজয় নিঃসন্দেহে জ্যোতিষ শাস্ত্রের পূর্বাভাসের সত্য প্রতিপন্ন করে। কিন্তু এতে জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রশংসিত হলেও, হিন্দু রাজা এবং পরিষদবর্গের কাপুরুষতাই প্রমাণিত হয়। কেননা শাস্ত্র কথিত ভবিতব্যের অনিবার্যতার উপর বিশ্বাস রেখে রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাকে বিসর্জন দিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকা রাজনীতিকের লক্ষণ নয়। আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন, 'জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীবর্গ যে লক্ষ্মণ সেনকে যুদ্ধ না করিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয় রাষ্ট্রেরও প্রতিরোধ ইচ্ছা বিশেষ ছিল না, ভাগ্য নির্ভর পরাজয়ী মনোবৃত্তি রাষ্ট্রকেও গ্রাস করিতেছিল।'[২]

---

১ Minhaj-ud-din, *'Tabakat-i-Nasiri'*, Vol. I, (tr.) Major, H. G. Raverty, London, 1881, p. 556.

২ নীহার রঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', (আদি পর্ব), কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ৫০৮।

www.pathagar.com

তবু শাস্ত্র বাক্য নিয়ে মাধবাচার্যের সঙ্গে অনেক বিতর্কের পর গৌড়েশ্বরের প্রধানামাত্য পশুপতি বললেন, 'যবন আইলে আমরা যুদ্ধ করিব।' তিনি আরো জানালেন যুদ্ধের প্রস্তুতি যথারীতি চলছে।

মাধবাচার্য বললেন, 'যুবরাজ হেমচন্দ্র এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তিনি বর্তমানে গৌড়েই আছেন এবং ...রাজ্যাপহারক যবন এদেশে আগমন করিতেছে শুনিয়া এই দেশে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দস্যুর দণ্ড বিধান করিবেন। গৌড়রাজ্য তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া উভয়ে শত্রু বিনাসের চেষ্টা করিলে উভয়ের মঙ্গল।' সুতরাং নগরীর উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরবর্তী এক অট্টালিকায় হেমচন্দ্রের থাকার ব্যবস্থা হলো। সেই অট্টালিকার এক কোণে, জনার্দন নামে জনৈক বৃদ্ধ ও বধির ব্রাহ্মণ থাকতেন। সঙ্গে তাঁর পৌত্রী মনোরমা। একদিন গভীর রাতে হেমচন্দ্র জানালা দিয়ে 'শ্মশ্রু সংযুক্ত উষ্ণীষধারী মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া শয্যা হইতে লাফ দিয়া নিজ শাণিত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।' তিনি নিশ্চিত হলেন 'বঙ্গে তুরক অসিয়াছে'। সুতরাং 'ব্যাঘ্র যেমন আহার্য্য দেখিবামাত্র বেগে ধাবিত হয়, হেমচন্দ্র তুরক দেখিবামাত্র সেইরূপ ধাবিত হইলেন।' তাছাড়া ঔপন্যাসিক বলেন 'বিশেষ যবন বধে হেমচন্দ্রের আন্তরিক আনন্দ। উষ্ণীষধারী মুণ্ড দেখিবা অবধি তাঁহার জিঘাংসা ভয়ানক প্রবল হইয়াছে।'

হেমচন্দ্র মনোরমার কাছে জানলেন, সে তুরকবেশী এক ব্যক্তিকে দেখেছে। এবার ঔপন্যাসিক হেমচন্দ্রের জবানীতে তাঁর যবন বিদ্বেষের কথা প্রকাশ করেছেন :

'মনো। মানুষ মেরে কি হবে ?

হেম। তুরক আমার পরম শত্রু। ...আমি যত তুরক দেখিতে পাইব, তত মারিব।'

যবন যুদ্ধে এই বালিকা পথ প্রদর্শিনী হয়ে পশুপতির গৃহ দেখিয়ে বললো, 'ঐখানে যবন প্রবেশ করিয়াছে।' যে ব্যক্তি পশুপতির গৃহে গোপনে প্রবেশ করেছিল, 'সে তুরক সেনাপতির বিশ্বাসপাত্র'। নাম মহম্মদ আলী। মহম্মদ আলী ও পশুপতির কথপোকথন শুরু হলো। মহম্মদ আলীর ভাষাকে ব্যঙ্গ করে, ঔপন্যাসিক বলেন, '..যবন সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতে তিন ভাগ ফারসী আর অবশিষ্ট চতুর্থভাগে যেরূপ সংস্কৃত, তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা মহম্মদ আলীরই সৃষ্ট সংস্কৃত। পশুপতি বহু কষ্টে তাঁহার সংস্কৃত উদ্ধার করিলেন।'

www.pathagar.com

উভয়ের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে দর কষাকষির পর পশুপতি নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন, '...আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি। সেন বংশ লোপ পাইয়া পশুপতি গৌড়াধিপতি হউক। ..মুসলমানের অধীনে করপ্রদ রাজা হইব।' এবং এ ব্যাপারে মুসলমানের সাহায্যের প্রয়োজন, কেননা স্ববলে যদি পশুপতি সেন রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে তা'হলে লোক-নিন্দার সম্ভাবনা। সুতরাং পশুপতির সংলাপ, '..আপনারা কিছু মাত্র যুদ্ধোদ্যম দেখাইয়া আমার আনুকূল্যে রাজধানী প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে [সেন রাজাকে] সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে তদুপরি স্থাপিত করিলে সে নিন্দা হইবে না।'

মহম্মদ আলী এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আমিও এইরূপ স্পষ্ট করিয়া খিলিজী সাহেবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি এক্ষণে অনেক বিষয়ে ব্যস্ত আছেন যথার্থ, কিন্তু হিন্দুস্থানে যবন রাজ একেশ্বর হইবে না। অন্য রাজার নাম আমরা রাখিব না। কিন্তু আপনাকে গৌড়ের শাসনকর্তা করিব।..আর এক কথা বাকী আছে। এই দেশে যবনের পরম শত্রু হেমচন্দ্র বাস করিতেছে। আজ রাতেই তাহার মুণ্ড যবন শিবিরে প্রেরণ করিতে ইহবে।' পশুপতি সম্মত হলেন। এই ষড়যন্ত্রের সহায়ক শান্তশীলকে পশুপতি হেমচন্দ্রের হত্যার দায়িত্ব দিলেন। বলাবাহুল্য, শান্তশীল পূর্বাহ্ণেই হেমচন্দ্রকে 'চিত্তগৃহে' কৌশলে বন্দী করে এসেছিল।

মনোরমা গোপনে মহম্মদ আলী ও পশুপতির ষড়যন্ত্রের কথা শুনেছিল। সে পশুপতিকে এই 'মহাপাপ কার্য্য' থেকে বিরত থাকার জন্য বললো, 'তোমার প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার কল্পনা করিতেছ, শরণাগত রাজপুত্রকে মারিবার কল্পনা করিতেছ, ইহা কি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম নয়?' এখানে মনোরমা স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমের মানসপুত্রী হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এ যেন বঙ্কিমচন্দ্রের নেপথ্য উক্তি। কিন্তু পশুপতি তার সিদ্ধান্তে অটল। যাবার সময় মনোরমা হেমচন্দ্রকে চিত্র গৃহ থেকে মুক্ত করে গেল।

ইতিমধ্যে মাধবাচার্য বিভিন্ন স্থান পর্যটন করে, ফিরে এসে জানালেন অন্যান্য হিন্দুরাজগণ সেন রাজাকে আসন্ন যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য অনতিবিলম্বে নবদ্বীপে মিলিত হবেন। কিন্তু যখন হেমচন্দ্রের কাছে শুনলেন, যে-কোন মুহূর্তে 'যবন সেনা' নগর আক্রমণ করতে পারে, তখন মাধবাচার্য বিস্মিত ও শিহরিত হয়ে জানতে চাইলেন, গৌড় রাজ্যের পক্ষ থেকে এই আক্রমণ প্রতিরোধের কোন উদ্যোগ হয়েছে কিনা। জানা গেল, গৌড়রাজ এ ব্যাপারে অনহিত, সুতরাং তাঁরা নির্লিপ্ত।

নির্দিষ্ট দিনে বখতিয়ারের 'সপ্তদশ সৈন্যের' আক্রমণ ঘটলো। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা, 'বেলা প্রহরেকের সময় নগরবাসীরা বিস্মিত লোচনে দেখিল, কোন অপরি-

www.pathagar.com

চিত জাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজ ভবনাভিমুখে যাইতেছে। ..তাহাদিগের শরীর আয়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট ; তাহাদের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভ ; তাহাদিগের মুখমণ্ডল বিস্তৃত, ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজিবিভূষিতা নয়ন প্রশস্ত, জ্বালা বিশিষ্ট। তাহাদিগে পরিচ্ছদ অনর্থক চাক্‌চিক্য বিবর্জ্জিত ; তাহাদিগের যোদ্ধাবেশ, সর্ব্বাঙ্গ পহরণ জাল মণ্ডিত, লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর যে সকল সিন্দুপার-জাত অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়া যাইতেছিল, তাহারাই বা কি মনোহর। পর্ব্বত শিলা খণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার, বিমার্জ্জিত দেহ, বক্রগ্রীব, বল্গারোধ-অসহিষ্ণু, তেজোগর্ব্বে নৃত্যশীল। আরোহীরা কিবা তচ্চালক-কৌশলী-অবলীলাক্রমে সেই রুদ্ধবায়ুতুল্য তেজঃপ্রখর অশ্বসকল দমিত করিতেছে। দেখিয়া গৌড়বাসীরা বহুতর প্রশংসা করিল।'

লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র 'যবন সেনাদের' দৈহিক গঠন, সৌন্দর্য, বেশভূষার পারিপাট্য, চলনভঙ্গি, তেজ প্রভৃতির সপ্রশংস বর্ণনা দিচ্ছেন। এ থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয়, তিনি সৌন্দর্য এবং বীর্যের পূজারী—তা স্বজাতি বা বিজাতি যার-ই হোক।

সপ্তদশ অশ্বারোহী প্রায় অবাধেই রাজপুরীতে প্রবেশ করলো : 'সর্ব্বাগ্রে একজন খর্ব্বাকায় কুরূপ যবন'। অ-প্রস্তুত দৌবারিকগণ তাকে বাধা দিতে গেলে যবন বললো, 'ফের নচেৎ এখনই মারিব।' তারপর 'ষোড়শ অশ্বারোহীদিগের মধ্য হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল।'...তাদের 'কটিবন্ধ হইতে...অসি ফলক নিষ্কোসিত হইল এবং অশনি সম্পাত সদৃশ তাহারা দৌবারিকদিগকে আক্রমণ করিল। দৌবারিকগণ রণসজ্জায় ছিলনা..মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই নিহত হইল।

ক্ষুদ্রকায় যবন তহিল, 'যেখানে যাহাকে পাও, বধ কর। পুরী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।'

তখন যবনেরা পুরমধ্যে তাড়িতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বালকবৃদ্ধবণিতা পৌরজন যেখানে যাহাকে দেখিল, তাহাকে অসি দ্বারা ছিন্নমস্তক অথবা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল।'

বৃদ্ধ রাজা তখন আহার করতে বসেছিলেন। কলরব শুনে তিনি বিচলিত হলেন। একজন সংবাদ দিলো, 'যবন সকলকে বধ করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে।'...

'কবলিত অন্নগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল।' তিনি প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। মহিষী তাঁকে সাহস দিলেন, 'চিন্তা কি? নৌকায় সকল দ্রব্য গিয়াছে, চলুন আমরা খিড়কী দ্বার দিয়া সোনারগাঁও যাত্রা করি।'[১] মহিষী রাজার

১ লক্ষ্মণ সেনের মহিষীর কথায় মনে হয় তাঁদের পলায়নের উদ্যোগ আগে থেকেই চলছিলো।

www.pathagar.com

'অধৌত হস্ত ধারণ' করে খিড়কী দ্বার দিয়ে পলায়ন করলেন। ষোড়শ সহচর নিয়ে 'গর্কটাকার' বখ্‌তিয়ার খিলজী রাজপুরী অধিকার করলো।

এই ঘটনা সম্পর্কে সংশয়ী ঔপন্যাসিক আর নেপথ্যে থাকতে পারলেন না। কাহিনীর স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ করে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর সক্ষোভ মন্তব্য শোনা গেল, 'ষষ্টি বৎসর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউদ্দিন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা কে জানে? যখন মানুষের চিত্রে পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তাস্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ লিখিত হইত? মনুষ্য মুষিক তুল্য হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা 'আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।'

স্বল্পসংখ্যক যবন সেনা কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের এই মুখরোচক কাহিনী বঙ্কিম-চন্দ্র স্বীকার করেন নি। তিনি এই কাহিনীকে হিন্দুজাতির পক্ষে একটি ভিত্তি-হীন এবং অন্যায় কলঙ্ক বলে বিবেচনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয় সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকদের মতামত আলোচনা করা যেতে পারে।

কৈশোরাবস্থা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। যখন তিনি মাত্র 'একাদশ বর্ষের বালক' তখনই প্রচলিত প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস তাঁর 'কণ্ঠস্থ' ছিলো।[১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, তখন ভারত-বর্ষের ইতিহাস রচিত হয়নি, ইউরোপের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন।[২] কলেজের ছাত্রাবস্থায় তিনি 'a distinguished historian' বলে অভিহিত হতেন।[৩] কিন্তু 'বাঙ্গালার ইতিহাসের' অভাব পরবর্তী জীবনে তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিলো। তিনি আক্ষেপ করেছিলেন, 'সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।'[৪]

সেকালে প্রচলিত বিদেশীদের দ্বারা রচিত (বিশেষত মুসলমানরচিত) 'বাঙ্গালার ইতিহাস' তিনি সত্য এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন নি। কেননা তিনি

১ দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, "বঙ্কিম-চরিত", 'বঙ্গদর্শন', শ্রাবন, ১৩১৮, পৃ. ১৫৩।

২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে (কলিকাতা-১৩২০) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ; উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, 'বঙ্কিমচন্দ্র', ৫ম সং; কলি-কাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৪৯।

৩ উদ্ধৃত, বিজিত কুমার দত্ত, 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস,' পৃ. ৫৯।

৪ "বাঙ্গালার ইতিহাস," 'বঙ্গদর্শন', মাঘ, ১২৮১, পৃ. ৪৪৮।

www.pathagar.com

মনে করতেন 'কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।'[১] বিদেশীদের কাছে বাঙ্গালার ইতিহাস-ধ্যান প্রত্যাশিত নয়। তাই তিনি নিজে এই ইতিহাস-ধ্যানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।[২] বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলেও জানা যায়।[৩] এই ইতিহাস-চেতনাই তাঁর স্বাজাত্যবোধের উৎস। এবং তাঁর ইতিহাস-চেতনার অভিক্ষেপ প্রথম লক্ষিত হয় 'মৃণালিনী' উপন্যাসে।[৪]

এখন, বঙ্কিমচন্দ্র যাঁর বর্ণনা থেকে বখ্‌তিয়ারের বঙ্গ-বিজয়ের কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন (অর্থাৎ মিনহাজউদ্দিনের) সংক্ষেপে সেটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

মিনহাজ উদ্দিন বলেছেন, বখ্‌তিয়ারের আক্রমণের এক বৎসর আগেই রাজ-জ্যোতিষী এবং বিজ্ঞব্যক্তিগণ রাজা লক্ষ্মণসেনকে জানিয়েছিলেন যে, এদেশ অতি শীঘ্রই তুর্কীদের করতলগত হবে। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে তাঁর সদলবলে দেশ ত্যাগ করা সমীচীন। তাঁরা ভাবী বঙ্গবিজেতার বিচিত্র শারীরিক গঠনের বর্ণনা দেন। জ্যোতিষীদের কথিত সময়ে যথারীতি বখ্‌তিয়ার খিলজী বিহার থেকে সহসা 'appeared before the city of Nudia, in such wise that no more than eighteen horsemen could keep up with him, and the other troops followed after him. On reaching the gate of the city, Muhammad-i-Bakht-yar did not molest any one, and proceeded onwards steadily and sedately, in such manner that the people of the place imagined that mayhap his party were merchants and had brought horses for sale, and did not imagine that it was Muhammad -i-Bakht-yar, until he reached the entrance to the palace of Rae Lakhmaniah, when he drew his sword, and commenced an onslaught on the unbelievers.

---

১ "বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ," 'বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯, পৃ. ৭১।

২ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'দেশের প্রাচীন ইতিহাসের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্বে কেহ তাহা করেন নাই এবং এই বিষয়ে তিনি বর্তমানের পথ প্রদর্শক।'—'বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে,' 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা,' শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮০, পৃ. ৫৩-৫৪।

৩ দ্রষ্টব্য, নবীনচন্দ্র সেন, "আমার জীবন," নবীনচন্দ্র-রচনাবলী,' ২য় খণ্ড, সজনীকান্তদাস সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬৬ পৃ ১৬২।

৪ এরপর তার বিখ্যাত পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯) প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই ইতিহাস-অনুসন্ধানী-প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন। প্রথম সংখ্যা তিনি ভারতের কলঙ্ক মোচনের প্রয়াস পেলেন 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে।—দ্রষ্টব্য, 'বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ, ১২৭৯, পৃ. ৭—১৯।

www.pathagar.com

At this time Rae Lakhmaniah was seated at the head of his table, and dishes of gold and silver, full of victuals, were placed according to his accustomed routine, when a cry arose from the gateway of the Rae's palace and the interior of the city. By the time he became certain what was the state of affairs, Muhammad-i-Bakht-yar had dashed forwards through the gateway into the palace, and had put several prsons to the sword. The Rae fled barefooted by the back part of his palace;'[১]

'রিয়াজ-উস-সালাতিন',[২] স্টুয়ার্ট[৩] এবং মিলের[৪] ইতিহাসেও এই কাহিনীর অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন অষ্টাদশ মুসলমান সৈন্য বণিকের বেশে শহরে প্রবেশ করেছিলো ; কারো কারো মতে স্বল্প সংখ্যক সেনাকে সহায়তা করার জন্য আরো সেনা অন্যত্র লুক্কায়িত ছিলো। তবে তাঁরা সবাই একমত সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ সংখ্যক সৈন্য নিয়েই বখতিয়ার রাজপুরী অধিকার করেছিলো।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মিনহাজ-কথিত কাহিনীর সত্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মিনহাজের বর্ণনার বিস্তৃত আলোচনা করে বলেন, বখতিয়ার সহজে বঙ্গদেশ অধিকার করতে পারেননি ; তিনি লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্তী কয়েকটি পরগণামাত্র দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫] প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে।[৬] অন্যত্র তিনি বিপুল তথ্যযোগে এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করে বলেছেন 'মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেন রাজাগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু যেভাবে বিজয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।'[৭]

---

১ 'The Tabakat-i-Nasiri,' vol, I, (Tr.) Major H.G. Raverty, New Delhi, 1970. (Reprint), pp. 551-58.

২ দ্রষ্টব্য, Ghulam Husain Salim, 'Riyazu-S-Salalatin,' (tr.) Maulavi Abdus Salam Calcutta, 1902, pp. 62-63.

৩ C. Stewart, 'History of Bengal', p. 27.

৪ V.A. Smith, 'Oxford History of India,' O.U P., 1920, p. 221.

৫ ''লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন কলঙ্ক,'' 'প্রবাসী,' মাঘ, ১৩১৫, পৃ. ৫৩৩-৩৬।

৬ 'নারায়ণ,' বৈশাখ, ১৩৩২, পৃ. ৫৯৭-৬০৬।

৭ দ্র. বাঙ্গলার 'ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, কলিকাতা, সংশোধিত ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ. ৩০৬। জনৈক বিদেশী ঐতিহাসিক ও মিনহাজের বর্ণনায় কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। দ্র.

www.pathagar.com

রমেশচন্দ্র মজুমদার মিনহাজের বর্ণনা অস্বীকার করে বলেন, শাস্ত্রকারগণ বলেছিলেন অচিরে নদীয়া তুর্কী-কবলিত হবে, অথচ রাজা কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেননি—একথা যেমন অবিশ্বাস্য, বিপদকালে সৈন্য বা পারিষদবর্গের নির্লিপ্তিও তেমনি অভাবনীয়।[১] তিনি অনুমান করেন, এমনও হতে পারে '...that the Muslim chroniclers have given an exaggerated account of the extent and importance of Muhammad's conquest in Bengal.'[২]

একমাত্র নীহাররঞ্জন রায় মিনহাজের বর্ণনাকে 'প্রায় ঔপন্যাসিক কাহিনী' বলে অভিহিত করেও এই মত প্রকাশ করেন যে, প্রাচ্য ইতিহাসে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অতর্কিত আক্রমণে কোনো নগর-জয়ের ঘটনা একেবারে অজ্ঞাত বা কল্পনা-প্রসূত নয়। অতএব মিনহাজের বর্ণনাকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। তাঁর অনুমান জ্যোতিষী এবং মন্ত্রীবর্গ যে লক্ষ্মণসেনকে দেশ-ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলো, তার কারণ 'রাষ্ট্রেরও প্রতিরোধ-ইচ্ছা বিশেষ ছিল না, ভাগ্য-নির্ভর পরাজয়ী মনোবৃত্তি রাষ্ট্রকেও গ্রাস করিয়াছিল।' এবং এমনও হতে পারে 'লক্ষ্মণ সেনের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্র নানা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে ভিতর হইতে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।'[৩]

পরবর্তী সব ঐতিহাসিকই এই ঐকমত্যে পৌঁচেছেন যে বখতিয়ার খিলজী স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে নবদ্বীপ জয় করেছিলেন, সমগ্র বঙ্গদেশ নয়। এই সিদ্ধান্ত আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাগ্রে মিনহাজ-কথিত কাহিনীকে অলীক ব'লে নাকচ করেন। অথচ তাঁর হাতে সহযোগী কোনো ঐতিহাসিক তথ্য ছিলো না। তথ্য-বিনির্ভর বিশ্বাসকে রূপায়িত করার ক্ষেত্র ইতিহাস নয়—উপন্যাস। সুতরাং তিনি 'মৃণালিনী' উপন্যাসে কল্পনা করলেন, সপ্তদশ মুসলমান সৈন্য কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের মূলে ছিলো রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা।[৪] এই কল্পনা একেবারে অবাস্তব বা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু

Sir W. Haig (ed.), 'The Cambridge History of India,' vol. III, Cambridge, 1928. p. 46 (f.n.).

১ 'History of Bengal,' Vol. I, (ed), R.C. Majumdar, Dacca, 1943, p. 244.

২ *Ibid*, p. 224.

৩ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস,' আদি পর্ব, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৯, পৃ. ৫০৯-১৩।

৩ গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন 'এই দুঃখ ঘুচাইবার তখনকার একমাত্র উপায়—উপন্যাস লিখিয়া লোকের মনে অন্যভাব জাগাইয়া দেওয়া। তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি করিলেন—মৃণালিনীতে পশুপতি সৃষ্টি হইল।'—"পশুপতি,'' 'নবজীবন,' আষাঢ়, ১২৯৫, পৃ. ৭৩৮।

www.pathagar.com

যুক্তি-যুক্ত কল্প-কাহিনী দিয়ে স্বজাতির গৌরব প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ। তাই তাঁকে 'মৃণালিনী'র পর এ বিষয় নিয়ে আরো অনেক চিন্তা করতে দেখা যায়। তাঁকে নিতে হয়েছে 'ভারত কলঙ্ক'-মোচনের দায়িত্ব, শুরু হয়েছে ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু প্রবন্ধ রচনা।[১] প্রমাণ করতে হয়েছে 'বাঙ্গালির বাহুবল' সংশয়াতীত;[২] তা না হ'লে সপ্তদশ মুসলমান সেনা কর্তৃক বিজিত হবার কলঙ্ক অপনোদন করার ঐতিহাসিক ভিত্তি কোথায়?

এই সময় তিনি পেলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪)। গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তিতে[৩] মর্মাহত হয়েও সেটিকে 'সুবর্ণের মুষ্টি' বলে তিনি অভিনন্দন জানালেন।[৪] কেননা তাতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হিন্দু নৃপতিদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণিত। বিশেষত গ্রন্থকার বলেছেন, বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী সপ্তদশ সৈন্য নিয়ে কেবল নবদ্বীপ অধিকার করেন এবং 'এদেশের পূর্ব্ব এবং দক্ষিণাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হইলে, তাঁহারা সমস্ত অধিকৃত প্রদেশের নাম বাঙ্গালা রাখেন'।[৫] অনতিপরেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করতে চাইলেন বখ্‌তিয়ারের সহজ-বাংলা-বিজয়ের কাহিনী একটি 'ঐতিহাসিক ভ্রম' ছাড়া কিছুই নয়।[৬] তিনি এতোদিনে তাঁর কল্পনার একটি নিশ্চিত ভিত্তির সন্ধান পেলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা কর্ত্তৃক কেবল মধ্যভাগ বিজিত হইয়াছিল।'[৭]

অন্যত্রও তিনি ভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে বাঙ্গালির ইতিহাস পর্যালোচনা করে, স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের কাছে বাঙ্গালির বিজিত হবার কলঙ্ক

---

১ দ্রষ্টব্য, "ভারত কলঙ্ক," 'বঙ্গদর্শন,' ১২২৯, পৃ. ৭-১৯।

২ দ্রষ্টব্য, "বাঙ্গালীর বাহুবল", ঐ, শ্রাবণ, ১২৮৯, পৃ. ১৪৫-৫৪।

৩ তৎকালীন পত্রিকাও গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে পরিশেষে মন্তব্য করে, 'এই মাত্র দুঃখ যে তাঁহার এই পুস্তকে যে পরিমাণ ক্ষুধা জন্মে, সে পরিমাণ ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়াছে।—"প্রথম শিক্ষা, বাঙ্গালার ইতিহাস," 'বান্ধব' পৌষ, ১২৮১, পৃ. ১৮৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই গ্রন্থের প্রশংসা করেন। দ্রষ্টব্য, "রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনী," 'প্রচার,' ৩য় খণ্ড (মাসের উল্লেখ নেই), ১২৯৩-৯৪, পৃ. ২৬৫।

৪ "বাঙ্গালার ইতিহাস," 'বঙ্গদর্শন,' মাঘ, ১২৮১, পৃ. ৪৫০।

৫ 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস,' ২য় সং, কলিকাতা, ১৮৭৫, পৃ. ১০-১৭।

৬ "ঐতিহাসিক ভ্রম," 'বঙ্গ দর্শন,' ভাদ্র, ১২৮১, পৃ. ২২৯-৩৭।

৭ "বাঙ্গালার ইতিহাস," 'বঙ্গদর্শন,' মাঘ, ১২৮১, পৃ. ৪৫১।

www.pathagar.com

দূর করতে চাইলেন।[১] এবং বললেন, সপ্তদশ সৈন্য নিয়ে বখ্‌তিয়ার বঙ্গজয় করেছিলো, 'একথা যে বাঙ্গালি বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার',[২] আসলে তা' 'বালক মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র'।[৩]

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেলো, স্বল্প সংখ্যক পাঠান সেনা কর্তৃক বিজিত হবার কলঙ্ক থেকে বাঙ্গালিকে মুক্ত করার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাস রচনার প্রেরণা লাভ করেন। এ কারণেই মিনহাজের বর্ণনাকে প্রায় অবিকৃত রেখে, এই ঘটনার নেপথ্যে অপর একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কল্পনা করলেন। এর ফলে একটি ঐতিহাসিক তথ্যের অপূর্ণতা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার ঐশ্বর্যে বিশ্বাস-যোগ্য পূর্ণতা লাভ করলো।

বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী নগর দখল করার পর পশুপতিকে ডেকে পাঠালেন। পশুপতি 'রাজভৃত্যবর্গের রক্ত নদীতে চরণ প্রক্ষালন' করে খিল্‌জী সমীপে উপস্থিত হলেন। খিল্‌জী বললেন, 'পণ্ডিতবর রাজসিংহাসন আরোহনের পথ কুসুমাবৃত নহে। এ পথে চলতে গেলে বন্ধুবর্গের অস্থি মুণ্ডু সর্ব্বদা পদে বিদ্ধ হয়।'

পশুপতি পূর্বকৃত চুক্তি বাস্তবায়নের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। খিল্‌জী বললেন, '...আপনাকে ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। ...কেননা এমন কখনও সম্ভাবনা যে, মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করিয়াই আবার হিন্দুকে রাজ্য দিবে।'

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে খিল্‌জীর, ধর্মীয় ব্যাপারে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে পশুপতিকে মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রায়শ্চিত্তের সম্মুখীন করেছেন। কিন্তু স্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র আর অগ্রসর হন নি। পশুপতি এবার সদর্পে বলেছেন, 'আমি স্থির সংকল্প হইয়াছি যে, যবন সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্যও সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া নরকগামী হইব না।' ঔপন্যাসিক পশুপতিকে পাপের সাগর থেকে তুলে আনলেন। খিল্‌জী বলেছেন, 'ইহা আপনার ভ্রম। যাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছেন, সে ভূতের পূজা মাত্র। কোরাণ উক্ত ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম। মহম্মদ ভজিয়া ইহকাল পরকালের মঙ্গল সাধন করুন।

---

১ "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার (দ্বিতীয় প্রস্তাব)," ঐ অগ্রহায়ণ, ১২৮২, পৃ. ৩৬০।

২ "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা," ঐ, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭, পৃ. ৩৬৪।

৪ "বাঙ্গালার কলঙ্ক," 'প্রচার,' শ্রাবণ, ১২৯১, পৃ. ৭। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত প্রবন্ধের তথ্যগত ত্রুটি প্রদর্শন করে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক কৈলাশচন্দ্র সিংহ দু'টি প্রতিবাদী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য, "বাঙ্গালার কলঙ্ক (প্রতিবাদ)," নব্যভারত,' ভাদ্র, ১২৯১, পৃ. ২১৯-২৬; ও "হদ্দ জবাব," ঐ, পৌষ, ১২৯১, পৃ. ৪৩২-৩৪।

www.pathagar.com

পশুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন। বখ্‌তিয়ার যদি পশুপতি অপেক্ষা চতুর না হইতেন তবে এত সহজে গৌড় জয় করিতে পারিতেন না। বঙ্গভূমির অদৃষ্ট-লিপি এই যে, 'এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবেনা; চাতুর্য্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইভ ইহার দ্বিতীয় পরিচয় স্থান।' অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের দুঃখ, বঙ্গভূমি বাহুবলে কোনো-কালেই হীন নয়, কিন্তু অন্যায় ছল-চাতুরীর কাছে চিরপরাজিত।

পশুপতি বন্দী হলেন। 'সেইদিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল।' স্বদেশের অসহায় পরাজয়ে ঔপন্যাসিকের অন্তর-মথিত উক্তি হৃদয়স্পর্শী : 'নবদ্বীপ জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না।' আবার পরক্ষণেই তাঁর স্বগত জিজ্ঞাসা 'আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই তো স্বাভাবিক নিয়ম।'

এবার ঔপন্যাসিক বিজয়ী-পাপিষ্ঠ-যবনদের অত্যাচারের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন, 'সেই নিশীথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্মত্ত যবন সেনার নিষ্পীড়নে বাত্যাসন্তাড়িত তরঙ্গোৎপেক্ষী সাগরসদৃশ চঞ্চল হইয়া উঠিল।..... মাতার রোদন শিশুর রোদন বৃদ্ধের করুণাকাঙ্ক্ষা যুবতীর কন্ঠ বিদার...' ইত্যাদি।

মুসলমানদের এহেন লুণ্ঠনে ও হত্যাকাণ্ডে হেমচন্দ্র ক্ষুব্ধ হলেন এবং ভাবলেন 'একটি একটি যবন মারিয়া কি করিব? যবন যুদ্ধ করিতেছে না যবন বধেই বা কি সুখ।' সুতরাং তিনি নিরীহ ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদের রক্ষা কার্যে মনোনিবেশ করলেন। এখানে অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায়, যবনরা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? প্রতিপক্ষ কোথায়? হেমচন্দ্র প্রত্যক্ষ সমরের সম্মুখীন হননি এবং হলেও একাকী সেই 'প্রবল সেনা'দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার সার্থকতা কোথায়? এ প্রশ্নের মীমাংসা উপন্যাসে নেই।

যাই হোক, এই সুযোগে মাধবাচার্য আবার হেমচন্দ্রকে আশ্বাস বাক্য শোনালেন, 'যবন পরাভূত হইবে।...সকল রাজা একত্র হইয়া প্রাণপণ করিলে যবন কি বিজিত না হইবে?' তাঁর বিশ্বাস তাঁর গণনা একদিন ফলবতী হবেই।

বন্দী পশুপতিকে, 'মহম্মদ আলী স্বহস্তে যবন বেশ পরাইলেন।' তারপর তাঁকে রাজপথে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ধর্ম্মাধিকার।...বখ্‌তিয়ার খিলজীর এরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্ত্তাবহ হইয়া আপনার নিকট যাইতাম না। যাহা হউক, আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া এরূপ

www.pathagar.com

দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। গঙ্গাতীরে নৌকা প্রস্তুত আছে, আপনি যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করুন।...পশুপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবাক হইয়া রহিলেন।'

এখানে শিল্পী বঙ্কিমের অপক্ষপাতদৃষ্টি দিবালোকের মতো সচ্ছ হয়ে উঠেছে। তিনি মহম্মদ আলীর প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে তার নিরাপরাধ এবং অনুতপ্ত অন্তরের চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। এতে অবশ্য তার আর একটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে; হিন্দুর পরম শত্রু বখ্‌তিয়ারের প্রবঞ্চনাকে একজন মুসলমানের জবানীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

কিন্তু দেশদ্রোহী পশুপতি স্বদেশ প্রেমিক বঙ্কিমের দণ্ড থেকে মুক্তি পাননি। তাঁকে শেষ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। পশুপতি দেখলেন তাঁর বাড়ি-ঘর ভস্মীভূত। তাঁর মনে হলো মনোরমার কথা। তিনি ভাবলেন 'এ যবন প্রবাহে সে কুসুম কলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।' পশুপতির চিত্তবিকার ঘটলো। তিনি জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু আগেই মনোরমা সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলো।

'যবনেরা নগর লুঠ শেষ করিয়া তৃপ্ত হইলে, বখতিয়ার খিলজি অনর্থক নগর-বাসীদিগের পীড়ন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে এক্ষণে সাহস করিয়া বাঙ্গালীরা রাজপথে বাহির হইতেছিল।'

দুর্গাদাস নামে এক ব্রাহ্মণ ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে পশুপতির মৃতদেহ উদ্ধার করে তার সৎকারের ব্যবস্থা করলো। এমন সময় মনোরমা সেখানে উপস্থিত হয়ে সবাইকে জানালো সে পশুপতির পরিণীতা স্ত্রী। মনোরমা স্বামীর সহমৃতা হলো। যাবার সময় পশুপতির সঞ্চিত অর্থসম্পদ হেমচন্দ্রকে দিয়ে গেল; তা নাহলে 'পাপিষ্ঠ যবন তাহা ভোগ করিবে।'

হেমচন্দ্র মনোরমা-প্রদত্ত ধন গ্রহণ করলেন। মাধবাচার্য বললেন, 'এই ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বখ্‌তিয়ার খিলজিকে প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য.. দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন হইয়া পড়িয়াছে...তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন কর এবং তথায় যবন দমনোপযোগী সেনা সৃজন কর।...

রাজ্য সংস্থাপন অতি সহজ হইয়া উঠিল, কেননা যবনদিগের ধর্ম্মদ্বেষিতায় পীড়িত এবং তাঁহাদের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

www.pathagar.com

হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানদের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। বখতিয়ার খিলজী পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীকৃত হইলেন। প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।'[১]

১ অপমানের গ্লানিতে বখ্‌তিয়ারের মৃত্যু ঘটে এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেবকোটে উপস্থিত হয়ে বখতিয়ার খিলজি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। নারানকোট নামক স্থানের অধিপতি আলী মর্দান খিলজী দেবকোটে এসে কৌশলে অসুস্থ বখতিয়ারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন বলে কেউ কেউ মনে করেন—একথাও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন।—দ্রষ্টব্য, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ২য় খণ্ড, প্রথম নবভারত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ২৪-২৫।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রশেখর

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) উপন্যাসে দু'টি কাহিনী সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একটি প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রণয় কাহিনী, অন্যটি মীর কাসেম-দলনী বেগমের আখ্যায়িকা। দ্বিতীয়টি মুসলিম-প্রসঙ্গ সম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী।[১] অবশ্য কাহিনী দু'টি একেবারে সম্পর্ক-বিবর্জিত নয়। উপন্যাসের শেষাংশে নবাবের সঙ্গে প্রতাপ এবং শৈবলিনীর ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের পারিপার্শ্বিক জীবনে তার অভাব দেখতে পেয়ে অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। তাঁর যে ইতিহাসের বিশেষ প্রয়োজন ছিলো তা নয়, রমানন্দ স্বামী, প্রতাপ এবং চন্দ্রশেখরই তাঁর মানসপুত্র। ইতিহাসের 'পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীর কাসিমের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন।'[২]

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের সূত্রপাত মীর কাসেমের রংমহলের চিত্রময় বর্ণনার মাধ্যমে। 'সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীর কাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন। দুর্গ মধ্যে, অন্তঃপুরে, রঙ্গ মহলে, একস্থানে বড় শোভা। রাত্রির প্রথম প্রহর এখনও অতীত হয় নাই। প্রকোষ্ঠ মধ্যে সুরঞ্জিত হর্ম্ম্যস্থলে, সুকোমল গালিচা পাতা। রজতদীপে গন্ধ তৈলে জ্বালিত আলোক জ্বলিতেছে। সুগন্ধ কুসুমদামের ঘ্রাণে গৃহ পরিপূরিত হইয়াছে। কিঙ্খাবের বালিশে একটি ক্ষুদ্র মস্তক বিন্যস্ত করিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া বালিকাকৃতি যুবতী শয়ন করিয়া গুলেস্তাঁ পড়িবার জন্য যত্ন পাইতেছে। যুবতী সপ্তদশবর্ষীয়া, কিন্তু খর্ব্বাকৃতা, বালিকার ন্যায় সুকুমার।'

যুবতীর নাম দলনী বেগম। ইনি নবাব মীর কাসেমের পত্নী। যুবতীর নাম 'বোধ হয় দৌলতউন্নেসা'। দলনী বেগম নবাবের আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর হয়েছিলেন।

---

১ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, 'সম্পাদকীয় ভূমিকা,' 'চন্দ্রশেখর', শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ঐ ৶.—।.।

www.pathagar.com

'এমত সময়ে, নিকটস্থ প্রহরীর অভিবাদন শব্দ এবং বাহক দিগের পদধ্বনি তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল।...নবাব মীর কাসেম আলী খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, এই গৃহে প্রবেশ করিলেন।...বেগম বলিলেন, 'যদি জানেন, যে ইংরেজের বিরোধী হইবে, সেই হারিবে, তবে কেন তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?'

নবাব বললেন, '...আমি নিশ্চিত জানি এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব,-হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই।'...[১]

তাঁহারা বলেন, রাজা আমরা, কিন্তু প্রজা পীড়নের ভার তোমার উপর।...কেন আমি তাহা করিব?[২] যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব। আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীর জাফরও নহি।'

এখানে মীর কাসেমের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বাধীন চিত্ততার যে পরিচয় বিধৃত হয়েছে তা ইতিহাস-সম্মত। ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন, 'The new Nawab (Mir Kasim) was very different man from his father-in-law. Able and ambitious, through suspicious and unwarlike he was adept in the cynical and pitiless politics of the time, and determined to assert his independence at the earliest opportunity.'[৩]

মীর কাসেম-কথিত ইংরেজের সঙ্গে তাঁর অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইংরেজরা বিনা শুল্কে অন্তর্বাণিজ্য

১ একথা ঐতিহাসিক সত্য। ঐতিহাসিক বলেন, 'The British had far more real power than Mir Kasim, and Mir Kasim than the Empror, who was in fact a homeless fugitive.'—P.E. Roberts, 'History of British India', 3rd edn. London, 1967, p. 151.

২ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় Malleson-এর 'Decesive Battels of India' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'নবাব ইংরাজদিগের অনুরোধে প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশ সাধনে অসম্মত হইলে সকলেই একবাক্যে স্থির করিলেন, বাহুবলই প্রতিকার সাধনের একমাত্র উপায়।'—মীর কাসিম,' ৪র্থ সং; কলিকাতা, পৃ. ১২৮।

৩ V.A. Smith, 'Oxford History of India', p. 470.

www.pathagar.com

করবার অধিকার দাবী করলো মীর কাসেমের কাছে। মীর কাসেম কোম্পানীর কর্মচারীদের এই অন্যায় লোভ এবং এর ফলে দেশীয় বণিকদের সম্ভাব্য ক্ষতির কথা বিবেচনা করে অন্তর্বাণিজ্যে সব রকম শুল্ক তুলে দেন। এর ফলে কোম্পানীর কর্মচারী এবং তাঁর নিজের প্রজার মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকলোনা। 'এই কারণে কোম্পানীর সাহেব কর্মচারীরা নূতন নবাবের বিষম শত্রু হইয়া উঠিলেন...অবশেষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নবাব বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।...ফলে মীর কাসিমের বিরুদ্ধে ইংরেজরা প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।'[১]

এই বিরোধ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক স্মিথও বলেন, 'Between the Company's servants determination to do themselves justice and the Nawab's resolve to be master in his own house there could be no compromise and war was no inevitable'.[২] সুতরাং শেষপর্যন্ত মীর কাসেমকে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতে হয় এবং তিনি ইংরেজের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত না হ'লে এদেশে মোগল শাসনের অবসান হতো না; উপরন্তু ইংরেজ বণিক এবং মোগল নবাবের যৌথ পীড়নে এদেশের অকল্যাণ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়তো।[৩] এবং ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে দেশ ও প্রজার কল্যাণ সাধনের জন্য তাঁকে চরমতম মূল্য দিতে হয়েছিলো; তিনি ধনমান সব কিছু হারিয়ে পথের ভিখারী হয়েছিলেন।

দলনী বেগম যখন দেখলেন নবাব ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তখন নবাবকে গণনা করে দেখতে বললেন যে, যুদ্ধের সময় তিনি (দলনী) কোথায় থাকবেন। নবাব গণনা করে কিছুই স্থির করতে পারলেন না।[৪] তিনি গণনা করার জন্য চন্দ্রশেখরকে ডেকে পাঠালেন। জ্যোতিষী চন্দ্রশেখরও গণনায় ব্যর্থ হয়ে চলে গেলেন।

দুলনী বেগমকে পরিচারিকা কুলসুম সংবাদ দিলো, গুরগুণ খাঁ ইংরেজদের তিন খানা অস্ত্রভর্তি নৌকা খাঁ আটক করেছে। ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদের আশঙ্কায়

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "মীর কাসিমের শেষ জীবন," উদ্ধৃত, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, 'মীর কাসিম', "পরিশিষ্ট," পৃ. ২৩৬-৩৭।

২ V.A. Smith, 'Oxford History of India', p. 471.

৩ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, 'মীর কাসিম,' পৃ. ১০৮।

৪ 'সয়ের মুতাক্ষেরীণ'-এ বলা হয়েছে, মীর কাসিম জ্যোতিষশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ পারদর্শী ছিলেন এবং এই শাস্ত্রে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিলো। দ্রষ্টব্য, Syed Gholam Hossain, 'Seir Mutaqherin,' Calcutta, 1789, p. 387. আরো বলা হয়েছে, একবার মীর কাসিম খাঁ শাস্ত্র অনুমোদিত শুভ দিন-ক্ষণ দেখে মুঙ্গের থেকে উদয়নালায় যাত্রা করেন। দ্রষ্টব্য, ঐ, p. 492.

www.pathagar.com

ইব্রাহিম খাঁ নৌকা ছেড়ে দিতে বলেন, কিন্তু গুরগুণ খাঁ বলেন, লড়াই বাধে বাধুক নৌকা ছাড়িব না।'[১]

এপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক গুরগুণ খাঁর পরিচয় দিয়েছেন : 'এই সময় বাংলায় যেসকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন তন্মধ্যে গুরগুণ খাঁ একজন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আরমানি, ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে তিনি বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন।[২] রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন।...তিনি নতুন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করিলেন, কামানবন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন,[৩] তাহা ইউরোপ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাহার গোলন্দাজ সেনা সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল।[৪] মীর কাসেমের এমত ভরসা ছিল যে, তিনি গুরগুণ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাজিত করিবেন। গুরগুণ খাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল, তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীর কাসেম কোন কর্ম্ম করিতেন না, তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীর কাসেম তা শুনিতেন না।[৫] ফলতঃ

---

১ ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, '...Gurghin Khan wanted to stop, whilst Mr. Amyat insisted upon the boat's being dismissed without being stopped or even searched ; and to that forbearance the court would not listen, Aaly Ibrahim—Qhan objected to the boats being stopped or visited at all ; he contended, that if peace was in contemplation, there, was no colour for stopping the boat ..'—Syed Gholam Hossein, 'Seir Mutaqherin', p.p. 465-66.

২ 'সায়ের মুতাক্ষরীণ'-এ পাওয়া যায় গুরগুণ খাঁ একজন সাধারণ বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। দ্রষ্টব্য, ঐ, p. 422.

৩ ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেন, 'গ্রেগরী এ দেশের ইতিহাসে গুরগিন খাঁ নামে পরিচিত।...উপন্যাসে তাঁর নাম গুর্গন খাঁ।... তাঁহার চেষ্টায় খোদ পিক্সর যোগে মীর কাসিম গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।'—'মীর কাসিম,' পৃ. ১১৫।

৪ ইতিহাসে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় : 'Ohudija Ghurghin... was put at the head of the artillery with orders to new model it after the European fashion ;'—Seir Mutaqherin', p. 389. অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেন, গুরগুণ খাঁ নবাবের সেনাকে অশ্বারোহী, গোলন্দাজ এবং পদাতিক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। দ্রষ্টব্য, 'মীর কাসিম,' পৃ. ১১৬।

৫ 'সায়ের মুতাক্ষরীণ' অনুযায়ী 'Gurghin-qhan the Armenian... was the principal General of his troops, and the trusty confident of his heart, may, the Nabab seemed, to have sold himself to him totally.'—ঐ, p. 421.

www.pathagar.com

গুরগুণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা স্বতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।'[১] কুলসুমের হাতে দলনী গুরগুণ খাঁকে পত্র দিয়ে, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলেন। গুরগুণ খাঁ দলনীর পত্র পেয়ে অনেক ভাবলেন, তারপর পরিকল্পনা করলেন '...মীর কাসেম মসনদে থাক; তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীর কাসেমকে বিদায় দিব।...'

দলনী বেগম গুরগুণ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুদ্ধে নবাবের সম্ভাব্য বিপদের কথা ব্যক্ত করলে গুরগুণ খাঁ তাঁর অটল সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বললেন, '...তুমি কাঁদ কেন? ...এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী পাইতে পার।'

স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্খিনী সাধ্বী 'দলনী ক্রোধে কম্পিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন' এবং গুরগুণ খাঁকে বিস্তর ভর্ৎসনা করে চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন '...এই রাজ্য অন্তঃপুর মধ্যে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।' গুরগুণ খাঁ বিপদের আশঙ্কায় দুর্গদ্বার বন্ধ রাখার জন্য গোপনে নির্দেশ পাঠালেন। স্বতরাং দলনী আর দুর্গে প্রবেশ করতে পারলেন না। কুলসুমের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। বলাবাহুল্য, দলনী বেগম গুরগুণ খাঁর আপন ভগ্নী। একথা নবাবের অজ্ঞাত।

অবশেষে সেই গভীর রাতে দলনী ও কুলসুম এক ব্রহ্মচারীর বাড়িতে আশ্রয় পেলেন। ব্রহ্মচারীর হাতে বেগমের পত্র পেয়ে নবাব তাদের আনার জন্য প্রহরী প্রেরণ করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গলষ্টন এবং জনসন সাহেব শৈবলিনীর সন্ধানে এসে দলনী ও কুলসুমকে নিয়ে চলে গেছে। তাদেরকে না পেয়ে প্রহরী শৈবলিনীকে নবাবের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। শৈবলিনীর কাছে বিস্তৃত ঘটনা শুনে ইংরেজ দু'জনকে ধরে আনার জন্য নবাব হুকুম দিলেন। কিন্তু গুরগুণ খাঁর বিরোধিতার জন্য তা করতে পারলেন না।[২]

---

১ মীর কাসেম খাঁর কাছে লিখিত, আলি ইব্রাহিমের এক খানি পত্রে গুরগুণ খাঁর প্রতি অপরাপর মুসলমান কর্মচারীর বিরক্তির কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য, 'Seir Mutaqherin', p. 464.

২ গুরগুণ খাঁ অত্যন্ত দূরদর্শী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি জানতেন কখন ইংরেজদের সঙ্গে কলহ ক'রে তাঁর স্বার্থ সিদ্ধ হবে এবং কখন হবে না। তাই তিনি নবাবকে প্রয়োজন-বোধে বললেন, 'Bear and forbear; you are not yet fledged, reserve your anger till the time when, you shall have feathers to your wings.'—'Seir Mutaqherin', p. 186.

www.pathagar.com

তখন ইংরেজদের নৌকা আটক করার জন্য নবাব মুর্শিদাবাদে তকি খাঁর কাছে নির্দেশ পাঠালেন। সেই সঙ্গে শৈবলিনী উন্মাদিনীর বেশে আমিয়টের নৌকায় উঠল। কারণ সেই নৌকায় প্রতাপও বন্দী ছিলো। নৌকায় শৈবলিনী ক্ষুধার ভান করলে তাকে খাবার দেওয়া হলো। কিন্তু 'সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী মুসলমান'। সুতরাং ক্ষুধিতা শৈবলিনী বললেন, 'তোমাদের ছোঁয়া খাব না'। তখন তাকে বন্দী ব্রাহ্মণ প্রতাপের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। খানসামা প্রতাপের হাতকড়ি খুলবার হুকুম নিয়ে এলো। 'পরের জন্য জল বোড়াবেড়ি কে করে? বিশেষ পীরবক্স সাহেবের খানসামা; কখন ইচ্ছা পূর্ব্বক পরের উপকার করে না। পৃথিবীতে যত প্রকার মনুষ্য আছে, ইংরেজদিগের মুসলমান খানসামা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।[১] কিন্তু এখানে পীরবক্সের একটু স্বার্থ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটার খাওয়া-দাওয়া হইলে একবার খানসামা মহলে লইয়া গিয়া বসাইব।'

প্রতাপের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে শৈবলিনী, 'আমাকে মুসমানের ভাত খাওয়াইছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও' বলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলো, সঙ্গে প্রতাপও। উভয়ে সাঁতার দিয়ে পলায়ন করলো।

আমিয়টের নৌকায় বসে দলনী মুক্তির জন্য অধীর হয়ে রইলো। কুলসুম নবাবের ভয়ে ফিরে যেতে না চাইলে দলনী বললেন...'মরিতে হয়, তাহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।'

এমন সময় 'মুসলমানেরা...তরবারি ও বর্শাহস্তে চীৎকার করিয়া' আমিয়টের নৌকা আক্রমণ করলো। খণ্ড যুদ্ধ হলো। 'যবন শ্রেণীর উপর যবন শ্রেণী নামিতে লাগিল।' আমিয়ট বললো '...আইস আমরা বিধর্ম্মী নিপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি। ...আমরা আজি এখানে মরিলে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে জর্জ্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।'[২]

---

১ মুসলমান খানসামা সম্পর্কে বঙ্কিমের এই উক্তির উল্লেখ করে সমালোচক জয়ন্ত কুমার দাশ গুপ্ত বলেন, 'Bankim Candra might have been blamed for saying that the Muhammadan Khansama of the English was the lowest type of human being...'—A critital study of the life and Novels of Bankim Candra,' Calcutta, 1937, p. 74.

২ এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'Mr. Amyat, refusing to land or surrender, directed his sipahis to fire upon the Nawab's boats, which were approaching to

www.pathagar.com

লক্ষণীয়, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিধর্মী নিপাতের' বর্ণনায় মুখর হয়ে, ইংরেজদের স্বাজাত্যপ্রীতি এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাব নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র যে বৃটিশ-বিরোধী ছিলেন না তার প্রমাণ এই উদ্ধৃতিগুলি।[১] জনৈক সমালোচক বলেন, 'A novelist who could write in such glowing terms of the British and especially in a novel which shows them at war with the power then rulling over Bengal, should be the best person to be accused of sentiments which might in any way be said to be antagonistic on hostile to the Baitish'[২]

পলায়নপর ফষ্টর সাহেব দলনীকে নদী তীরে ফেলে চলে গেলো। দলনী রমানন্দ স্বামীর সঙ্গে মুর্শিদাবাদে এলেন। এদিকে নিহত আমিয়টের নৌকায় বেগমকে না পেয়ে তকী খাঁ ভীত হলো। সে নবাবকে মিথ্যা সংবাদ দিলো যে, দলনী বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু জানা গেছে 'বেগম আমিয়টের উপপত্নী স্বরূপে নৌকায় বাস করিতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং এসকল কথা স্বীকার করিতেছেন। তিনি এক্ষণে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত।'

অন্যদিকে গুরগুণ খাঁ মুঙ্গের নিবাসী বিত্তশালী স্বরূপচন্দ জগৎশেঠ এবং মাহতাবচন্দ্র জগৎ শেঠ—দুই ভাইয়ের সঙ্গে নবাবের বিরুদ্ধে আরও ষড়যন্ত্র করলো। শেঠজিরা সহজেই গুরগুণ খাঁর সঙ্গে মিলিত হলো। নবাবও জানতেন '...জগৎশেঠরা ...মনে মনে তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী...কেননা তিনি তাহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই।..সন্দেহবশতঃ তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে বন্দিস্বরূপ রাখিয়াছিলেন।[৩] কিন্তু

---

compell them, a short and desperate struggle ensued, the English boats were finally boarded, and whole party destroyed or made prisoners'. 'Brooms Bengal Army', উদ্ধৃত, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, 'মীর কাসিম', পৃ. ৩৬ (পাদটীকা)।

১ 'বঙ্গবাণী,' ভাদ্র, ১৩৩, পৃ. ৭১।

২ Jayanta Kumr Das Gupta, 'A Critical Study of the life and Novels of BankimCandra,' pp. 79-80.

৩ 'সয়ের মুতাক্ষেরীন'-এ বলা হয়েছে, নবাব...'wrote to Mohammad Taky-qhan... requiring him to in all speed to Moorshood-abad, where he was to surround the house of the Djagat Seats, in such a manner, as that not a man might come out, and then to wait until Marcan, the Armenian, might arrive and bring him a better, on the permit of which, he was to deliver the Seats in hands...' দ্রষ্টব্য, ঐ, p.p. 456-57.

www.pathagar.com

এপর্য্যন্ত তাঁহারা ভয়-প্রযুক্ত মীর কাসেমের প্রতিকূলে কোন আচরণ করেন নাই।... কিন্তু...মীর কাসেমের নিপাত উভয়েরই উদ্দেশ্য।'[১]

ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাসেমের যুদ্ধ আরম্ভ হলো। 'মীর কাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তারপর গুরগুণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল।'[২]

নবাব এই সংকটের মধ্যে তকি খাঁর পত্র পেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, 'দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষ পান করাইয়া বধ করিও।'

তকি খাঁ দলনী বেগমকে নবাবের হুকুমনামা দেখালেন। প্রথমে দলনী বেগম বিশ্বাস করলেন না। পরে আনুপূর্বিক ঘটনা শুনে বললেন, 'আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিবনা?' তিনি বিষ আনতে বললেন। তকি খাঁ বললো, 'শুন সুন্দরী—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।'

'শুনিয়া দলনী লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকি খাঁকে পদাঘাত করিলেন।' ..তারপর বেগম মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—'ও রাজ রাজেশ্বর! ..দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ। বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে কেন খাইব না। তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ —তখন আমি বিষ পান করিয়াছি...দয়ার সাগর কোথায় রহিলে? আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষ পান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার দুঃখ। ..

দলনী বেগম বিষ পান করিলেন। মহম্মদ তকি খাঁন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে ধীরে শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।'

---

১ এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নবাব গুরগুণ খাঁও শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করেন: The Nawab now Killed Gurgin Khan on the acccunt of his treachsy and slew Jaget Set and his brother, who were the plotters of this tracherous conspiracy...' Manlari Abdus Salam, 'Riyazu-S-Salatin', p. 396.

২ 'সায়ের মুতাক্ষরীণ'-এ নবাবের বিরুদ্ধে গুরগুণ খাঁর গোপন ষড়যন্ত্রের উল্লেখ আছে। দ্রষ্টব্য, ঐ, p. 502. এ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন, 'মীর কাসিমের একান্ত বিশ্বাসভাজন খোজা গ্রেগরী ওরফে গর্গিন খাঁ যে সত্য সত্যই ইংরেজদিগের সহায়তা সাধন করিয়াছিলেন, মেজর আদমস যখন কলিকাতায় তাঁহার হত্যার সংবাদ প্রেরণ করেন, তৎকালে তাহার আভাস প্রদান করিয়াছিলেন।'—'মীর কাসিম,' পৃ. ১৭৯-৮০।

www.pathagar.com

দলনী ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রটি গভীর সহানুভূতি দিয়ে নির্মাণ করেছেন। প্রেমের যে-উচ্চ আদর্শ দলনী-চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সমালোচক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বলেন 'তাঁহার অভিষেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভৃঙ্গার হইতে সৌন্দর্য্যের পূত সলিল বর্ষণ করিয়াছেন।'[১] সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত বলেন, পৃথিবী তার কাছে সুন্দর, জীবন আরো সুন্দর। কিন্তু দলনী বেগমকেও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক চক্রান্তে পড়তে হয়েছে এবং ঘটনার অপ্রতিরোধ্য আবর্তনে তার অসহায় আত্মাহুতি ছাড়া কোনো গত্যান্তর থাকেনি। অথচ দলনীর একমাত্র চিন্তা ছিল আসন্ন বিপর্যয় থেকে মীর কাসিমকে রক্ষা করা।[২] এই মূল্যায়ন ছাড়াও দলনী-চরিত্র সম্পর্কে একথা সত্য যে, এই চরিত্রের মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবি জনোচিত অভীপ্সা সার্থকতার পথ খুঁজেছে'।[৩]

এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের শৈবলিনী ও দলনী-চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা লক্ষণীয়। তিনি মন্তব্য করেন '...শৈবলিনী পাপিষ্ঠা, দলনী দেবী। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর ভালবাসা অতি স্থূল লালসা,—মীর কাসেমের প্রতি দলনীর ভালবাসা স্বার্থ লেশ শূন্য পবিত্র প্রেম।'[৪] সাহিত্য-বিচারে এ জাতীয় তুলনা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শৈবলিনী পাপিষ্ঠা নয়, তার প্রেম, লালসা-সর্বস্বও নয়। বরং বলা চলে শৈবলিনীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের শাশ্বত রূপকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। শৈবলিনী বঙ্কিমচন্দ্র-সৃষ্ট নারী-চরিত্র সমূহের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সমালোচকের উক্ত মন্তব্যে একটি সত্য আবিষ্কার করা সহজ—তাহ'লো দলনীর নিষ্পাপ প্রেম। দলনী বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলমান নারী চরিত্রগুলির মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে উজ্জ্বল।[৫]

ইংরেজদের সঙ্গে কাটোয়ার যুদ্ধে মীর কাসেমের সৈন্য পরাজিত হলো। নবাবের এই বিপর্যয়ের দিনে কুলসুম তাঁর সামনে এসে চীৎকার করে নবাবকে 'মূর্খ' বলে

---

১ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', কলিকাতা, ১৮৮৪ (শক), পৃ. ৪৬।

২ সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ৮১।

৩ বিজিত কুমার দত্ত, 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস,' পৃ. ৬১।

৪ শ্রী কালীপদ সেন, "চন্দ্রশেখর," 'বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা,' কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ. ৬৫।

৫ সমালোচক জয়ন্ত কুমার দাশ গুপ্ত দলনী-চরিত্রে পাশ্চাত্য-প্রভাব লক্ষ্য করেছেন: 'There is the quit and unassuming love of Dalani, who prized the love of the Nawab above everything else. In girlish modesty and simplicity Dalani reminds one of Amy Robsart in Scotts Kenilworth.'—'A critical Study of the life and Norels of Bankim Candra,' p. 14

www.pathagar.com

তিরস্কার করে জানিয়ে গেল দলনী আত্মহত্যা করেনি, এই সতী নারীকে হত্যা করা হয়েছে। এর পরের অংশে মীর কাসেমের হৃদয়ের শূন্যতা বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তরিকতার স্পর্শে যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। মীর কাসেমের নীরব হাহাকার পাঠকের অন্তরে বঙ্কিমচন্দ্র পেঁাছে দেন অতি সহজেই: তখন 'বহু মূল্য সিংহাসনে শত শত রশ্মি প্রতিঘাতী রত্নরাজির উপরে বসিয়া বাঙ্গালার নবাব অধোবদনে।..এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—বহু যত্নেও তাহা রহিল না। কিন্তু যে অজেয় রাজ্য বিনা যত্নে থাকিত—সে কোথায় গেল। তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কণ্টকে যত্ন করিয়াছেন—কুলসুম সতাই বলিয়াছে,—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ।..

নবাবও ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন, এই রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার সুবা রক্ষা কর; আমি চলিলাম।...আমি ফকিরি গ্রহণ করিব"—বলিতে বলিতে নবাবের শরীর প্রবাহমধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া মীর কাসেম বলিতে লাগিলেন, "শুন বন্ধুবর্গ। যদি আমাকে সেরাজদ্দৌলার ন্যায়, ইংরেজ বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা সেই দলনীর কবরের কাছে কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারিনা...কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব।"

নবাব, তকি খাঁ, ফষ্টর, শৈবলিনী, চন্দ্রশেখর প্রভৃতিকে তাঁর কাছে আনবার জন্যে অনুরোধ করলেন। দিকে দিকে প্রহরীরা ছুটলো।

'তখন নবাব রত্ন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরক খচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিড়িয়া ফেলিলেন, রত্ন খচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া 'দলনী। দলনী।' বলিয়া উচৈচঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সংসারে নবাবি এইরূপ।'

নবাব মীর কাসেম এখানে রত্ন শোভিত সিংহাসন থেকে অবতরণ করে দাঁড়িয়েছেন সাধারণ মানুষের পংক্তিতে, যেখানে মানুষ প্রিয়জনের বিচ্ছেদে বেদনাদীর্ণ—নবাব সেই যন্ত্রণা দগ্ধ মানুষের সঙ্গে এক দেহে লীন হয়ে গেছেন। মীর কাসেম-দলনীর এই কাহিনী যদিও কাল্পনিক, তবু বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তি মীর কাসেমের হৃদয়ের যে চিত্রোদঘাটন করেছেন, তা শাশ্বত। কারণ মীর কাসেমের এই পরিস্থিতি থেকে অনুভব করতে পারি, অসীম প্রাচুর্যের মধ্যেও মানুষ কখনো কখনো আবিষ্কার করে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সে কতোখানি কাঙ্গাল।

www.pathagar.com

তকি খাঁ সহ অন্যান্যদেরকে নবাবের সামনে এনে উপস্থিত করা হলো : 'বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে, বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছেন—শেষ রাজা, কেননা মীর কাসেমের পর যাহারা নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।'

মীর কাসেম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি যথার্থ। ইতিহাসে দেখা যায়, মীর কাসেম ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার করতে চান নি, তিনি প্রজার বৃহত্তর কল্যাণের প্রত্যাশী ছিলেন—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু একথাও সত্য, যে, মীর কাসেম সব সময় বিশ্বাসঘাতক দ্বারা বেষ্টিত থাকলেও, তাঁর বিচক্ষণতা এবং দূরদৃষ্টির জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকের ভাষায় 'Mir Qasim was a genuine patriot and able ruler, who quickly restrenched expenditure and disorders...'[১] এই দেশ-প্রেম এবং বিচক্ষণতার ফলে 'in many ways improved the position of his province.'[২]

এরপর কাহিনীর দ্রুত অগ্রগমন এবং পরিণতি লাভ। বন্দীদের মধ্যে ফষ্টর, তকি খাঁ, কুলসুম প্রভৃতিকে দলনী বেগম সম্বন্ধে বিস্তৃত জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। নবাব ফষ্টর এবং তকি খাঁর মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিলেন।

এদেশের 'একটি প্রাচীন দণ্ডের' রীতি অনুযায়ী তাদের দু'জনকে ক্ষুধার্ত কুকুরের আহারে পরিণত করার হুকুম দিলেন। কিন্তু এই নির্দেশ কার্যকর হবার আগেই ইংরেজের কামানের গর্জন শোনা গেলো। 'তাম্বু মধ্যে একা নবাব ও বন্দি তকি বসিয়া রহিলেন।...সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।'

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চিত্রিত মীর কাসেম ও তকি খাঁ প্রসঙ্গে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেছেন, '...নব্য বঙ্গের সাহিত্যগুরু তকি খাঁর ন্যায় বঙ্গবাসী মুসলমান বীরের কর্তব্য, নিষ্ঠায় ও আত্মবিসর্জনের আনুপূর্বিক ইতিহাস পাঠ করিয়াও উপন্যাস রচনা করিবার সময়ে সে ঐতিহাসিক চরিত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া ফেলিয়া, তাহাতে প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাপুরুষের কলঙ্ক কালিমা ঢালিয়া

১ Thompson and Garratt, 'Rise and Fulfilment of British rule in India,' Allahabad, 1958, p. 91.

২ P.E. Roberts, 'History of British India', p. 151.

www.pathagar.com

দিয়াছেন।...বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন মুসলমান নরপতি দশচক্রে চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; নব্য বঙ্গের সাহিত্য-গুরু তাহাকে স্ত্রৈণ কাপুরুষ সাজাইয়া বিদায় দান করিয়াছেন।'[১]

তিনি আরো প্রশ্ন করেছেন, 'মহম্মদ তকির মত প্রভুভক্ত বীরপুরুষের নামে এমন অকীর্ত্তিকর অলীক কল্পনার অবতারণা করা হইল কেন? মীর কাসিমের মত স্বদেশবৎসল মুসলমান নরপতির নামে এমন দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিবার কি প্রয়োজন আছে?'[২]

বঙ্কিম-চিত্রিত মীর কাসেম সম্পর্কে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের অভিযোগ সঠিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মীর কাসেম 'কাপুরুষ' বা 'স্ত্রৈণ' নন। ইতিহাসখ্যাত নবাব মীর কাসেমকে প্রেমিক হিসেবে চিত্রিত করার মধ্যে কোনো অপরাধ দেখি না—তাতে মীর কাসেম-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হয় না। কিন্তু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের তকি খাঁ সম্পর্কিত অভিযোগ যথার্থ। তকি খাঁ-চরিত্রের বিকৃতি আমাদের বিস্মিত করে। কেননা এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মোটামুটি সবগুলি চরিত্রেরই ঐতিহাসিকতা রক্ষা করেছেন। যেমন ইতিহাসের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র আলি ইব্রাহিম খাঁকে মীর কাসেমের বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে অঙ্কন করেছেন। মীর কাসেম আলি ইব্রাহিম খাঁকে বলেছেন, 'তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই'।[৩]

কিন্তু তকি খাঁর যে চিত্র উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে তা ইতিহাস-অনুমোদিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের তকি খাঁ বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ ও পরস্ত্রীলোলুপ। অথচ বলা হয়েছে, 'This officer had the qualities of a Commander-in-Chief, and did richly deserve that high employment,... : His conduct and name have been inscribed on the leaves of the historical page.'[৪] এই বিশ্বস্ত বীরপুরুষের মৃত্যু হয় কাটোয়ার যুদ্ধে। 'সয়ের মুতাক্ষরীণ'-এ তাঁর গৌরবময় জীবনের অবসানের কাহিনী সবিস্তারে কীর্তিত হয়েছে : On the first wound he received through his shoulder, he cried out in anguish, ya, Aaly, O! Aaly. Aag-aaly, his steward and townsman, as well as our friend and

১ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'মীর কাসিম,' পৃ. ১৫৯-৬০।

২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

৩ ইতিহাসও অনুরূপ স্বাক্ষ্য দেয় : '...old brave and loyal officer, Ali Ibrahim Khan, who clang to his old master with fidelity uncommon in those treacherous days'.—Riyazu-S-Salatin', p. 392 (footnote).

৪ Jayanta Kumer Das Gupta, 'A Critical Study of the life and Novels of Bankim Chandra'.

www.pathagar.com

neighbour, advised him to retreat and go back. Go back, answered he, and after that, slew again this black beared to Mir-Cassem-qhan? Never, added he, stroking it at the same time, never. On receiving the second ball through his head, he screamed out ya Aaly, again and fell down with these words in his mouth. Had the others [i.e. the three refactory Commanders] obeyed...[১]

এর পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তকি খাঁ যে একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন, একথা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করে গেছেন। গিরিয়ার যুদ্ধে মীর কাসেমের পরাজয়ের কারণ হিসেবে জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, 'It wanted but one man, a skillfull leader, such a man as the Mohammad Taky Khan whom they had lost at Katwa, to make success, humanly speaking absolutely certain...'[২] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'সর্বত্রই একই কথা। কেবল উপন্যাসের এই কথা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।'[৩] সমালোচক বিজিত কুমার দত্ত মনে করেন, উপন্যাসের 'কাহিনীকে সরস করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই পথ বেছে নিয়েছিলেন'।[৪] কিন্তু ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল চরিত্রকে কলঙ্কিত করে 'গল্প কাহিনীকে সরস করার পথ' চয়ন করা একজন ঔপন্যাসিকের পক্ষে কতোখানি সঙ্গত তা ভেবে দেখবার মতো। ইতিহাসের একটি অনুজ্জ্বল অথবা মন্দ চরিত্রকে উজ্জ্বল ও মহিমা মণ্ডিত করলে বিতর্কের সম্ভাবনা যতোখানি, বিপরীত ঘটনাটি ঘটলে বিতর্ক অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠেই।

উপন্যাসের শেষে আবার বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদের পরাজয়ের পূর্বাভাস দিয়ে ইংরেজদের শক্তি ও কৌশলের প্রশংসা করেছেন। রমানন্দ স্বামী বলেছেন, 'কোন্ দিকে যবন সেনাগণ পলায়ন করিতেছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর

১ 'Seir Mutaqherin', p. 485 (footnote).

২ Col. Mallesson, Decissive Battles of India,' উদ্ধৃত, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, 'মীর কাসিম', পৃ. ১৫৫ (পাদটীকা)।

৩ ঐ, পৃ. ১৫৫। 'পূর্ণিমা' (শ্রাবণ, ১৩০৫) পত্রিকায় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়' শীর্ষক প্রবন্ধে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের উক্ত মন্তব্যসমূহের তীব্র সমালোচনা করা হয়। 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের প্রতি প্রদর্শিত অবজ্ঞার প্রতিবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকায়।

৪ 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস', পৃ. ১০০।

www.pathagar.com

রণজয়ের সম্ভাবনা কি ? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান, বলবান এবং কৌশলময় দেখিতেছি—বোধ হয় ইহারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল আমরা পলায়নপরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হই।'

লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র মীর কাসেমের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও ইংরেজদের প্রতি তাঁর মোহ প্রচ্ছন্ন থাকেনি—কখনো সেই মোহ প্রশংসায় জ্যোতির্ময়, আবার কখনো ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে 'যবনদের' পরাজয়ের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত।

তবে একথা অনস্বীকার্য, মীর কাসেম-চরিত্রে বঙ্কিমের শৈল্পিক দৃষ্টি নিরপেক্ষ, বরং শিল্পী বঙ্কিমের আত্যন্তিক মমতালোকে সে উদ্ভাসিত। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে নবাব মীর কাসেম ঐতিহাসিক, কিন্তু মানুষ মীর কাসেম কাল্পনিক। সে জাতি-ধর্মের সংকীর্ণ পরিমণ্ডলের অনেক উর্ধে, সুখে, যন্ত্রণায়, সাময়িক ভ্রান্তির অনুতাপে এবং প্রবল প্রতিহিংসা পরায়ণতায় জীবন্ত। শিল্পী বঙ্কিমের পক্ষপাতহীন মনোভঙ্গির দাক্ষিণ্যে দ্যুতিময় মুসলমান চরিত্রগুলির মধ্যে মীর কাসেম নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

দলনী বেগম সম্পর্কেও এই অভিমত প্রযোজ্য। স্বামীর নির্দেশে সে অকাতরে, প্রশ্নহীনভাবে বিষপান করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিছুটা পাতিব্রত্যের কারণে, অনেকটা অভিমানে সে বিষপান করেছে। মৃত্যুকালে তার অভিমানমথিত আর্তি নবাবের রত্নমণ্ডিত রংমহলে প্রতিধ্বনিত হয়নি সত্যি, কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে বড়ো গভীর সুরে বেজেছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, রমানন্দ স্বামী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-পুত্র এবং ইতিহাসের পটভূমিকায় তাদেরকে সজীবতা দেবার জন্যই তিনি মীর কাসেম-ইংরেজ-সংঘর্ষ কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে ঔপন্যাসিকের মানস-পুত্রগণ মুসলমান চরিত্রগুলির পাশে সমানভাবে সজীব হয়ে ওঠেনি। এর কারণ বোধ হয় এই, এই সমস্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি নীতি-আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন; আদর্শ প্রচারের বাহক হবার ফলে তাদের মধ্যে প্রত্যাশিত বাস্তবতা বিচলিত হয়েছে। অপরপক্ষে মুসলমান চরিত্রে শিল্পই মুখ্য হয়ে উঠেছে, সেখানে নীতি-কথনের বিড়ম্বনা অনুপস্থিত।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজসিংহ

রাজসিংহ এবং ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে 'রাজসিংহ' (১৮৮২) উপন্যাসের মূল কাহিনী। প্রাসঙ্গিকভাবে যোজিত হয়েছে রাজসিংহ-চঞ্চল-কুমারী এবং মবারক-জেবউন্নিসার প্রণয় কাহিনী।

রাজস্থানের ক্ষুদ্র একটি পার্বত্য প্রদেশের নাম রূপনগর—সেই প্রদেশের রাজা বিক্রম সিংহ। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে এক চিত্র ব্যবসায়িনীর কাছ থেকে রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর সখীরা বিভিন্ন চিত্র নিয়ে রসিকতায় ব্যস্ত।

একজন সখী জিজ্ঞাসা করলো, 'এ কাহার তসবির অয়ি?' বৃদ্ধা চিত্রব্যবসায়িনী বললো, 'এ শাহজাদা বাদশাহের তসবির।' অন্যজন বাদশাহের শ্মশ্রুর কথা উল্লেখ করে বললো, 'ঐ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়াছিল—সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।'

বৃদ্ধা সেই সময়ে জাহাঙ্গীরের একটি চিত্র দেখালো। সেখানে চঞ্চলকুমারী এলেন। বৃদ্ধা অনেক মুসলমান বাদশাহ, বেগমের চিত্র দেখালো, রাজকুমারী হিন্দু রাজাদের ছবি দেখাতে বললেন। এবার মানসিংহ, বীরবল, জয়সিংহ প্রভৃতির ছবি দেখানো হলো। রাজকুমারী সেগুলো ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'এও লইবনা। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।'

রাজকুমারী রাণা রাজসিংহের একখানা ছবি ক্রয় করলেন। বৃদ্ধা এবার বাদশাহ আলমগীরের ছবি দেখালো, রাজকুমারী সে ছবি কিনলেন। তারপর সহচরীদের বললেন, 'আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি, সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের লাথি মার। কার লাথিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।'

সকলে ভীত হলো। তখন 'চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কার-শোভিত বাম চরণ-খানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপর সংস্থাপিত করলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন,—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।'

কুমারী বলিলেন, 'যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনই মোগল বাদশাহের মুখে লাথি মারার সাধ মিটাইলাম।'

www.pathagar.com

এই ঘটনা যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিছক কল্পনা, ইতিহাসের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই, একথা বলাই বাহুল্য। চঞ্চলকুমারী কর্তৃক ঔরঙ্গজেবের চিত্র-দলনকে মুনীর চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমকালীন যুগ-মানসের প্রক্ষেপ ব'লে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'রূপনগরের রাজকন্যা আওরঙ্গজীবের চিত্র পদদলিত করেছিল সে কথা কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে লিখে যাওয়া সম্ভব ছিল না। টড মনুচী অর্মেরও তা অসাধ্য ছিল। এই অঘটন ঘটাবার পটুত্ব শিল্পী ছাড়া আর কার থাকতে পারে? তাছাড়া এই ঘটনার নজীর অতীত ইতিহাসে বিরল হলেও বঙ্কিমের সমকালে অবশ্যই কল্পনীয় ছিল। রূপনগরের রাজকন্যা ও আওরঙ্গজীব প্রতীক মাত্র। দলনের অভিপ্রায় নিয়ে পদোত্তলনের আগ্রহটা বাস্তব সত্যের অন্তর্ভুক্ত।'[১]

'দলনের অভিপ্রায়' কতো প্রবল ছিলো তা বোঝা যায়, যখন দেখি, স্বল্পজ্ঞাত রূপনগরের অজ্ঞাত রাজকুমারীর পদস্পর্শে জগদ্বিখ্যাত মোগল বাদশার 'চিত্রের শোভা বাড়িয়া যায়'। চঞ্চলকুমারীর পায়ের তলে ঔরঙ্গজেবের চিত্র চূর্ণ হবার ঘটনা যদি কল্পনা করা সম্ভব হয়, তা হ'লে তার পায়ের স্পর্শে চিত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কল্পনা আদৌ কঠিন নয়।

চঞ্চলকুমারী সখী নির্মলকুমারীকে ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে বললেন, 'বদজাতের ধাড়ি যে? অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মে নাই।'

চিত্র ব্যবসায়িনী বৃদ্ধার বাড়ি আগ্রা। তার ছেলে খিজির শেখ। সে বাড়ি এসেই তার ছেলেকে ঔরঙ্গজেবেব চিত্রদলনের কথা জানিয়ে সতর্ক করে দিলো যেন এ কথা সে কাউকে না বলে। খিজির শেখ দিল্লী এসে তার স্ত্রী ফাতেমাকে বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত করে এই সংবাদ বাদশাহের দরবারে বিক্রির পরামর্শ দিলো। ফাতেমা তৎক্ষণাৎ দরিয়া বিবির কাছে গিয়ে সংবাদ বিক্রির অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো। তারা উভয়ে দরবারের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পথে জনৈক অশ্বারোহী যুবকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। 'অশ্বারোহী যুবা পুরুষ। দেখিয়া অহেলে-বিলায়ত মোগল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী, মোগলের ভিতরেও এরূপ পুরুষ দুর্লভ। তাঁহার বেশ ভূষার অতিশয় পারিপাট্য দেখিয়া একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হয়। অশ্বও সম্ভ্রান্ত বংশীয়।' ইনি মবারক।

মবারক চলে গেলেন রংমহলে। দরিয়াও সেখানে সংবাদ বিক্রির জন্য যাচ্ছিল। মবারককে দেখে সে লুকালো। মবারক জেবউন্নিসার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

১ মুনীর চৌধুরী, 'ভ্রাইডেন ও ডি. এল. রায়,' ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

ঔপন্যাসিক এবার মোগল সম্রাটদের কন্যাগণের পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে : 'ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত।...মোগল সম্রাটদিগের কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত। কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা রাজনীতি বিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ ছিল। ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী, জাঁহানারা ও রৌশন্নারা। জাহানারা শাহজাঁহার বাদশাহীর প্রধান সহায়। শাহজাঁহা তাহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না। তাঁহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে সফল ও যশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণ বিশিষ্টা ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করতে পারিলাম না।

রৌশন্নারা পিতৃদ্বেষিণী, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাহানারার মত রাজনীতিবিশারদ এবং সুদক্ষ ছিলেন এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাঁহানারার ন্যায় বিচার-শূন্য, বাধাশূন্য এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশন্নারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু রৌশন্নারার দুরদৃষ্টক্রমে তাঁহার একজন মহাশক্তিশালিনী প্রতি-দ্বন্দ্বিনী তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিল। ঔরঙ্গজেবের তিনি কন্যা। কনিষ্ঠা দুইটির সঙ্গে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের তিনি বিবাহ দিলেন। জেবউন্নিসা বিবাহ করিলেন না। পিতৃ-স্বসাদিদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধু পান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পিসী ভাইঝি উভয়ে অনেক স্থলেই, মদন-মন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন। সুতরাং ভাইঝি পিসীকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পিসীর মহিমা তিনি পিতৃ সমীপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, রৌশন্নারা পৃথিবী হইতে অদৃশ্যা হইলেন, জেব-উন্নিসা তাঁহার পদমর্যাদা ও তাঁহার পদানতগণকে পাইলেন।...

দুই শ্রেণীর লোক, তাঁহার কৃপায় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিত; এক প্রণয়-ভাজন ব্যক্তিগণ—অপর যাঁহারা তাঁহারা কাছে সংবাদ বোচিত।...

জেব-উন্নিসা একজন প্রধান Politician, মোগল সাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল এক প্রকার তাঁর হাতে। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের "নিয়ামক নক্ষত্র" বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন।...'

www.pathagar.com

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনায় প্রাপ্ত কয়েকটি তথ্যের ঐতিহাসিক সত্য পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। প্রথমে জাহানারা-প্রসঙ্গ ; বঙ্কিমচন্দ্র জাহানারার রাজনৈতিক দক্ষতার সঙ্গে তার ইন্দ্রিয় কামনার কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। শুধু গুরুত্বই দেন নি, এই প্রসঙ্গটিকেই প্রধানভাবে দেখাতে চেয়েছেন। জাহানারার অনুগৃহীত ব্যক্তিদের মধ্যে, ইউরোপীয় পর্যটকগণ এমন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন যাদের কথা লিখে ঔপন্যাসিক লেখনী কলঙ্কিত করতে চান নি। বলা নিষ্প্রয়োজন—সেই ব্যক্তি জাহানারার পিতা সম্রাট শাহজাহান। বার্নিয়ার তাঁর ইতিহাসে জাহানারা-শাহজাহানের অবৈধ সম্পর্কের একটি গুজবের কথা উল্লেখ করে বলেন : 'Rumour has it that his (Chah-Jehan's) attachment reached a point which it is difficult to believe, the justification on which he rested on the decision of the Mullah, or doctors of their law. According to them, it would have been unjust to deny the king the priviledge of gathering fruit from the tree he had himself planted.'[১] বঙ্কিমচন্দ্র যে-কত্‌রু-সম্পাদিত মুনচীর ইতিহাস পড়েন, তাতে এই ঘটনার উল্লেখ থাকলেও, কতরু একে নিছক গুজব বলে চিহ্নিত করে মন্তব্য করেন : 'This was a popular rumour which never had any other foundation than in the malice of the courtiers.'[২] তাছাড়া বার্নিয়ারও এই ঘটনাকে অবিশ্বাস্য ও গুজব ছাড়া অন্য কিছু বলেন নি। সুতরাং একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত ঘটনাকে অস্বীকার করার মতো সুযোগ হাতের কাছে পেলেও সেটিকে ব্যবহার না করে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

আসলে মোগল-হারেমের আভ্যন্তরীণ কলুষ এবং বিকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করার উপযোগী যে কোনো ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর প্রয়োজন ছিলো। তাই ভিত্তিহীন মুসলিম-কলঙ্কও তাঁর কাছে অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে, অপরপক্ষে তাকে নাকচ করার মতো প্রাপ্ত সহযোগী তথ্যের উল্লেখ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে।

রৌশনারা এবং জেবউন্নেসার 'মদন-মন্দিরে প্রতিযোগিনী' হবার সংবাদ বঙ্কিমচন্দ্র মনুচীর ইতিহাস থেকে আহরণ করেছেন। মনুচীর বর্ণনা অনুযায়ী, রৌশনারা তার কক্ষে নয়জন সুদর্শন যুবককে প্রমোদক্রীড়ার জন্য লুকিয়ে রাখে। ফকরউন্নিসা

১ Francois Bernier, 'Travels in the Mogul Empire,' Revised and improved edition based on Irving Brock's translation, (by Archibald Constable), Westminster, 1891, p. 11.

২ উদ্ধৃত, ঐ, p. 11 (F.N.).

www.pathagar.com

এই সংবাদ জানতে পেরে ওই নয়জন যুবকের মধ্য থেকে একজনকে নিজের প্রমোদের জন্য (বিবাহের জন্য নয়) চায়। কিন্তু রৌশনারা তাতে অসম্মত হলে, ফকর-উন্নিসা প্রতিহিংসাবশত ঔরঙ্গজেবের কাছে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করে ফেলে। ঔরঙ্গজেব রৌশনারার কথা অনুসন্ধান করে নয়জন যুবককে বের করেন এবং চোর বলে প্রচার করে তাদেরকে একমাসের মধ্যে নানারূপ নির্যাতনের মাধ্যমে কোতওয়াল দ্বারা হত্যা করেন। শুধু তাই নয়, 'Already angered at the misconduct of his sister, Aurangzeb shortened her life by poisons.'[১]

লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র কতুরুর অনুসরণে ফকরউন্নিসাকেই জেবউন্নিসা বলে মনে করেছেন।[২] ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এ-প্রসঙ্গে বলেন, 'যে মনুচী হইতে এই সংবাদ লওয়া হইয়াছে, তাহার গ্রন্থে জেবউন্নিসার চরিত্রে কোন কলঙ্কপাত হয় নাই, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ফকর-উন্নিসার উপর এই দুর্নাম দেওয়া হইয়াছে।" তিনি মনুচী বর্ণিত পিসী-ভাইঝির কাম-প্রতিযোগিতার কাহিনীর সত্য সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপন করে বলেন, '...story that Aurangzeb, angered at her profligacy, shortened her life by poison and that she died "swollen out like a hogshead," are unsupported by sober history and may have been examples of the young Italian's credulity.'[৪]

স্মরণ করা যেতে পারে, ফকরউন্নিসা এবং জেবন্নিসা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যেও মতান্তর আছে। মনুচীর মতে ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেবউন্নিসা এবং চতুর্থ কন্যা ফকরউন্নিসা।[৫] প্রিঙ্গেল কেনেডী ফকরন্নিসাকে প্রথমা বলেছেন।[৬] যদুনাথ সরকারের মতে ঔরঙ্গজেবের প্রথমা কন্যা জেবউন্নিসা।[৭] প্রিঙ্গেল কেনেডীর

১ Niccolao Manucci, 'Storio do Mogor or Mogul India,' (tr.) William Irvine, Vol. II, Calcutta, Reprint, 1966, p. 177.

২ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জয়েবউন্নিসা নামে পরিচিত। পাদ্রি কক্স বলেন ইহার নাম ফকরউন্নিসা।'—বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬১৬।

৩ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা", 'রাজসিংহ', শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৯।

৪ Jadunath Sarkar, 'History of Aurangzib', Vol. III, Calcutta, 1921, p. 60.

৫ Manucci, Storio do Mogor,' Vol. II, pp. 52-53.

৬ 'Other Women of the Harem whose names are mentioned as having influenced affairs are Fakur Nisa, Aurangzib's eldest daughter.' উদ্ধৃত, প্রফুল্ল কুমার দাশ গুপ্ত, 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম,' কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ৩১৬।

৭ Jadunath Sarkar, 'History of Aurangzib,' Vol. I, Calcutta, 1912, pp. 68-69.

www.pathagar.com

মতানুযায়ী জেবউন্নিসা ও ফকরউন্নিসা একই ব্যক্তি। কিন্তু আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যদুনাথ সরকার মনুচীর ইতিহাস উল্লেখ করে বলেছেন ফকরউন্নিসার কলঙ্ক জেবউন্নিসার উপর আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ ফকরউন্নিসা ও জেবউন্নিসা স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

এই সচেতন কলঙ্কারোপের পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিশেষ মনোভঙ্গির উল্লেখ করে মুনীর চৌধুরী বলেন, 'জেবউন্নিসার উপর মনুচীর কোন কলঙ্ক আরোপ করেননি। এতে বঙ্কিম সন্তুষ্ট নন। ফকরউন্নিসা ইতিহাসের উপেক্ষিতা, লোকে জানে জেবউন্নিসাকে। জানে এবং অনেক গুণের জন্য তাকে শ্রদ্ধাও করে। অতএব যদি কোনো মুসলিম রমণীকে কলংকমণ্ডিত করে চিত্তানন্দ বর্দ্ধিত করতে হয়, তাহ'লে ফকর উন্নিসাকে বর্জন করে জেবউন্নিসাকে আশ্রয় করা বেশী যুক্তিসংগত। বঙ্কিম তাই করেছেন।'[১]

ঐতিহাসিক জেবউন্নিসা সম্পর্কে বলেন, 'She seems to have inherited her father's keenness of intellect and literary tastes.... Educated by a lady named Hafiza Mariam she committed the Quran to memory, for which she received reward of 30,000 gold-pieces from her delighted father.'[২]

তবে তার যে একটা দুর্নাম রটেছিলো সে বিষয়ে ঐতিহাসিকের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য 'scandal connected her name with that of Aqilmana Khan, a noble of her father's court and a versifier of some repute in his own day.'[৩] যদুনাথ সরকার এই 'scandal' এর বিস্তৃত বিবরণ দেন নি এবং এর সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নি। কিন্তু বঙ্কিম টড্ অনুসারে তাকে (জেবউন্নিসা) মোগল হারেম-এর স্বভাব অনুযায়ী চরিত্র রূপেই বর্ণনা করেছেন'[৪]—সমালোচকের এই উক্তি বিস্ময়কর, কেননা আর যা-ই হোক টড্ জেবউন্নিসার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি।

সম্রাট-তনয়াগণের চারিত্রিক বিবরণ দেবার পর ঔপন্যাসিক মূল কাহিনীতে ফিরে গেছেন।—মবারক জেবউন্নিসার কক্ষে প্রবেশ করে সামান্য আলাপের পর

১ মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়,' পৃ. ২৭-২৮।

২ Jadunath Sarkar, 'History of Aurangzib', Vol. I, p. 69.

৩ ঐ, p. 70.

৪ ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা,' দ্বিতীয় পর্যায়, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৪৭৩।

www.pathagar.com

আভাসে বিবাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো। কারণ এভাবে মেলামেশাকে 'মহাপাপ' বলে মনে করে। জেবউন্নিসা উচ্চ হাসি হেসে উপহাসের সুরে বললো, 'বাদশা-জাদীর পাপ'।

'মবারক বলিল, 'পাপপুণ্য আল্লার হকুম,'

জেব। আল্লা এসকল হকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন—কাফেরের জন্য। আমি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া চিরকাল দাসীত্ব করিয়া শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সে বিধি করিতেন তবে আমাকে কখনও বাদশাজাদী করিতেন না।

মবারক বিস্মিত হলেন, এ জাতীয় কথা 'পাপস্রোতময়ী দিল্লীতেও কখনও শুনে নাই'। মবারক তখন মহা সঙ্কটনের সম্মুখীন হলো, কেননা 'তিনি যদি পাপিষ্ঠা বলিয়া জেব-উন্নিসাকে পরিত্যাগ করেন তাঁকে নিশ্চিত নিহত হইতে হইবে। জেব-উন্নিসা মোগল সাম্রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। খোদ ঔরঙ্গজেব তাঁহার আজ্ঞাকারী। কিন্তু সে জন্য মবারক দুঃখিত নহেন। তাঁহার দুঃখ এই যে তিনি বাদশাহজাদীর রূপে মুগ্ধ, তাঁহাকে করিবার কিছু মাত্র সাধ্য নাই; এই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইবার তাঁহার শক্তি নাই।' সুতরাং আপাতত মবারক জেব-উন্নিসার কাছ থেকে বিদায় নিলো।

এখানে প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নিসা সম্পর্কে বলছেন সে 'রংমহলের সর্ব্বকর্ত্রী,' 'প্রধান politician,' এমন কি 'খোদ ঔরঙ্গজেব তাঁহার আজ্ঞাকারী'। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য সমর্থন করে সমালোচক হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত জোর দিয়ে বলেন, 'জেবউন্নিসা যে একজন প্রধান politician ছিলেন এবিষয়ে ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। পরবর্তী ঐতিহাসিক Pringle Kenedy বলিয়াছেন যে মোগল সাম্রাজ্যের অনেক কাজ জেব-উন্নিসা ও উদিপুরী কর্তৃক পরিচালিত হইত।'[১] তিনি তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি হিসেবে উক্ত ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'Other women of the Harem whose names are mentioned as having influenced affairs are Fakrun Nissa, Aurangzeb's eldest daughter and Udipuri.'[২] কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রিঙ্গেল কেনেডী এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, 'Neither of them seem really to have had much influence over Aurangzeb, who throughout his reign ruled throughout as king alone.'[৩]

১ ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, "রাজসিংহের ভূমিকা," 'বঙ্গশ্রী', মাঘ, ১৩৪৮, উদ্ধৃত, প্রফুল্ল কুমার দাশ গুপ্ত, 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম,' পৃ. ৩১৬।

২ উদ্ধৃত, ঐ. পৃ. ৩১৬।

৩ উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ৩১৬।

www.pathagar.com

সুতরাং কেনেডীর বরাত দিয়ে একথা জোর দিয়ে বলা সমীচীন নয় যে 'মোগল সাম্রাজ্যের অনেক কাজ জেবউন্নিসা ও উদিপুরী কর্তৃক পরিচালিত হইত'। আর উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের উপর জেবউন্নিসার প্রভাবের দৃষ্টান্ত এই, জেবউন্নিসার অভিযোগে বাদশাহ মবারককে মৃত্যুদণ্ড দেন। সমালোচক প্রফুল্ল কুমার দাশ গুপ্ত যথার্থই বলেছেন, জেবউন্নিসার ইচ্ছানুযায়ী, এক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেব কাজ করলেও, ঔরঙ্গজেবের আদেশ আসলে 'কন্যার অনুগ্রহভাজনকে বিশ্বাসঘাতকতার অজুহাতে পৃথিবী হইতে অপসারণের কৌশল মাত্র'।... অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের আচরণ 'অতি সহজে জেবউন্নিসা তাঁহাকে চালিত করিতে পারেন' এরূপ সাক্ষ্য দেয় না।'[১]

অনুমান করা দুরূহ নয়, বঙ্কিমচন্দ্র উপরি-উল্লিখিত কল্পিত ঘটনাটিকে উপন্যাসে বিশ্বাসযোগ্য এবং যুক্তিযুক্ত করে তোলার জন্যই 'খোদ ঔরঙ্গজেব তাঁহার আজ্ঞাকারী'—এমন মন্তব্য করেছেন।

এর পরের ঘটনা, মবারকের যাবার পরেই জেবউন্নিসার কক্ষে দরিয়া প্রবেশ করতে গেলে প্রহরী তাকে বাধা দিয়ে বললো, 'হজরৎ বেগম সাহেবা, এস বক্ত কুচ মজেমে হোয়েঙ্গী'। তবুও দরিয়া অনেক অনুরোধ ও কৌশল করে জেবউন্নিসার কক্ষে প্রবেশ করলো। দরিয়ার কাছে জেবউন্নিসা চঞ্চলকুমারীর চিত্রদলনের কাহিনী শুনলো। দরিয়া যাবার সময় জানিয়ে গেলো, সে মবারকের বিবাহিত স্ত্রী।

জেবউন্নিসা চিত্রদলনের সংবাদ উদিপুরীকে দেবার জন্যে তাঁর কক্ষে গেলো। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক 'উদিপুরী বেগম' শীর্ষক পরিচ্ছেদে ঔরঙ্গজেবসহ উদিপুরী ও অন্যান্য মোগল বাদশাহ-বেগমদের ব্যভিচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন: 'ঔরঙ্গজেব মহাপাপিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধূর্ত্ত, কপটাচারী, পাপে সংকোচশূন্য, স্বার্থপর পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক দুই একজন মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটাচারী সম্রাট জিতেন্দ্রিয়তার ভান করিতেন—কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরী রাজিতে মধুমক্ষিকা-পরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দ ধ্বনিতে ধ্বনিত হইত।

তাঁহার মহিষীও অসংখ্য—আর সরাব বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য বেতনভোগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য।'

ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং তাঁর অন্তঃপুরের যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন, ইতিহাসে তার সমর্থন নেই। ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন, 'Aurangzeb was a Muslim puritan. He desired that his empire should be a land of

১ প্রফুল্ল কুমার দাশ গুপ্ত, 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম,' পৃ. ৩১৭।

www.pathagar.com

orthox sunni Islam...Authors who accuse Aurangzeb of santimonious hypocracy and feigning religious sentiment which he did not feel in his heart are mistaken, in my judgement.[১]

যদুনাথ সরকারও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। তিনি স্পষ্টই বলেন, 'His private life,---dress, food and rearation,—were all extremely simple, but well ordered. He was absolutely free from vice and even from the mere innocent pleasures of the idle rich.'[২]

ঔরঙ্গজেবের নির্মল জীবনযাত্রার প্রমাণ তাভার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তেও দুর্লভ নয় : 'Aurangzib only drank a little water and ate a small quantity of millet bread ; this so much affected his health that he nearly deid, for besides this he slept on the ground, with only a tiger's skin over him and since that time he has never had perfect health.'[৩]

অপর একজন বিদেশী ঐতিহাসিক, ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আনীত নিষ্ঠুরতা ও ভণ্ডামি ইত্যাদি অভিযোগ খণ্ডন করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন : 'Throughout his long reign of nearly fifty years no single dead of cruelty has been proved against him. Even his persecution of the Hindus, which was of a piece with his puritanical character, was admittedly marked by no executions or tortures. Hypocrite as he was called, no instance of his violating the precepts of the religion he professed has ever been produced his conscience.'[৪] তিনি পাদটীকায় আরো উল্লেখ করেন, 'The barbarous execution of Sambhaji is an exception, perhaps ; but it was provoked by the outrageous virulence of the prisoner. Catron's allegations of cruelty are merely general and supported by no individual instances, or by any evidence worthy the name.'[৫]

---

১ V.A. Smith, 'The Oxford History of India', (3rd edn.), London, 1961, p. 416.

২ Jadunath Sarkar, 'Short History of Aurangzib', (3rd edn.), Calcutta, 1962, p. 438.

৩ 'The History of India, as told by its own Historions', (ed.) John Dowson, (3rd edn.), Calcutta, 1960, p. 65. (quoted).

৪ Stanely Lane Poole, 'Rulers of India, Aurangzib,' Delhi, [No date], p. 64.

৫ ঐ, p. 64 (footnote).

www.pathagar.com

তবে রাজনীতি বা কূটনীতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজ্যাধিপতিকে নিষ্ঠুর ও ধূর্ত হতে বাধ্য করে। কিন্তু এই অপহারিহার্যতাকে উপেক্ষা করলে তার প্রকৃত পরিচয় অনুন্মোচিত থেকে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে ঔরঙ্গজেবের বাহ্য দোষ-সম্বলিত পরিচয় এতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাঁর অন্য গুণাবলী অন্ধকারেই থেকে গেছে। এর ফলে 'রাজসিংহ' এবং ইতিহাসের ঔরঙ্গজেবের মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য ব্যবধান সূচিত হয়েছে। এই ব্যবধান ঔরঙ্গজেব-চরিত্রে কী বিরাট অসঙ্গতি এনে দিয়েছে তার পরিচয় দিয়ে সমালোচক সুবোধ সেন গুপ্ত মন্তব্য করেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবকে শুধু অত্যাচারী, পরধর্মবিদ্বেষী রূপে চিত্রিত করেন নাই, স্ত্রীচালিত কাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই ভীরু, বেয়াকুব ঔরঙ্গজেব শুধু যে অনৈতিহাসিক তাহাই নহে, তিনি এই বিরাট উপন্যাসের নায়ক বা প্রতিনায়ক হিসাবেও নেমানান।'[১]

এপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক ঔরঙ্গজেবের উপর উদিপুরী বেগমের প্রভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন নানাভাবে। ঐতিহাসিকগণও এই প্রভাবের কথা অংশত স্বীকার করেছেন। যদুনাথ সরকার বলেন, 'She retained her youth and influence over Emperors till his death, and was the darling of his old age. Under the spell of her beauty the Emperor pardoned the many faults of Kam Bakhsh [her son] and overlooked her freaks of drunkness, which must have shocked so pious a Muslim.'[২]

এতে উদিপুরীর ঔরঙ্গজেবের উপর যেটুকু প্রভাবের ইঙ্গিত আছে তা স্বামীর কাছে সুন্দরী স্ত্রীর একটু অতিরিক্ত দাবী ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং অপরাধী পুত্রকে পিতার কাছ থেকে রক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবু উদিপুরী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছেন সে-বিষয়েও রমেশচন্দ্র মজুমদার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৩]

পুত্র কাম বক্‌স্‌কে লিখিত ঔরঙ্গজেবের পত্রে উদিপুরী সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য প্রতিভাসিত : 'Odipuri, your mother, was a partner in my illness, and wishes to accompany me in death, but everything has its appointed time'.[৪]

---

১ সুবোধ সেন গুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র', ৩য় সং, কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ৩০।

২ Jadunath Sarker, 'History of Aurangzib,' Vol. I, p. 64.

৩ রমেশচন্দ্র মজুমদার, "রাজসিংহ," 'বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা', কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ. ১৫৩।

৪ উদ্ধৃত, Tod, 'Annals and Antiquities of Rajsthan', p. 301. (F.N.).

www.pathagar.com

উদিপুরী বেগমের জাতি-ধর্ম-বংশ সম্পর্কেও মতবিরোধ আছে। টড্ ঔরঙ্গজেবের সূত্র ধরে বলেছেন, 'certainly she was not a daughter of the Rana's family, though it is not impossible she may have been of one of the great families of Shahpoora or Bunera (then acting independently of the Rana), and her desire to burn shows her to have been Rajpoot'.[১] টডের এই অনুমানকে নাকচ করে যদুনাথ সরকার বলেন, 'Such an inference is wrong, because a Hindu princess on marrying a Muslim King lost her caste and religion, and received Islamic burial. We read no Rajputani of the harem Mughal emperors having burnt herself with her husband, for the very good reason that a Muslim corpse is buried and not burnt'.[২] মনুচী একে জর্জিয়ান বংশোদ্ভূত বলে মনে করেন।[৩] বঙ্কিমচন্দ্রও মনুচীর মত গ্রহণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে যে পাপ-প্রবাহের কথা বলেছেন তার মধ্যে 'অসংখ্য সুন্দরীর' 'দিবারাত্র আনন্দধ্বনি', 'অসংখ্য মহিষী'র সমাবেশ অন্যতম। অন্যত্র তিনি বলেছেন ঔরঙ্গজেবের 'রঙমহলে গীতবাদ্যের বড় ধুম'। এই তথ্যগুলি ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

প্রথমত, ঔরঙ্গজেবের কখনোই অসংখ্য মহিষী ছিলো না। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন, The number of his [Aurangzib] wives fell short even of the Quranic allowance as four, and he was scrupulously faithfull to wedded love.[৪] তিনি ঔরঙ্গজেবের চারজন বিবাহিতা স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন।[৫]

---

১ উদ্ধৃত, Tod, 'Annals and Antiquities of Rajsthans' p. 301. (F.N.)

২ Jadunath Sarkar, 'History of Aurangzib,' Vol. I, p. 65 (footnote).

৩ 'Udipuri, a Georgian by race, who had been formerly a wife of Dara, became afterwords a much beloved wife of Aurangzib'—Manucci, 'Storio do Mogor', Vol. II, p. 99.

৪ Jadunath Sarkar, 'Short History of Aurangzib', p. 438.

৫ ঔরঙ্গজেবের চারজন বিবাহিতা স্ত্রী হলেন :

'1. Dilras Banu Begum, d/o Shah Nawaj Khan.

2. Rahmat-un-nisa, surnamed Nawab Bai, d/o Raja Raja of the Rajauri State of Kashmir and came of the hill—Rajput blood'.

www.pathagar.com

মোগল যুগে অন্দর মহলে দিনের একটি বিশেষ সময়ে সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো ; কিন্তু ঔরঙ্গজেবের রংমহল নৃত্যগীত মুক্ত ছিলো।

অবশ্য মোগল যুগে 'দিওয়ানী খাস'-এ সন্ধ্যের পর সঙ্গীতের জলসা অনুষ্ঠিত হতো।[১] যদুনাথ সরকার বলেন, In the evening, after candles had been lightened, the Emperor held a soiree in the Diwan-i-Khas...

Aurangzib, however, was a puritan. There was no music or dance at his Court,...[২]

তবে 'Maasir-i-Alamgiri'-তে বলা হয়েছে, ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে কিছুদিন সুকণ্ঠ শিল্পী এবং সুদর্শন বাদকদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তা বর্জন করেন।[৩]

সুতরাং 'রাজসিংহ' উপন্যাসে চিত্রিত ঔরঙ্গজেবের অন্দরমহলের অবারিত নৃত্য-গীত এবং নারকীয় কোলাহলময় অসুস্থ পরিবেশ, ইতিহাস-সমর্থিত নয়—তা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার ফসল।

ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে বাদশাহজাদীদের যে বিকৃত-কলুষ জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা কত্‌রু-রচিত ইতিহাস থেকে গৃহীত ব'লে অনুমিত হয়। কত্‌রু বলেছেন, ...they [the young Sultanesses] are bred up in all the luxury imaginable. As they are generally the Emperor their Father's chief Amusements, their greatest study is how to endear him. But this means, they sometimes obtain more liberty than is decent for Princesses, and the Rigours of the Cloister are often dispensed with in

3. Aurangbadi.

4. Udaipuri Mahal,—Manucci speaks of her as a Georgian slave-girl of Dara Shukoh's harem'.—ঐ, p. 14.

১ সম্রাট আকবরের দরবারে সঙ্গীত যে একটি উন্নতমানের শিল্প হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলো এবং তার ফলে সঙ্গীতের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো, এ কথা সর্বজনবিদিত।

২ Jadunath Sarkar, 'Mughal Administration', Calcutta, 1952, p. 18.

৩ 'Sweet-voiced singers and charming players on musical instruments were gathered in numbers round his throne, and in the first few [ten] years of his reign he occasionally listened and self restrained (tawarra 'wa parhezgari) he [later] totally gave up listening to music.'—উদ্ধৃত, 'Mughal Administration', p. 116.

www.pathagar.com

their Favour. The Indulgences of the Mogols in this point extends sometimes to a Connivance at their keeping gallants ; the example of which soon corrupts the whole Seraglio. Idleness together with a delicious way of living and reading wanton books must needs be a source of Vice in Cloisters where the power of true Religions restrains to no rules'[১]

কত্‌রু-অনুসৃত বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনায় সন্দেহ প্রকাশ করে সমালোচক সুবোধ সেন গুপ্ত বলেন, ঔরঙ্গজেবের রংমহলের ব্যভিচার, পাপোন্মত্ততা কোলাহলময় কুৎসিত পরিবেশের বর্ণনা ঔরঙ্গজেবের বংশধর জাহান্দার শাহের রাজত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[২] বিজিত কুমার দত্ত, এই বর্ণনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাবী আমলের অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করেছেন।[৩]

নিঃসন্দেহে তৎকালে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতাই এই বিকৃতির জন্য দায়ী; কিন্তু এই অপ্রতুল তথ্যকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা অবাধে পক্ষ বিস্তার ক'রে পরিশেষে মূল তথ্যটুকুকে বিকৃত-বিবর্ণ ক'রে তুলেছে। তাই ইতিহাসের একটি মাত্র পংক্তি, বঙ্কিমচন্দ্রের লিখনীতে শতাধিক চরণের জন্ম দিয়েছে।[৪] ইতিহাসে প্রাপ্ত মোগলদের ক্ষুদ্র স্খলন, ক্ষুদ্রতম পাপ তাঁর ফেনময় কল্পনায় অপরিমেয় কলঙ্কের পর্বত রচনা করেছে।

অন্দরমহলে পৌরঙ্গানাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সুরা-সমারোহের বর্ণনা দিয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ঐতিহাসিকের বক্তব্য স্মরণীয়। যদুনাথ সরকার বলেছেন, মোগলযুগে শুকনো মাদকদ্রব্য, যেমন ভাং, গাঁজা, আফিম প্রভৃতির অবাধ প্রচলন ছিলো, কিন্তু, 'Aurangzib forbade the cultivation of the bhang plant throughout dominions.'[৫] একজন পরিদর্শক নিযুক্ত ছিলেন, তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিলো, 'In the cities do not permit the sale of intoxicating drinks

১ F.F. Catron, 'The General History of the Moghol Empire', p. 328. উদ্ধৃত, প্রফুল্ল কুমার দাশ গুপ্ত, 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম,' পৃ. ৫৭৭-৭৮। রমেশচন্দ্র মজুমদারও বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত ঔরঙ্গজেবের অন্দরমহলের চিত্রকে 'সম্পূর্ণ ঐ যুগের উপযোগী' বলে মনে করেন। দ্রষ্টব্য, "রাজসিংহ", 'বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা', পৃ. ১৫৩।

২ সুবোধ সেন গুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ১৪৬।

৩ বিজিত কুমার দত্ত, 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস', পৃ. ১৪৩।

৪ মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়,' পৃ. ২৭।

৫ Jadunath Sarkar, 'Mughal Administration', p. 25.

www.pathagar.com

nor the residence of professional women (tawaif, literally dancing girls), as it is opposed to sacred law...'[১] এবং আদেশ ভঙ্গকারীর শাস্তি ছিলো 'Scourging for drinking wine and other intoxicating liqurs. For a free man the punishment was 80 strips for wine drinking.'[২]

সুতরাং সমগ্র দেশব্যাপী যে আইন ও শাস্তির বিধান বলবৎ ছিলো, তার সহজ ব্যত্যয় অন্দরমহলে ঘটবে, একথা বলার পেছনে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য আবশ্যক। এপ্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'ইতিহাস বলে কথিত যে সব বই বংকিম নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁর মধ্যেও এই চিত্রগুলোর সহজে সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। সহজে বললাম এই জন্যে যে, যে কথা বংকিম পেতে চেয়েছেন তা সহজে পাওয়া না গেলে প্রাণপাত করে খুঁজে পেতে বার করেছেন।'[৩] অর্থাৎ তিনি সামান্য পাপাচার প্রভৃতি উপেক্ষণীয় তথ্যের প্রত্যাশায় পর্যাপ্ত শ্রম স্বীকার করেছেন, অথচ সেই তথ্যকে নাকচ করার মতো নজিরকে গ্রহণ করেন নি।

ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং তাঁর অন্তঃপুরের কলুষ পরিবেশের বর্ণনা দেবার পর ঔপন্যাসিক পুনরায় মূল কাহিনীতে ফিরে গেছেন।—চঞ্চলকুমারীর চিত্র-দলনের সংবাদ উদিপুরী মারফৎ ঔরঙ্গজেবের কানে গেলো। ক্রোধান্ধ ঔরঙ্গজেব রাজাজ্ঞা পাঠালেন, 'বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবৃত্তান্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাও সাহেবের সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণি গ্রহণ করিয়া তাহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজকন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন ; শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবেন।'

এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হলো। যোধপুরী সংবাদে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। এখানে ওপন্যাসিক যোধপুরী বেগমের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে মহিমা মণ্ডিত করতে চেয়েছেন। উদিপুরীর তুলনায় 'যোধপুরী কতো আত্মসম্ভ্রম সম্পন্ন ও স্বজাতি-সচেতন তা বোঝাবার উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'তিনি ওরঙ্গজেবের পুরী মধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানী রাখিতেন। ...এমন কি ওরঙ্গজেবের পুরী মধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। বিখ্যাত দেবদ্বেষী ওরঙ্গজেব যে এতটা সহ্য করিতেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ওরঙ্গজেব তাঁহাকেও একটু অনুগ্রহ করিতেন।'

১ Jadunath Sarkar, Mughol Administration, p. 26.

২ ঐ, p. 104.

৩ মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল .রায়', পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

যোধপুরী ওরঙ্গজেবকে এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না। তিনি তখন প্রার্থনা করলেন, 'হে ভগবান্! আমাকে বিধবা কর। এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দুনাম লোপ হইবে।'

তারপর তিনি দেবী নামে এক পরিচারিকার মাধ্যমে চঞ্চলকুমারীকে বলে পাঠালেন '...হিন্দুর কন্যা হইয়া মুসলমানের ঘরে না আসেন। আমরা আসিয়া, নিত্য মরণ কামনা করিতেছি। বলিবে যে তস্‌বির ভাঙ্গার কথাটা বাদশাহ শুনিয়াছেন, তাঁকে সাজা দিবার জন্যই আনিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, রূপনগরওয়ালী দিয়া উদিপুরীর তামাকু সাজাইবেন। বলিও বরং বিষ খাইও, তথাপি দিল্লীতে আসিও না।

আরও বলিও, ভয় নাই। দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা মোগলের হাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্রিত হইতেছে। জেজিয়ার জ্বালায় সমস্ত রাজপুতানা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানায় গো-হত্যা হইতেছে। উদয়পুরের রাণা বীরপুরুষ।..যদি একদিকে শিবজী, আর একদিকে রাজসিংহ অস্ত্রধারণ করেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয়দিন টিকিবে?'

যে-যোধপুরী বেগমের জবানীতে বঙ্কিমচন্দ্র মোগল সাম্রাজ্যের পতন অত্যাসন্ন বলে ঘোষণা করেছেন, সেই যোধপুরী বেগম-চরিত্র ঐতিহাসিক নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত। ঐতিহাসিক বলেন, ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম ঔপন্যাসিকের 'নিছক কল্পনা'। ঔরঙ্গজেব যোধপুরের কোনো রাজকন্যাকে বিয়ে করেন নি। এমন কি উদিপুরী বেগম সম্পর্কেও তিনি নিঃসন্দেহ নন।[১]

যদুনাথ সরকার বলেন 'এই বাদশাহ কোন যোধপুর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন নাই; তাঁহার একমাত্র নবাব পত্নীর নাম "নবাববাঈ" কাশ্মীর প্রদেশের রাজাউর শহরের ক্ষুদ্র রাজার কন্যা।'[২] তিনি কাশ্মীরী কন্যা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মুসলমান। শোনা যায় তাঁর নাম প্রথমে ছিলো রহমতুন্নেছা, পরে ঔরঙ্গজেব তাঁকে 'নবাববাঈ' আখ্যা দেন। যদুনাথ সরকার আরো উল্লেখ করেন, নবাববাঈকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার পর ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়।[৩]

যোধপুরী বেগম চরিত্র অঙ্কনের পশ্চাতে ঔপন্যাসিকের আর একটি উদ্দেশ্য সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভব। তা'হলো, ঔরঙ্গজেবের মতো ইসলাম ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অন্দরমহলে পৌত্তলিকতার সমাবেশ ঘটিয়ে মুসলমানদের একজন অন্যতম

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, "রাজসিংহ", 'বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা,' পৃ. ১৫৩।
২ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা," 'রাজসিংহ', পৃ. ৮।
৩ ঐ, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

সম্রাটকে স্রৈণ প্রতিপন্ন করা। মুনীর চৌধুরীর মন্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য বিশ্লেষিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে নয়, আওরঙ্গজীবের ঐসলামিক জীবনযাত্রার বিদ্রূপাত্মক টীকা হিসাবে এর মূল্য বংকিমের কাছে এত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।....এবং সে কারণেই যোধপুরীর ধর্মচর্চার প্রসঙ্গে যেখানে মনুচী এক পংক্তি মাত্র মন্তব্য করেন, বংকিম সেই অনুপ্রেরণায় কয়েক শত চরণ লিখে ফেলেছেন।'[১]

ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে যোধপুরী বেগমের হিন্দুধর্ম চর্চা-বিষয়ক মনুচীর তথ্য যদুনাথ সরকার অস্বীকার করে বলেন, আকবরের পরে বাদশাহী মহলে কোনো হিন্দু মহিষী হিন্দু আচার-ব্যবহার পালন করতে পারতেন না 'তাহাদের মুসলমান হইয়া থাকিতে এবং মৃত্যুর পর কবরে আশ্রয় পাইতে হইত'।[২] কিন্তু সমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত যদুনাথ সরকারের এই মত অস্বীকার করেছেন[৩] এবং যোধপুরীর হিন্দু ধর্ম-চর্চা ঐতিহাসিক সমর্থনপুষ্ট বলে মনুচীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মনুচী বলেছেন, 'Muhammad...and Sultan Mu'azzam...were sons of one mother, Rajput by race, who offered sacrifices to idols that Sultan Mu'azzam, her son might be king, seeing that oldest was a captive.'[৪]

স্মরণীয়, এই সময়ে ঔরঙ্গজেব গুরুতরভাবে পীড়িত ছিলেন (অর্থাৎ ১৬৬২ সালের ২২শে মে থেকে ২৭শে জুলাই পর্যন্ত), মনুচী এই সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। একে কেন্দ্র করেই ডঃ দাশ গুপ্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন, এই অবস্থায় নবাববাঈ যে সর্বদা বাদশাহের অন্তঃপুরেও হিন্দু আচার ব্যবহারাদি মেনে চলতেন এবং 'আপন প্রকোষ্ঠে দেব দেবীর পূজার্চনা করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।'[৫] অথচ একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ দৃষ্টান্তের বলে এ রকম ঢালাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন নয়। বাদশাহের অসুস্থতার সুযোগে দেব মন্দিরে পূজার্ঘ প্রেরণ হয়তো সম্ভব ছিলো, কিন্তু

১ মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়,' পৃ. ২৭।

২ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা", 'রাজসিংহ', পৃ. ৮-৯। তিনি অন্যত্রও এ প্রসঙ্গে বলেছেন '.....a Hindu princess on marrying a Muslim king lost her caste and religion, and received Islamic burial.'—'History of Aurangzib', Vol. I, Calcutta, 1912, p. 65 (footnote).

৩ ডঃ হেমেন্দ্র কুমার দাশ গুপ্ত, "রাজসিংহের ভূমিকা," 'বঙ্গশ্রী', পৃ. ১৩৩।

৪ Manucci, 'Storio do Mogor,' p. 57. পাদটীকায় মনুচী বলেছেন, 'The mother of Sultan Muhammad, Sultan Mu'azzam (Shah Alam), and Badr-un-nissa, was Nawab-Bai, daughter of the Rajah of Rajauri in Kashmir.'—ঐ, p. 57.

৫ ড. হেমেন্দ্র কুমার দাশ গুপ্ত, "রাজসিংহের ভূমিকা," 'বঙ্গশ্রী', পৃ. ১৩৩।

www.pathagar.com

অন্য সময়ে বাদশাহের অজ্ঞাতে পূজাব্রত পালন শুধু অসম্ভবই নয়, অবিশ্বাস্যও বটে। সমালোচক যথার্থই বলেন, 'যোধপুরী বেগমকে পুরাপুরি হিন্দু আচারনিষ্ঠ করিয়া বঙ্কিম ঔরঙ্গজেবের কথা বিকৃত করিয়াছেন।'[১]

যোধপুরী-প্রসঙ্গে আরো দু'একটি সামঞ্জস্যহীন ঘটনা সংযোজিত হয়েছে। যেমন যোধপুরী বেগমের হয়ে দেবীর দোত্য শুধু অনৈতিহাসিকই নয়, অস্বাভাবিকও। ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে পরিচারিকার এ জাতীয় আচরণ বিশ্বাসযোগ্যতা দাবী করে না। তাছাড়া, 'ভয় নাই দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে'—যোধপুরী বেগমের এই উক্তিতে ঔপন্যাসিকেরই মনোভাব প্রকাশিত। 'বঙ্কিমচন্দ্রের এই কল্পনা চরিত্রোচিত হয়নি। যোধপুরী বেগমের এই উক্তি, বঙ্কিমের আরোপিত—স্বতঃস্ফূর্ত নয়।'[২]

কাহিনীর পরবর্তী অংশে দেখা যায়, মবারক আবার জেবউন্নিসার কক্ষে উপস্থিত। জেবউন্নিসা মবারককে বললো, রূপনগরের রাজকুমারী যদি সুরূপা না হয়, তা'হলে মবারক যেন তাকে বিয়ে করে।

'মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসা নাই?

জেব। বাদশাহজাদীর আবার ভালবাসা?

মবা। আল্লা তবে বাদশাহজাদীদিগের কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন?

জেব। সুখের জন্য। ভালবাসা দুঃখ মাত্র।'

এদিকে রূপনগরের রাজা ও রাণী সবাই বাদশাহের প্রস্তাবে আনন্দিত। চঞ্চলকুমারীকে বিদায় দেবার জন্য বিপুল আয়োজন শুরু হয়েছে। কিন্তু চঞ্চলকুমারী নারাজ। সে তার সখী নির্মলাকে বললো, 'তুই কি মনে করেছিস, যে আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কি বকের সেবা করে?'

এমনি সময়ে যোধপুরী-প্রেরিত সংবাদ এলো। চঞ্চলকুমারী নির্মলকুমারীর সঙ্গে পরামর্শ করে রাজসিংহকে পত্র লিখলো। কুলপুরোহিত অনন্ত মিশ্র সেই পত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে অনন্ত মিশ্রের সব কিছু দস্যুরা লুঠ করে নিলো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং রাজসিংহ ডাকাতদের নিহত করে চঞ্চলকুমারীর পত্র উদ্ধার করলেন। মানিকলাল নামে একজন দস্যু জীবিত ছিলো। রাণার সান্নিধ্যে তার চরিত্র সংশোধিত হলো এবং রাণার বিশ্বস্ত ভৃত্য হয়ে পড়লো। পত্রে চঞ্চলকুমারী মোগলদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে লিখেছে, '...রাজকুমারী

১ প্রফুল্ল কুমার দাশ গুপ্ত, 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম,' পৃ. ৩২১।

২ বিজিত কুমার দত্ত, 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস,' পৃ. ১৪৪-৪৫।

www.pathagar.com

হইয়া কি প্রকারে তরকী বব্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষ ভোজনে প্রাণত্যাগ করিব...।'

পত্রের শেষে সে রাজসিংহকে স্বামিত্বে বরণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। অতএব রাজসিংহ তাঁর একশত যোদ্ধা নিয়ে মোগলদের অবরোধ করার জন্য অগ্রসর হলেন। এ দিকে মোগল সৈন্যবাহিনী রূপনগরে এসে শিবির স্থাপন করে বসেছে। 'মোগল সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর দল ছুটিত; যখন যুদ্ধ না হইত, তখন তাম্বুর মধ্যে নাচ গানের ধুম পড়িত।' দরিয়া সেই সুযোগে নর্ত্তকীর বেশে মোগল সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলীকে মুগ্ধ করে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হলো। অন্যদিকে মানিকলাল কৌশলে মোগল সৈন্যের পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ করে মোগল-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলো।

'প্রভাতে মোগল সৈন্য সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহদ্বার হইতে, উষ্ণীষ-কবচ-শোভিত, গুম্ফ শ্মশ্রু মণ্ডিত অস্ত্র সজ্জা ভীষণ অশ্বারোহিদল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহীর এক এক সারি; সারির পিছু সারি, তারপর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে; ভ্রমর শ্রেণী সমাকুল ফুল্ল কমল তুল্য তাহাদের বদনমণ্ডল সকল শোভিত ছিল। তাহাদের অশ্বশ্রেণী-গ্রীবাভঙ্গ সুন্দর, বল্গারোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল; অশ্বশ্রেণী শরীর-ভরে হেলিতেছে, দুলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিবার উপক্রম করিতেছে।...'

চঞ্চলকুমারী কাঁদতে কাঁদতে শিবিকায় আরোহণ করলো। কিছুদুর যাবার পর পার্বত্যপথে মোগল সৈন্য বেশধারী মানিকলাল মোগল সৈন্যদের ভুল পথে নিয়ে গেল। তখন রাজসিংহ পার্বত্য অঞ্চলের অন্তরাল থেকে সহসা মোগল সেনাদের আক্রমণ করলেন। প্রচুর শিলা বৃষ্টিতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। মোগল সৈন্যদের 'অধিকাংশ এই ভীষণ রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিসা আসিয়া অশ্ব সহিত মোগল সওয়ারগণের উপর পড়িল—নীচে যাহারা ছিল, তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত জন মাত্র এড়াইল।'

রাজপুত সৈনিকরা চঞ্চলকুমারীর শিবিকা নিয়ে অন্য পথে চললো। কিন্তু মবারক এসে সসৈন্যে তাদের ঘিরে ফেললো। রাজসিংহ প্রমাদ গুনলেন। তিনি তাঁদের সৈন্যদের উদ্দেশে বললেন, 'আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। ...কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে দুইজন মোগল না মারিয়া মরিবে—সে রাজপুত নহে।...' তারা তোপ দখল করার জন্য এগিয়ে গেলো। এমন সময় চঞ্চলকুমারী শিবিকা থেকে নেমে মবারকের কাছে গিয়ে বললো, 'আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—

www.pathagar.com

ধর্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল,—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম।' শেষে সে জানালো, যদি উপায়ান্তর না থাকে তবে সে বিষপান করে আত্মহত্যা করবে। ঔপন্যাসিক এপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'মবারক সে ইতর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, "মা আত্মঘাতিনী কেন হইবেন? আপনি যদি যাইতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে লইয়া যাই?..."

মবারক আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো না। চঞ্চলকুমারী মবারকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হলো। মবারক বললো, 'বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।...মবারক আলী ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন—আমি বিদায় হইলাম।'

মবারক বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় শত শত বন্দুকের শব্দ শোনা গেলো। 'একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল।'

মানিকলাল যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দ্রুত রূপনগরে গিয়ে চঞ্চলকুমারীর বিপদের কথা রূপনগরের রাজাকে জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে সহস্র সৈন্য নিয়ে মোগল সেনাদের অতর্কিতে আক্রমণ করলো। আসার সময় নির্মলকুমারীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলো। মানিকলালের আকস্মিক আক্রমণে মবারকের সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পলায়ন করতে লাগলো। রূপনগরের সেনারা তাদের পেছনে ধাবিত হলো। মবারক তার সৈন্যদের একত্রিত করতে গিয়ে এক চোরা কূপের মধ্যে পতিত হলো। দরিয়া বিবি তাকে উদ্ধার করলো। মবারক তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলো।

রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে উদয়পুরে নিয়ে গিয়ে রাজমহিষীর সম্মান দিলেন এবং রূপনগরের রাজাকে বিস্তারিত জানালেন। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে লিখলেন '...আপনি বলপূর্বক আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছেন। আমার কন্যা পৃথিবীশ্বরী হইত, আপনি তাহাতে বাধ সাধিয়াছেন, আপনার বাহুতে যদি বল আছে তবে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহ কেন? আপনি আমার কন্যা বিবাহ করিবেন না। যদি আপনাকে কখনও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পাই, তবে ইচ্ছাপূর্বক আমি আপনাকে কন্যা দান করিব।' সুতরাং পিতার অমতে তাঁরা আপাতত বিয়ে করলেন না।

চঞ্চলকুমারীর অপহরণ-সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছলো। 'বাদশাহ রাগে স্বসৈন্যের মধ্যে কাহাকে পদচ্যুত, কাহাকে আবদ্ধ, কাহাকে বা নিহত করিলেন।' কিন্তু চঞ্চলকুমারী এবং রাজসিংহকে শাস্তি দিতে পারলেন না। কেননা 'রাজপুত কি করিতে পারে,

www.pathagar.com

তাহা প্রতাপ, আকবর শাহকে শিখাইয়াছিলেন'। সুতরাং 'দুনিয়ার বাদশাহকে কিল খাইয়া কিছুদিনের জন্য কিল চুরি করিতে হইল।'...

'কিন্তু ঔরঙ্গজেব কাহারও উপর রাগ সহ্য করিবার লোক নহেন। হিন্দুর অনিষ্ট করিতে তাঁহার জন্ম, হিন্দুর অপরাধ বিশেষ অসহ্য।..রাজসিংহের অপরাধ সমস্ত হিন্দু জাতির পীড়নই অভিপ্রেত করিলেন।...

ঔরঙ্গজেবের অধীন ভারতবর্ষ জেজেয়া দিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুতীর পর্যন্ত হিন্দুর দেব প্রতিমা চূর্ণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তাহার স্থানে মুসলমানের মসজিদ প্রস্তুত হইতে লাগিল।'...

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত কোনো কোনো রাষ্ট্রীয় নীতি তাঁর হিন্দু-দ্বেষিতার প্রমাণ বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে।

ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেছেন: '...He excluded Hindus from holding office so far as possible, cast down their temples, and harassed them by insulting regulations because he belived that he was bound to do so by the precedent of the early Khalifs. For the same reason he enforced the levy of the jizya.'... [১]

কিন্তু স্মরণীয়, ইসলাম ধর্মে মুসলিম এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, 'Islam takes for granted that people following other religions than Islam will continue to exist and live side by side with Muslims' [২] সেখানে আরো বলা হয়েছে, 'As for the peaceful non-Muslim neighbours the Muslims are enjoyed by the Holy Qur'an to deal with them kindly, justly and equitably as humanity demands.' [৩]

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি, ওরঙ্গজেব, আর যাই হোক একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন এবং তিনি ইসলাম-নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলতেন। সুতরাং ওরঙ্গজেব ইসলাম ধর্মের সাধক হয়েও ইসলাম ধর্মের মিথ্যে দোহাই দিয়ে হিন্দু দ্বেষিতাকে অন্তরে লালন করবেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা কঠিন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর হিন্দু বিরোধিতার স্বরূপ ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যেয়।

---

১ V. A. Smith, 'The Oxford History of India', p. 425.

২ Dr. Shaik Ghulam Maqsud Hilali, 'Islamic attitude towards non-Muslims,' Rajshahi, 1952, p. 11.

৩ ঐ, p. 18.

www.pathagar.com

বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত ওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষের প্রধান দু'টি দৃষ্টান্ত, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে জিজিয়া পুনঃ প্রবর্তিত করেন এবং বহু প্রাচীন হিন্দু মন্দির সমূহ ভেঙ্গে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন।

জিজিয়া পুনঃ প্রবর্তিত হলে রাজসিংহ ওরঙ্গজেবকে এক অম্ল-মধুর পত্রে তাঁর আন্তরিক ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করেন।[১] ওরঙ্গজেবের পুত্র আকবর বিদ্রোহে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে যে পত্র লেখেন তাতে হিন্দুদের উপর আরোপিত জিজিয়ার এই দুর্ব্যবহারের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[২]

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, খলিফা ওমরের সময় থেকে অমুসলমানদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করা হতো। জিজিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'In Islam jizya was taken from the non-Muslim subjects in return for the protection given to them and in lieu of military service. "It was more a relief than a burden, for it released them from compulsory military service involving grave responsibilities and risk of life which was incumbent of their Muslim fellow-subjects." When they served in the Muslim army, they were exempted from the tax.'[৩]

সুতরাং জিজিয়া ওরঙ্গজেবের উদ্ভাবিত পরধর্মীদের পীড়ন এবং শোষণের কোন নতুন কৌশল নয়। তবে ওরঙ্গজেব কেন নতুন করে এই কর প্রবর্তন করলেন, সে

---

১ রাজসিংহের পত্রের অংশ বিশেষ : 'All due praise be rendered to the glory of the Almighty, and the munificence of your majesty,.....

I have been informed that enormous sums have been dispated in the prosecution of the designs formed against me, your well-wisher ; and that you have ordered a tribute to be levied to satisfy the exigencies of your exhusted treasury....

How can the dignity of the sovereign be preserved who employs his power in exacting heavy tribute from a people thus miserably reduced ? At this juncture it is told from east and west, that the emperor of Hindostan, jealous of the poor Hindoo devotee, will exact a tribute from Brahmins, Sanorahs, Joghis, Berawghis, Sanyasees,....If your majesty places any faith in those books, by distinction called divine, you will there be instructed that God is the God of all mankind, not the God of Mahmadans alone....'উদ্ধৃত, Tod, 'Annals and antiquities of Rajsthan', London, 1950, pp. 302-303 (f. N.).

২ তিনি চিঠিতে লিখেন, 'হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর দুই বিপদ পড়িয়াছে—শহরে শহরে জিজিয়া আদায় আর মাঠে মাঠে শত্রুদের প্রাধান্য।'' উদ্ধৃত, 'রাজসিংহ', শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ১৮।

৩ Dr. Shaik Ghulam Maqsud Hilali, 'Islamic attitude fowards non-Muslims' p. 20.

www.pathagar.com

বিষয়ে নানা বিতর্ক হতে পারে। সম্রাট আকবর তো জিজিয়া থেকে হিন্দুদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন ; সুতরাং জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তিত হলে এর পেছনে ষড়যন্ত্র কল্পনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা এই পুনঃ প্রবর্তনকে হিন্দু দ্বেষিতার বর্ণে চিত্রিত না করে, যদি অর্থনৈতিক নিগ্রহের মধ্যে ফেলে পরম পরাক্রমশালী বিদ্রোহী রাজপুতদেরকে দমনের এক সহজ পন্থা বলে ধরে নি, তাহ'লে তা নিতান্ত অসঙ্গত হবে না। তবে একথা অনস্বীকার্য খলিফা ওমরের সময়ে প্রবর্তিত জিজিয়ার উদ্দেশ্য ওরঙ্গজেবের আমলে পালিত হয় নি—একে শত্রুদমনের অব্যর্থ এক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষের দ্বিতীয় এবং অন্যতম প্রমাণ, হিন্দুদের দেব-মন্দিরের বিলুপ্তি সাধন। এ-ব্যাপারে দু'টি বিপরীতধর্মী মত পাওয়া যায়। ভিন্সেন্ট স্মিথের ভাষ্য অনুযায়ী মুলতান, বেনারস প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণদের হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনে জনগণ, বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সংবাদ শুনে বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ সম্রাট প্রাদেশিক গবর্নরদের নির্দেশ দেন···'to destroy with a willing hand the schools and temples of the infidels;...Five months later the local officers reported that in accordance with imperial command the temple of Bishanath at Benaras had been destroyed.

After a short interval...temple of Kesara Deva at Mathura,... had been levelled with the ground. The foundation of a large and costly mosque was laid on the site.'[১]

যদুনাথ সরকার 'সিরাত-ই-আহমদী' থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতেও উপরি উক্ত তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় : 'The temple of Chintaman, situated close to Sarashpur, and built by Sitadas jeweller, was converted into a mosque, named Quawat-ul-islam by order of the Prince Aurangzib, in 1645.'[২] 'বোম্বে গেজিটিয়ার' পত্রিকায় এই সঙ্গে একটি অতিরিক্ত সংবাদ দেওয়া হয় '..he slaughtered a cow in the temple, but Shahjahan ordered the building to be restored to the Hindu'.[৩]

১ V. A. Smith, 'Oxford History of India', p. 416.

২ উদ্ধৃত, Jadunath Sarkar, 'History of Aurangzib', Vol. III, p. 280.

৩ উদ্ধৃত, ঐ, p. 280.

www.pathagar.com

ঔরঙ্গজেবকে চরম হিন্দুদ্বেষী বলে প্রমাণ করার জন্যে এই দু'টি ঐতিহাসিক তথ্যই যথেষ্ট। কিন্তু যদুনাথ সরকার একটি সমকালীন 'ফরমান' উল্লেখ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, 'It has been decided according to our Canon Law that long standing temple should not be demolished but no new temple allowed to be built.'[১] এই নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ। নতুন মন্দির নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ এ'ও হ'তে পারে, ভূমির সরকারী ফাঁকি দেবার জন্য অথবা দেবোত্তর ব'লে সম্পত্তি গ্রাস করার উদ্দেশে হয়তো নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতো। (ভূমি-গ্রাসের এই কৌশল বর্তমানকালেও দুর্লক্ষ নয়) অবৈধ উপায়ে সম্পত্তি হস্তগত করার পথ রোধ করার জন্যই হয়তো তিনি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তা না'হলে তাঁর পরম পরধর্ম বিদ্বেষের গ্রাস থেকে প্রাচীন মন্দির-গুলিও অব্যাহতি পেতো না।[২]

পূর্বোক্ত 'ফরমান'-এ বেনারসবাসী হিন্দু সম্প্রদায় এবং মন্দিরের পুরোহিতদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সরকারী নির্দেশও উল্লেখযোগ্য : 'Information has reached our...court that certain persons have harassed the Hindus resident in Benares and its envirous and certain Brahmans who have the right of holding charge of the ancient temples there, and that they further desire to remove these Brahmans from their ancient office. Therefore our royal command is that you should direct that in future no person shall in unlawful way interfere with or disturb the Brahmans and other Hindus resident in those places.'[৩]

সুতরাং 'বেনারস ফরমান' ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আনীত হিন্দু-বিদ্বেষ-সংক্রান্ত ঢালাও অভিযোগের ভার কিয়দাংশে লাঘব করে।

রাজপুতদেরকে জিজিয়া দেবার জন্যে ঔরঙ্গজেব নির্দেশ দিলেন। রাজসিংহ এই নির্দেশ অমান্য করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন কোনো দিনই জিজিয়া দেবেন না। মানিকলালের হাতে এক পত্রে রাজসিংহ এই কথা ঔরঙ্গজেবকে জানিয়ে দিলেন। মানিকলাল ও নির্মলা দরবারে গেলো। সম্রাট ঔরঙ্গজেব মানিকলালকে

১ উদ্ধৃত, Jadunath Sarkar, 'History of Aurangzib', Vol. III p. 281.

২ ঔরঙ্গজেব প্রাচীন মন্দির গুলিকে রেহাই দিয়ে নতুন মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, ঐতিহাসিক-দের এই তথ্য সুবোধ সেন গুপ্ত স্বীকার করেন না ; তবে অস্বীকার করার পক্ষে কোনো তথ্যও তিনি দেননি। দ্রষ্টব্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ১৪২।

৩ উদ্ধৃত, Jadunath Sarkar, 'History of Aurangzib', Vol. III, p. 281.

www.pathagar.com

হত্যা করার এক গোপন নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কৌশলে মানিকলাল পলায়ন করলো। নির্মলকুমারী রংমহল থেকে বের হবার সময় সম্রাটের সম্মুখে পড়লো। বাদশাহ তাকে নানা প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কোনো সঠিক জবাব পেলেন না। কিভাবে রংমহলে প্রবেশ করেছিলো, সেকথাও জানতে পারলেন না। শেষে বাদশাহ জানতে চাইলেন, মুক্তি ব্যতীত নির্মলার অন্য কিছু প্রার্থনীয় আছে কিনা। জবাবে নির্মলা বললো, 'আমরা হিন্দু, আমরা কেবল জগতে ধর্ম্মকেই ভয় করি, ধর্ম্মই কামনা করি। দিল্লীর বাদশাহ ম্লেচ্ছ, আর দিল্লীর বাদশাহ ঐশ্বর্য্যশালী। দিল্লীর বাদশাহের সাধ্য কি যে, আমার কাম্য বস্তু দিতে পারেন, কি লইতে পারেন?'

ঔঙ্গরজেব এবার ক্রুদ্ধ হয়ে তাতারীকে বললেন, 'যা। বাবুর্চিচ মহল হইতে কিছু গোমাংস আনিয়া, দুই তিন জনে ধরিয়া ইহার মুখে গুজিয়া দে।' এবার নির্মল বিষপানের ভয় দেখিয়ে বললো, 'আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।'

বাদশাহ নির্মলার কাছে বাকচাতুর্যে পরাভূত হয়ে মনে মনে বললেন, 'এ অমূল্য রত্ন, ইহাকে নষ্ট করা হইবে না। আমি ইহাকে বশীভূত করিব।' বাদশাহ যোধপুরীর কাছে নির্মলের থাকার ব্যবস্থা করলেন।

জেবউন্নিসা মবারককে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু মবারক তখন দরিয়াকে নিয়ে সংসার গড়তে চায়। সুতরাং সে জেবউন্নিসার সাথে সাক্ষাৎ করলো না। জেবউন্নিসা প্রতিহিংসা নেবার জন্যে, মবারক সম্পর্কে ঔরঙ্গজেবের কাছে নানা অতিরঞ্জিত কাহিনী বর্ণনা করলো। মবারক যে স্বেচ্ছায় পরাভব স্বীকার করে চঞ্চলকুমারীকে রাজসিংহের কাছে দিয়ে এসেছেন একথাও জানাতে ভুললো না। মোগল বাদশাহগণ নিজেদের ভগ্নী বা কন্যাদের অবৈধ কর্ম সম্পর্কে অবহিত থাকলেও তাদের কিছু বলতেন না, 'কিন্তু যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগিনীর অনুগৃহীত' তাদের শাস্তি বিধান করতেন। সুতরাং বাদশাহর নির্দেশে মবারককে সর্প-দংশনে নিহত করা হলো।

জেবউন্নিসা ভেবেছিলো সে মবারকের মৃত্যু-সংবাদ শুনে খুশী হবে; সহসা তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—এ শুকনা মাটিতে কখনও জল উঠে নাই।.... কৈ বাদশাহজাদী? হস্তিদন্ত নির্মিত রত্নদণ্ডভূষিত পালঙ্কে শুইলেও তো চক্ষের জল থামে না। তুমি যদি বাহিরে গিয়া দিল্লীর শহরতলীর ভগ্নকুটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কত লোক ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া কত হাসিতেছে। তোমার মত কান্না কেহই কাঁদিতেছে না।'

www.pathagar.com

জেবউন্নিসা খোজা আসীরুদ্দীনকে ডেকে মৃত মবারককে বাঁচাবার জন্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলো। কিন্তু তার আগেই মানিকলাল মবারককে চিকিৎসা করে পুনর্জীবিত করে তুলেছে। মানিকলাল মবারককে বিস্তারিত ঘটনা জানায়।

এদিকে বাদশাহ ওরঙ্গজেব সংবাদ পেলেন 'শাহজাদা আকবরের পঞ্চাশ হাজার মোগল সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রায় নিঃশেষে নিহত হইয়াছে।'

শাহজাদা অন্য পথ দিয়ে রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব শিবির ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্মলকেও মুক্তি দিলেন এবং বললেন, 'আলমগীর বাদশাহ তোমার ভিন্ন আর কাহারও কখন বশীভূত হয় নাই। আর কাহারও চক্ষুর কটাক্ষে মোহিত হয় নাই।...

দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না—কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে কেবল আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি—কিন্তু তোমাকে পাইলাম না। তোমায় ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইবনা—ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিবনা। তুমি যাও। আমাকে স্মরণ রাখিও। যদি কখনও আমা হইতে তোমার কোনও উপকার হয়, আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।...' নির্মল বিদায় নিলো।

প্রভাতে বিপুল সমারোহে মোগল সৈন্যদল যাত্রা করলো, সঙ্গে স্বয়ং ঔরঙ্গজেব। 'যেমন ঘোরনাদে গ্রাম প্রদেশ ভাসাইয়া—তিমি—মকর—আবর্ত্তাদিতে ভয়ঙ্করী, বর্ষাপ্লাবিতা স্রোতস্বতী, ক্ষুদ্র সৈকত ডুবাইতে চায়, তেমনই মহাকোলাহলে, মহাবেগে, এই পরিমাণরোহিতা অসংখ্যেয়া, বিস্ময়করী মোগল বাহিনী রাজসিংহের রাজ্য ডুবাইতে চলিল।'

কিছুদুর অগ্রসর হবার পর ঔরঙ্গজেব দেখলেন উঁচু পর্বতের উপত্যকায়, রাজসিংহ সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছেন। বাদশাহ বিপদের আশংকা করলেন। তিনি ফিরে আসতেও সাহস করলেন না, কেননা তাহলে পেছন দিক থেকে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। এমন সময় সওদাগরবেশধারী মানিকলাল মোগল সৈন্যকে কৌশলে ভিন্ন পথে নিয়ে গেলো। এই সুযোগে '...রাজসিংহ সিংহের মত লাফ দিয়া, পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া মোগল সেনার মধ্যে পড়িলেন। অমনই মোগল সেনা দ্বিখণ্ডিত হইয়া ...ন—ছুরিকাঘাতে যেন ফুলের মালা কাটিয়া গেল।' বহু রাজপুত সেনা নিহত হলো, মোগল সেনাও অনেকে প্রাণ দিলো। এদিকে রাজপুত সেনারা জেব-উন্নিসা ও উদিপুরী বেগমকে নিয়ে চললো উদয়পুরের পথে, সঙ্গে চঞ্চলকুমারী এবং নির্মল। অন্যদিকে

www.pathagar.com

বাদশাহসহ মোগল সৈন্যদল একটি সংকীর্ণ পার্বত্যপথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। দু'দিকে রাজপুত সেনা। মবারক এই যুদ্ধে রাজপুত সেনাকে অনেক সাহায্য করেছিলো। রাজসিংহ তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। মবারক বললো, 'মহারাজ। বে-আদপী মাফ হোক। আলি মোগল হইয়া মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া হিন্দু রাজ্য স্থাপনের কার্য্য করিয়াছি। আমি মৃত্যু-যন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাইতেছি।...আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমক হারামী করিয়াছি।... আমি কেবল এক পুরস্কার ভিক্ষা করি। আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন।'

ঔরঙ্গজেব সসৈন্যে সংকীর্ণ পথে অবরুদ্ধ হয়ে অনাহারে কাতর হয়ে পড়লেন। 'মোগল সেনামধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ উঠিল—স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শুনিয়া ঔরঙ্গজেবের পাষাণ নির্ম্মিত হৃদয়ও কম্পিত হইল। শাহানশাহ বাদশা, হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ মস্তক হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জানু পাতিয়া পর্ব্বতের কাঁকর তুলিয়া আপনার মাথায় দিলেন। দিল্লীর বাদশাহ রাজপুত ভুঁইঞার নিকট সসৈন্যে পিঞ্জিরাবদ্ধ মুষিক। একটা মুষিকের আহার পাইলেও, আপাততঃ প্রাণরক্ষা হইতে পারে।'

আর বন্দী উদিপুরীকে চঞ্চলকুমারী তামাকু সাজবার হুকুম দিলো। 'উদিপুরী কাঁদিয়া ফেলিল,—দুঃখে নহে রাগে। বলিল তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আলমগীর বাদশাহের বেগমকে, তামাকে সাজিত বল?'

চঞ্চলকুমারী বললেন, 'আমার ভরসা আছে, কাল আলমগীর বাদশাহ স্বয়ং এখানে আসিয়া মহারাণীর তামাকু সাজিবেন।...'

অন্যদিকে জেবউন্নিসা ভাবছিলো, কোথায় দিল্লীর বাদশাহজাদী, কোথায় উদয়পুরের বন্দিনী। '...কোথায় আজ গিরিগুহানিহিত উদয়পুরের কোটরে মুষিকবৎ পিঞ্জিরাবদ্ধ, রূপনগরের ভুইঞার মেয়ের বন্দিনী, হিন্দুর অস্পর্শীয়া শুকরী, হিন্দুপরিচারিকামণ্ডলীর চরণকলঙ্ককারী কীট! মরণ কি ইহার অপেক্ষা ভাল নহে?...'

তারপর জেবউন্নিসা মনে মনে মবারককে কামনা করতে লাগলো। এক সময়ে হঠাৎ মৃত মবারক যেন দেখা দিয়ে গেলো। জেবউন্নিসা পরের দিন চঞ্চলকুমারীকে গতোরাত্রের ঘটনা বিস্তারিত জানিয়ে, পুনরায় মবারকের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হলো।

'তখন জেবউন্নিসা হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ ভুলিয়া গেল।...ছিন্ন লতার মত সহসা চঞ্চলকুমারীর চরণে পড়িয়া গিয়া, চঞ্চলকুমারীর পায়ের উপর মুখ রাখিয়া..অশ্রু শিশির,...নিষিক্ত করিল।...

www.pathagar.com

চঞ্চলকুমারী তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন—তিনিও হিন্দু মুসলমান মনে রাখিলেন না'। তারপর জেবউন্নিসাকে চঞ্চলকুমারী বললো, আজ রাতেও তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে!

উদীপুরী চঞ্চলকুমারীকে অনেক আসরফি দিতে চাইলো, বিনিময়ে চাইলো মুক্তি। উত্তরে চঞ্চলকুমারী বললো, 'যদি বাদশাহ ভারতবর্ষের সকল মসজীদ—মায় দিল্লীর জুম্মা মসজীদ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন, আর ময়ূর তক্ত এখানে বহিয়া দিয়া যাইতে পারেন, আর বৎসর বৎসর আমাদিগের রাজকর দিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে তোমাদের ছাড়িয়া দিতে পারি।'

সে রাতে মবারক জেবউন্নিসাকে দেখা দিলো। মবারক বিস্তারিত ঘটনা বললো এবং জেব-উন্নিসার অনুরোধে তখনই 'মোল্লা' 'উকীল' 'গোওয়া'র সাহায্যে 'মবারক ও জেবউন্নিসার সরামত পরিণয় সম্পাদিত হইল।'

নির্মল এসে চঞ্চলকুমারীকে বাদশাহের দুর্দশার সংবাদ দিলো। শুনে কৌতুক ও আনন্দের সঙ্গে চঞ্চলকুমারী বললো, 'তাত লোক পরম্পরায় শুনিয়াছি। ইন্দুর গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মহারাজা গর্ত্তের মুখ বুজাইয়া দিয়াছেন। শুনিয়াছি ইন্দুর নাকি মরিয়া পচিয়া থাকিবার মত হইয়াছে।'

নির্মলকুমারী আরো জানালো, 'ইন্দুর বড় ক্ষুধার্থ।' নির্মল বাদশাহের প্রেরিত পত্র পড়ে শোনালো। বাদশাহ লিখেছেন :

'আমি তোমায় যেরূপ স্নেহ করিতাম, কোন মনুষ্যকে কখনও এমন করি নাই। তুমিও আমার অনুগত হইয়াছিলে। আজ পৃথিবীর দুর্দ্দশাপন্নলোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে। অনাহারে মরিতেছি। দিল্লীর বাদশাহ আর এক টুকরা রুটির ভিখারী। কোন উপকার করিতে পার নাকি? সাধ্য থাকে করিও। এখনকার উপকার কখনও ভুলিব না।'

নির্মলকুমারীর প্রতি ঔরঙ্গজেবের অনুরক্তির ঘটনা এই উপন্যাসের আর একটি বিতর্কিত প্রসঙ্গ। জনৈকা নর্তকীর প্রতি ঔরঙ্গজেবের দুর্বলতার কথা মনুচী উল্লেখ করেছেন : 'Aurangzeb grew found of one of the dancing women in his harem, and through the great love he bore to her he neglected for some time his prayers and his austerites, filling up his days with music and dances, and going even further, he enlivened himself with wine, which he drank at the instance of the said dancing girl. The dancer died, and Aurangzeb made a vow never to drink wine again nor listen to music.'[১]

১ Manucci, 'Storio do Mogor,' Vol. II, p. 231.

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, হীরাবাঈ ওরফে জিন্দাবাঈ নাম্নী জনৈকা সুন্দরী যুবতী ক্রীতদাসীর প্রতি ঔরঙ্গজেবের অনুরাগের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আম্রকুঞ্জে চঞ্চলা হীরাবাঈকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং 'The vision of her matchless charmes stormed Aurangzib's heart in a moment; "with shambeless importunity he took her away from his aunts' house and became utterly infatuated with her." So much so, that one day she offered him a cup of wine and pressed him to drink it. All his entreaties and excuses were disregarded, and the helpless lover was about to taste the forfidden drink when the sly enchantres snached away the cup from his lips and said, "My object was onlys to test your love for me, and not to make you fall into the sin of drinking !"[১]

দু'টি ঘটনারই স্থান দাক্ষিণাত্য। সুতরাং এ-থেকে এমন ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে, একটি ঘটনাই বিভিন্নভাবে পল্লবিত হয়েছে। এই কাহিনীর সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করে নিয়েও সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, 'কল্পনার এক বিশেষ প্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত করে তোলার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। এই বীজ থেকেই নির্মলকুমারী উদ্‌পাদিত হয়েছে, উড়ে গিয়ে আওরঙ্গজেবকে পাকড়ে ধরে ইসলাম ধর্মের পাশবিকতা শুনিয়েছে, বদজাত পাষণ্ড ইদুর বাঘ ইত্যাদি বলে ডেকেছে এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে মনোমোহিনী কটাক্ষে বাদশাহর হৃদয় প্রেমানলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে।'[২]

সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত ঔরঙ্গজেব-নির্মলকুমারীর কাহিনীকে 'ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার বিরোধী' বলে পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছেন।[৩] অপরপক্ষে অপর্ণাপ্রসাদ সেন গুপ্ত উপন্যাস বর্ণিত কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে নির্মলকুমারী চরিত্রকে সঙ্গত বলে অভিহিত করেছেন।[৪] সুকুমার সেন মনে করেন 'ব্যাপিকা নির্মলকুমারীর অনৈতিহাসিক ভূমিকায় বইটির ঐতিহাসিক পরিবেশ অনেকটা ক্ষুণ্ন।'[৫] আমাদের ধারণা নির্মলকুমারী এক বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে সর্বক্ষণ যন্ত্রচালিতের ন্যায় বিবরণ করায় তার বাস্তবতা যেমন পদে পদে বিচলিত হয়েছে, তেমনি তার আচরণের

১ Jadunath Sarkar, 'History of Aurangzib,' Vol. I, pp. 65-66,

২ মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি, এল, রায়,' পৃ. ২৮।

৩ সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ১৪৬।

৪ অপর্ণা প্রসাদ সেন গুপ্ত, 'বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস', কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ৬৩।

৫ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

www.pathagar.com

বিশ্বাসযোগ্যতাও পাঠককে সংশয়ী করে তুলেছে। তার অধর সর্বদা সুতীক্ষ্ণ বাক্য-কারে সজ্জিত, তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সম্রাট ক্ষণে ক্ষণে পরাভূত। কল্পনার এই বিশেষ প্রবণতার ফসল নির্মলকুমারী পাঠককে সর্বক্ষণ সচকিত করে রাখার জন্যে অদ্বিতীয় সন্দেহ নেই; তবে তা শেষ পর্যন্ত রসসৃষ্টির সহায়ক না প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে—প্রশ্ন সেখানেই। তবে এ কথা স্বীকার্য্য, টড যেভাবে ঔরঙ্গজেবকে রূপ-নগরের রাজকন্যার রূপমুগ্ধ ব'লে চিত্রিত করেছেন, মিতাচারী, ধার্মিক (অন্তত ঐতি-হাসিকগণের মতানুসারে) সম্রাটের পক্ষে তা অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন বলেই মনে হয়। কিন্তু 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বর্ণিত ঔরঙ্গজেবের চঞ্চলকুমারীকে বিয়ের প্রস্তাব দান ঔরঙ্গজেবের নিছক ছলনা মাত্র—তার পেছনে সক্রিয় ছিলো তাঁর দুর্বার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। এই ঘটনা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও অধিক বাস্তব এবং বিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।

উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনা,—রাজসিংহ সেনাপতিসহ মন্ত্রীপরিষদ নিয়ে ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে আলোচনায় বসলেন। নানা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রাণা দূত মারফৎ ঔরঙ্গজেবের কাছে পত্র প্রেরণ করলেন। তা-তে এই প্রস্তাব দেওয়া হ'লো : 'বাদশাহ, সমস্ত সৈন্য মেবার হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবেন। মেবারে গো-হত্যা এবং দেবালয় ভঙ্গ নিবারণ করিবেন এবং জেজেয়ার কোন দাবি করিবেন না।'...এই শর্তে ঔরঙ্গজেব রাজি হ'লে রাণা পথ মুক্ত করে দেবেন। পত্র ও খাদ্য প্রেরিত হলো।

এদিকে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীকে দিয়ে তামাকু সাজিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলো। তাদের বিদায় দেবার সময় স্মরণ করিয়ে দিলো পুনরায় যদি বাদশাহ 'হিন্দুবালার অপমানের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি কেবল তসবিরে পদাঘাত করিয়া সন্তুষ্ট হইব না।' তখন 'মহিষী, কন্যা ও খাদ্য পাইয়া ঔরঙ্গজেবের বেত্রা-হত কুক্কুরের মত বদনে লাঙ্গুল নিহিত করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।'

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনী টড্-রচিত ইতিহাসের ভিত্তিভূমিতে পরিকল্পিত হ'লেও ঔরঙ্গজেব ও রাজপুতদের যুদ্ধের মূল কাহিনী-বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অর্মের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাঁদের কেউই তথ্যগত অশুদ্ধি থেকে মুক্ত নন। এঁদের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী ও মনুচীর বিবরণের সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত সংস্করণ অবলম্বন করিয়া টড্ ও অর্মে ইতিহাস রচনা করেন, তাহাই তৎকালে সকলে

www.pathagar.com

বিশ্বাস করিত। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রধান ঘটনাও এই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।'[১]

টড বলেছেন, রূপনগরের রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ঔরঙ্গজেব দুই সহস্র অশ্ব সজ্জিত বিশাল সৈন্য দল প্রেরণ করেন।[২] তখন 'haughty' রাজকন্যা মোগলের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্যে কুল পুরোহিত মারফত রাজসিংহের কাছে এক পত্র দেন 'offering herself as the reward of protection', এবং তিনি পত্র সমাপ্ত করেন 'with a threat of self-destruction if not saved from dishonour'.[৩] অবশ্য রাজকুমারী রাজসিংহের বীরত্বে মুগ্ধ ছিলেন এমন আভাসও টড দিয়েছেন। উপন্যাসেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজকন্যা মোগলদের ঘৃণা করে বলেন, Is the swan to be the mate of the stork! a Rajpootni, pure in the blood, to be wife to the monkey-faced barbarian!'[৪]

চঞ্চলকুমারীর চিঠিতে এই বাক্যের অনুবাদ লক্ষণীয় : 'আমি রাজপুতকন্যা,... রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বক সহচরী হইব?... রাজকুমারী হইয়া কি প্রকারে তরকী বর্ব্বরে আজ্ঞাকারিণী হইব?'

এই অংশ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র পুরোপরি টড-অনুসারী। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক এই ঘটনার মধ্যে কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন টড এবং বঙ্কিমচন্দ্র যাকে রূপনগর বলেছেন, তার প্রকৃত নাম কিষণগড় (কৃষ্ণগড়) এবং এর রাজকন্যার নাম চঞ্চলকুমারী নয়, চারুমতী।[৫] চারুমতীকে ঔরঙ্গজেবের বিবাহের প্রস্তাব দান এবং রাজসিংহের নিকট চারুমতীর পত্র প্রেরণের (নিজে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে) কথা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন; তবে এ প্রসঙ্গে বলেন, '...ইহার জন্য ঔরঙ্গজেবের কোন সেনাবাহিনীর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয় নাই, এবং এই ঘটনার বহু বৎসর পরে রাজসিংহের সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ বাধে।'[৬]

যুদ্ধের বর্ণনা, ঔরঙ্গজেবের সসৈন্যে সুড়ঙ্গপথে অবরুদ্ধ হয়ে অনাহারে মরণাপন্ন হবার ঘটনা এবং রাণার হাতে উদিপুরার বন্দী হবার কথা ইত্যাদি বঙ্কিমচন্দ্র অর্মের

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, "রাজসিংহ", 'বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা', পৃ. ১৫২।
২ Tod, 'Annals and antiquities of Rajsthan', p. 301.
৩ ঐ।
৪ ঐ।
৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, "রাজসিংহ," 'বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা', পৃ. ১৫৩।
৬ ঐ,

www.pathagar.com

ইতিহাস থেকে আহরণ করেছেন। অর্মে বলেন, '...the division which moved with Aurangzeb himself was unexpectedly stopped by insuperable defence and precipices in front, whilst the Rajpoots in one night closed the streights in his rear, by faling overhanging trees; and from their stations above, prevented all endeavours of the troops either within or without, from removing the obstacle, Udiperri, the favourite and circassian wife of Aurangzeb accompanied him in this arduous war, and with her retinue and escort was enclosed in another part of the mountains; her conductors, dreading to expose her person to danger or public view, surrendered. She was carried to the Ranah, who received her with homage, and every attention, Meanwhile the emperor himself might have perished by famine, of which the Ranah let him see the risque, by a confinement of two days; when he ordered the Rajpoots to withdraw from their stations, and suffer the way to be cleared'.[১]

ঔরঙ্গজেবের মুক্ত লাভের পর রাণা উদিপুরীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং দূত মারফৎ অনুরোধ করেন, যেন পুনরায় কোনো ধ্বংসাত্মক কর্মে বাদশাহ লিপ্ত না হন বা রাজপুতদের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করেন, 'but Aurangzeb, who believed in no virtue but self-interest imputed the generosity and forbearance of the Ranah to the fear for future vengeance and continued the war'.[২]

এরপর ঔরঙ্গজেব আজমীরে গিয়ে যুদ্ধে নেতৃত্বে দান করেন এবং তাঁর পুত্র আজিম ও আকবর দীর্ঘদিন রাজপুতদের সঙ্গে লিপ্ত থাকেন।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার অর্মে-বর্ণিত এই কাহিনীকে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক এবং কাল্পনিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের সসৈন্যে সুড়ঙ্গ পথে অবরুদ্ধ হবার ঘটনা সম্পর্কে বলেন, 'The Emperor was methodically guarded in full force during his stay in Mewar. When he stopped at Deobari, his van occupied Udaipur; when he himself went to Udaipur, a strong force under Hassan Ali Khan advanced westwards pursuning the Rana to gogonda. The Rana, who was at this time a fugitive, could not have attacked the Emperor who occupied the centre without destroying the left or western wing of the Mughal army. On the contraroy he was actually defeated by

১ R. Orme, 'Historical Fragmants of the Mogul Empire', London, MDcccv, p. 85.
২ ঐ, pp. 85-86.

www.pathagar.com

this wing on 22nd January...As the Mughal line from Deobari to Udaipur was unbroken, Aurangzeb's communication with his rear could not have been cut off nor could his wife have been captured. Unless she had ventured west of Udaipur with slenders escort, which is highly improbable'.[১]

তবে রাজসিংহের পর্বতাঞ্চলে সসৈন্যে আত্মগোপন এবং অতর্কিত আক্রমণের কথা তিনি অন্যত্র সবিস্তারে বলেছেন।[২]

কাফি খাঁ ঔরঙ্গজেব এবং রাজপুতদের মধ্যে যুদ্ধে সম্বন্ধে টড ও অর্মের অনুরূপ একটি শ্রুতি-নির্ভর কাহিনী (ঔরঙ্গজেবের রুদ্ধ পথে আবদ্ধ হওয়া ব্যতীত) তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত ক'রে তার সত্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৩]

যুদ্ধের শেষে বর্ণিত কয়েকটি ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র টডের ইতিহাস থেকে নিয়েছেন। যেহেতু 'ঔরঙ্গজেব হিন্দু ধর্মের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল'—এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তিনি ঐতিহাসিক নজির গ্রহণ করেছেন টড থেকে ; the Kazees were bound and shaved, and the Korans thrown into wells.'[৪] এই বাক্যটি 'রাজসিংহ' উপন্যাসে উপসংহারের ঠিক আগে অনূদিত হয়ে যুক্ত হয়েছে এইভাবে ; '...রাজমন্ত্রী দয়াল সাহ...মালবে মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন।... প্রতিশোধের স্বরূপ ইনি কাজিদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কূয়ায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।'

'রাজসিংহ' উপন্যাসে যুদ্ধ ও মোগল শিবিরের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা টড বা অর্মের গ্রন্থ নেওয়া হয়নি। ঐতিহাসিক স্মিথ মনে করেন এগুলি সম্ভবত

---

১ Jodunath Sarkar, 'History of Aurangizib', Vol. III, pp. 379-80. আরো দ্রষ্টব্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার, "রাজসিংহ", 'বঙ্কিম উপন্যাসের ভূমিকা,' পৃ. ১৫৩।

২ যদুনাথ সরকার বলেন : '...the Rana had prepared for the invasion by abundoning the low country and retiring with all his subjects to the hills, Whither the Mughals durst not penetrate... About the Middle of next May Maharana descent from the hills and roamed the Bendor districts,...a terribly reverse befall the Mughal arms...' —'Short History of Aurangzib', p. 164.

৩ কাফি খাঁ এই কাহিনী বর্ণনা করে বলেছেন, 'Such is the story I have heard, but not from any trustworthy person.' —Muhammad Hasim Khafi Khan, Muntakhabu-l-Lubab', The Story of India' (as told by the Late Sir H.M. Elliot) (ed.), John Dowson, 3rd edn., Calcutta 1960, p. 96.

৪ Tod, 'Annals and Anliquities of Rajsthan,' p. 307.

www.pathagar.com

Dr. Gamelli Careri-এর গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে এই বর্ণনার নমুনা '... enclosure of the royal tents alone measured about three miles, and the whole camp, with circumstance of some thirty miles had a population of half a million. The separate bazars or markets numbered and every class of goods, even the most costly on sale'.[১]

উপন্যাসে বর্ণিত এর পরের ঘটনা মবারক-জেবউন্নিসা প্রসঙ্গে। জেব-উন্নিসা যুক্ত করে বাদশাহের সমীপে হাজির হলো। বাদশাহ তাকে ক্ষমা করলেন, কেননা তাঁর বিবেচনায় জেব-উন্নিসা স্বেচ্ছায় এ বিয়ে করেনি। কিন্তু তাকে সাবধান করে দিলেন, যেন বাইরে একথা প্রকাশিত না হয়। মবারককেও ক্ষমা করলেন এবং বললেন যেহেতু মবারক এখন তাঁর জামাতা সেহেতু তাকে 'দুই হাজারের মনসবদার' করে তার পদোন্নতি করা বাঞ্ছনীয়। মবারককে এই পদে উন্নীত করে পর্বত-মধ্যে অবরুদ্ধ শাহজাদা আকবরকে উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করলেন। 'মবারক এসব কথায় আহ্লাদিত হইলেন না; কেননা জানিতেন ঔরঙ্গজেবের আদর শুভকর নহে।'

বস্তুত তাই ঘটলো। বাদশাহ দিলার খাঁকে লিখলেন, মবারককে পাঠানো হলো, 'সে যেন একদিন জীবিত না থাকে। যুদ্ধে মরে ভালই,—নইলে অন্য প্রকারে যেন মরে।'

অনতিকাল পরেই ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, 'আমি সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বিশেষ, সে রূপনগরের কুঙারীকে ফেরৎ পাঠায় নাই...।' অতএব আবার যুদ্ধ শুরু হলো।

রূপনগরের রাজা বিক্রম সোলাঙ্গি রাজসিংহের সঙ্গে যোগদান করলেন। তিনি বললেন,...'আপনি মোগলকে যেরূপ শাসিত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, সমস্ত রাজপুত মিলিত হইয়া আপনার অধীনে কার্য করিলে মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইবে।'

আবার মোগল-রাজপুতের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো।

'যেমন গর্ত্ত হইতে পিপীলিকা বাহির হইবার সময়ে বালকে এক একটি করিয়া টিপিয়া ম'রে, তেমনই রাজপুতেরা মোগলদিগকে সঙ্কীর্ণ পথে টিপিয়া মারিতে লাগিল।...অধিকাংশই পালাইবার পথ পাইলনা—কৃষকের অস্ত্রের নিকট ধান্যের ন্যায় ছিন্ন হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল।'

---

১ উদ্ধৃত V.A. Smith, 'Oxford History of India', p. 426.

www.pathagar.com

প্রায় সব মোগল সেনাই নিহত হলো, মাত্র দু'চারজন যুদ্ধ করেই চললো। তাদের মধ্যে মবারক একজন। মানিকলাল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলো, কিন্তু মবারক বললো 'মরিব'। 'এমন সময়ে পাহাড়ের উপর থেকে উন্মাদিনী দরিয়া মবারককে বন্দুক দিয়ে গুলি করলো। মবারক প্রাণত্যাগ করলো।

এবার বিক্রম সোলাঙ্গি স্বহস্তে রাজসিংহকে কন্যা দান করে গেলেন। কিন্তু আবার ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সর্বনাশ সাধনের জন্যে তৎপর হলেন। আজিম তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। রাজসিংহের সঙ্গে মিলিত হলেন 'বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাস'। '...ঔরঙ্গজেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিলেন।...আর কখনও উদয়পুর মুখ হইলেন না। সে সাধ তাঁহার জন্মের মত ফুরাইল।'

রাজসিংহের অধিকার সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। কিন্তু তিনি 'দয়ার অনুরোধে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপিত করিলেন না'।

দীর্ঘ চার বৎসর ধরে মোগল-রাজপুতের যুদ্ধ চললো। পদে পদে মোগলরা পরাজিত হতে লাগলো। শেষে বাধ্য হয়েই ঔরঙ্গজেব সন্ধি করলেন। 'রাণা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল। মোগল এমন শিক্ষা আর কখনও পায় নাই।'

উপন্যাসের কাহিনী এখানেই শেষ। এরপরে ঔপন্যাসিক 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ বলছেন, 'গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্য রূপেই আছে।... অন্যান্য গুণের সহিত যাঁহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্ম শূন্য, তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।'

বঙ্কিমচন্দ্র-অঙ্কিত ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে বলা হয়েছে, ঔরঙ্গজেব-চরিত্রের নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অর্মে, টড, মনুচী প্রমুখ বিদেশী ঐতিহাসিকের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন। অতএব যদি কোনো বিবৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে তার জন্য

www.pathagar.com

বঙ্কিমচন্দ্র দায়ী নন।[১] কিন্তু একথা সত্য নয়। কেননা আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিকের ইতিহাস প্রকাশিত হয়নি।[২] সুতরাং বিদেশী ঐতিহাসিক ব্যতীত তাঁর গত্যন্তর ছিলো না। তবে এই সমস্ত ইতিহাস থেকে তথ্য গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিরপেক্ষকতা যে অক্ষুণ্ন থাকেনি, এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধ নেই। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়েও কোনো কোনো ঘটনা এবং চরিত্রকে বিকৃত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজপুত-মোগলের যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের উপস্থিতি ও লাঞ্ছনার কথা। টডের বর্ণনায় ঔরঙ্গজেব অনুপস্থিত, যুদ্ধের ভার তাঁর পুত্র আকবরের উপর ন্যস্ত। অর্মের গ্রন্থে বিপরীত দৃশ্য—ঔরঙ্গজেব যুদ্ধের অধিনায়ক। যদিও টড তাঁর গ্রন্থে এই তথ্য অস্বীকার করেছেন,[৩] তবু বঙ্কিমচন্দ্র এই ব্যাপারে 'তাঁর আনুগত্য টড্ থেকে স্থানান্তরিত করে অর্মে অর্পণ করলেন'।[৪] এই মানসিকতা যে নিরপেক্ষতার সরল রেখায় সঞ্চালিত নয়, একথা বলাই বাহুল্য। বরং যেহেতু 'আকবর আওরঙ্গজীবের সমকক্ষ নয়, সেইহেতু আকবরের চেয়ে ঔরঙ্গজীবের অপমান বেশী আনন্দদায়ক'[৫]-এই বোধই তাঁর চিন্তার নিয়ন্ত্রক। একই মানসিকতার কারণে জেবউন্নিসা, উপন্যাসে ফকরউন্নিসার কলঙ্কের দায় বহন করেছে তা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে।

ঐতিহাসিকগণ ঔরঙ্গজেবের দোষ ও গুণ উভয়ই উদ্‌ঘাটন করেছেন। এমন কি ঔরঙ্গজেব মৃত্যুকালে কৃত-অপরাধের জন্যে অনুশোচনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন, ঐতিহাসিক এই তথ্যও আমাদের দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে ঔরঙ্গজেব তাঁর পুত্রদের যে চিঠি লিখে যান, তা-তে একস্থানে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, 'I have committed numerous crimes, and know not with what punishment I may be siezed.'[৬]

---

১ সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ১৪২।

২ বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে বিদেশীদের ইতিহাস প্রচলিত ছিলো এবং তিনি বিশ্বাস করতেন বিদেশীদের কাছে এদেশের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়। তাই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' ((১৮৭৪) প্রকাশিত হ'লে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান। দ্রষ্টব্য, "বাঙ্গালার ইতিহাস", 'বঙ্গদর্শন', মাঘ, ১২৮১, পৃ. ৪৫০। তিনি নিজে এদেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন বলেও জানা যায়। দ্রষ্টব্য, নবীনচন্দ্র সেন, "আমার জীবন", 'নবীনচন্দ্র রচনাবলী', ২য় খণ্ড, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ১৬২।

৩ দ্রষ্টব্য, Tod, Annals and Antiquities of Rajsthan', p. 305 (Footnote).

৪ মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল রায়', পৃ. ২৮।

৫ ঐ।

৬ Tod, 'Annals and Antiquities of Rajsthan', p. 300.

www.pathagar.com

কিন্তু লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ফেনময় বর্ণনায় ঔরঙ্গজেবের শুধু দোষগুলিই এতো বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে তাঁর গুণাবলী পাঠকের কাছে অনুন্মোচিত থেকে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিরাট পুরুষের চরিত্র অত্যন্ত জটিল বলে তা ঐতিহাসিকদের কাছে চিরকালের বিস্ময়। এবং তা ঔপন্যাসিকের পক্ষে অবলম্বন করার একটি লোভনীয় উপাদানও বটে। কিন্তু লোভনীয় উপাদান হলেও এই উপাদান নিয়ে কারবার করা এতো কঠিন যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঔপন্যাসিকও সর্বদা সত্য রক্ষা করে চলতে পারেন নি।[১]

অস্বীকার করার উপায় নেই, ইতিহাসাশ্রয়ী মুসলিম চরিত্র-কল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-দৃষ্টি পক্ষপাতের প্রক্ষেপে আচ্ছন্ন; তবে একথা ওই শ্রেণীর বিখ্যাত পুরুষ চরিত্রগুলি সম্পর্কে বেশি প্রযোজ্য। কিন্তু 'তাঁর কল্পনা যখন নিজের সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি ধমনীতে উষ্ণ রক্তের মত সবেগে প্রবাহিত থাকে তখন তাঁর চিত্ত আর নিম্ন-মার্গীয় চিন্তার বশ থাকে না।'[২] তাঁর এই কল্পনা কোনো কোনো মুসলিম নারী চরিত্রকে ইতিহাসের কক্ষ থেকে চ্যুত করে নিয়ে এসেছে সাধারণ নরনারীর সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বপূর্ণ মাটির ঘরে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের জেব-উন্নিসাকে ঔপন্যাসিকের শৈল্পিক ভাবনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল বলে চিহ্নিত করা যায়। যদিও এই চরিত্রের প্রথমাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের নিরপেক্ষ শিল্প-দৃষ্টি অনুপস্থিত, কিন্তু অনতিপরেই বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাকে ইতিহাসের পঙ্কিল আবহ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন নিজের কল্পনার নির্মল জগতে। দর্পিতা শাহজাদীর অন্তরে জাগ্রত প্রেম তাকে সর্ব ঐশ্বর্য থেকে বিমুক্ত করে নিয়ে এসেছে একান্ত রিক্ততার মধ্যে। তার সব অহংকারের প্রাচীর চূর্ণ করে 'তাহাকে প্রেমের অতি দীনা ও অনুতপ্তা পূজারিণীতে পরিণত করিয়াছে; তাহার শাহজাদীত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে সাধারণ মানবীর সমতল ভূমিতে আনিয়া অধিষ্ঠিত করিয়াছে। তারপর তাহাকে আর ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া ধরা যায় না।'[৩]

পরিকল্পিত এবং পরিশোধিত মুসলিম চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সকল সংকীর্ণতার আবর্তকে অতিক্রম করতে পেরেছেন---একথা জেবউন্নিসা এবং মবারক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মবারক, উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম সার্থক চরিত্র। বীরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি মবারককে বাস্তবতার মহামূল্য স্বর্ণমুকুটে শোভিত করেছে।

---

১ অপর্ণা প্রসাদ সেন গুপ্ত, 'বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস,' পৃ. ৫৮-৫৯।

২ মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল রায়', পৃ. ৩০।

৩ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপনাসের ধারা', ৪র্থ সং, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৯৫।

www.pathagar.com

পাপের বিরুদ্ধে নির্দ্বিধ সংগ্রাম, স্বজাতি দ্রোহিতার জন্য আন্তরিক অনুতাপ, জেবউন্নিসার অসহায়ত্বে সমবেদনা---সব কিছু মিলে মবারক বাস্তবোজ্জ্বল।[১]

দরিয়া সংবাদ বিক্রয়িনী দরিদ্রা। কিন্তু সে ইতিহাসের উত্তাল প্রবাহের মধ্যে আপন মনে আপন হৃদয়ের প্রণয়-প্রবাহেরই অনুসরণ করে চলেছে। তদুপরি সে শাহজাদী জেবউন্নিসার প্রণয়দ্বন্দ্বিনী। তার এই প্রতিদ্বান্দ্বতা চরমে পৌঁচেছে, মবারককে গুলি করার মাধ্যমে। উন্মাদিনী দরিয়ার এই আকস্মিক আচরণ উপন্যাসে যেমন চরম নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে, তেমনি পাঠককেও পরম বিস্ময়ে সচকিত করে তুলেছে। দরিয়ার স্মৃতি পাঠক সহজে বিস্মৃত হতে পারে না, গভীর অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া দরিয়া পাঠকের অন্তরে গহনগূঢ় আলোড়নের সৃষ্টি করে।

তেমনি মবারকের মানবিক উজ্জ্বলের পাশে রাজসিংহ নিষ্প্রভ হয়েছে। মবারক রূপান্তরিত হয়েছে 'রণপণ্ডিতে' এবং রাজপুতবীর পরিশেষে 'হরণ অপহরণে দক্ষ' বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

জেব-উন্নিসা, দরিয়া বা মবারক বঙ্কিম-প্রতিভার ব্যতিক্রমা সৃষ্টি নয়, মুসলিম-প্রসঙ্গ সম্বলিত অন্যান্য উপন্যাসের অনেকগুলি চরিত্র বঙ্কিম-মানসের এই বৈশিষ্ট্যে প্রদীপ্ত। এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়ে আয়েসা ;-ওসমানের কথা।

১ বিজিত কুমার দত্ত, 'বাংলা সাহিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস', পৃ. ১৫০।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আনন্দমঠ

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের মধ্যে 'আনন্দমঠ'ই (১৮৮২) বোধ করি সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত। এই বিতর্কের অবতারণা হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কিছু উক্তিকে লক্ষ্য করে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মুসলিম-প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো সম্পূর্ণ কাহিনী গড়ে ওঠেনি বা কোনো মুসলিম চরিত্র এ'তে অঙ্কিত হয়নি। কেবল 'নবাব' এবং 'ভগবানের বিদ্বেষী' মুসলমানদের নিপাতকল্পে সন্তান সেনাদের মুখ দিয়ে তাদের প্রতি বিক্ষোভ অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে :

'১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল---লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচাঁর জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধ পেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

www.pathagar.com

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়।—উপবাস আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজ ধান খাইয়া ফেলিল, ঘর বাড়ি বেচিল, জোত জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কক্কুর ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল? যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল—জ্বর ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহার চিকিৎসা করেনা; কেহ কাহাকে দেখেনা; মরিলে কেহ ফেলেনা। ...যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।...

দুর্ভিক্ষের এই বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র কোনো কল্পনা বা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেননি। এই চিত্র ঐতিহাসিক এবং বঙ্কিমচন্দ্র দুর্ভিক্ষের বিবরণ হাণ্টারের গ্রন্থ থেকে প্রায় অবিকলভাবে নিয়েছেন। হাণ্টার এই দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস দিয়েছেন এইভাবে:

'In the early part of 1769 high prices had ruled owing to the partial failure of crops in 1768...Inspite of the complaint and forbading of the local officers, the authorities at head quarters reported that the land-tax had been regorously enforced; and the rents of 1769...seemed for a time to promise to releif...The September harvest, indeed was sufficient to enable the Bengal council to promise grain to Madras on a large scale, not withstanding the high prices. But in that month the periodical rains prematurely ceased, and the crop which depended on them for existence withered—'The fields of rice', wrote the native superintendent of the Bishenpore at a later period, are become like field of dried straw.'[১]

১ W.W. Hunter, 'The Annals of Rural Bengal', Vol. I, 4th edn., London, 1871, p.p. 20-21.

www.pathagar.com

হাণ্টার দুর্ভিক্ষের যে-চিত্র অঙ্কন করেছেন তা রীতিমতো ভয়াবহ ও মর্মান্তিক :

'All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle ; they sold their implements of agriculture, they devoured their seed-grain, they sold their sons and daughters till at lenght no longer of children could be found ; they ate the leaves of trees and the grass of fields ; and in June 1770 the Resident at Darbaar affirmed that the living were feeding on the dead. Day and night a torrent a famished and disease-sticken wretches poured in to the great cities. At an early period of the year pestilence had broken out. In March we find smallpox at Moorshedabad where, it glided through the viceregal mutes, and out off the Prince Syfut in his palace. The streets were blocked up with promiscuous heeps of the dying and dead.[১]

আধুনিক গবেষকের বর্ণনা হাণ্টারের অনুরূপ। জে. সি. সিন্‌হা বলেন, বাংলার মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে চরমে পৌঁছে দেবার জন্যে ১৭৭০ সালে এক অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। ১৭৬৯ সালের প্রধান ফসলের অজন্মা এবং পরবর্তী বৎসরের আংশিক অজন্মা এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। তিনি জানান, 'yet it appears incredible that within nine months, this famine sweft away ten millions of human beings, causing a loss of at least one-third of the inhabitants of the province.'[২]

হাণ্টার দুর্ভিক্ষের মৃতের অনুমানিক সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধারণা পূর্ণিয়া এবং পার্শ্ববর্তী অংশ সমূহের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি, এই সর্বগ্রাসী মন্বন্তরে মৃত্যুবরণ করেন।[৩] পুর্ণিয়ার জনৈক সরকারী কর্মচারীর প্রতিবেদন অনুযায়ী একমাত্র পুর্ণিয়াতেই মৃতের সংখ্যা দুই লক্ষ এবং সেখানে তিন দিনে এক হাজার ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। যেই প্রতিবেদক লিখেছেন,—'The famine continued for about twelve months in a degree of severity hardly to be parallaled in the history of any age on country.[৪]

---

১ Hunter, 'The Annals of Rural Bengal,' Vol. I, pp. 26-27.

২ J.C. Sinha, 'Economic Annal of Bengal,' London, 1921. p. 100. তিনি পাদটীকায় বলছেন, 'This was the estimate made by the council in November, 1772.'

৩ Court of Directors কে লিখিত ৯ মে ১৭৭০ তারিখের একটি পত্র থেকে হাণ্টার এই তথ্য নিয়েছেন। উদ্ধৃত, 'The Annals of Rural Bengal, Appendix-B.P. 401।

৪ উদ্ধৃত, A. K. Sinha, 'The Economic History of Bengal, Vol. II, Calcutta, 1962, p. 50.

www.pathagar.com

দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোক ক্ষয়ের সঙ্গে এক তৃতীয়াংশ ফসলের জমিরও ক্ষতি হয়।[১]

দুর্ভিক্ষের কারণ শুধু প্রকৃতির নির্দয় বিমুখতাই নয়—সেকালের প্রভাবশালী সরকারী কর্মচারীদের নির্দয়তাও একটি অন্যতম কারণ। এর প্রমাণ দুর্লভ নয়। Court of Directors কে লিখিত ২৩শে নভেম্বর ১৭৬৯ তারিখের এক পত্রে বলা হয়, যেহেতু বর্তমানে বিরাজমান দুর্দশা (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ) বৃদ্ধির সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল এবং আগামী ছয় মাসের মধ্যে তা প্রমাণিত হবে না একথা নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায়; সেহেতু আমাদের সৈন্যদের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য শষ্য গুদামজাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২] এবং 'Md Reza Khan accused the gomastas of the company's servants "not merely for monopolising grain, but for compelling the poor ryots to sell even the seed requisite for the next harvest.'[৩]

এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্য অনেক ঐতিহাসিকের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও রেজা খাঁকে অনেকাংশে দায়ী করেছেন এ কথা পূর্বে লক্ষ্য করা গেছে। হাণ্টার বলেন, সাধারণত কোনো একটি মৌসুমে ফসলের উৎপাদন মারাত্মক রকমের কম হলে, সাধারণ মানুষকে সরকারী সাহায্য অস্থায়ীভাবে মঞ্জুর করা হয়ে থাকে, কিন্তু ১৭৬৯-৭০ সালে এ জাতীয় সাহায্যের পৌনঃপুনিক প্রস্তাব, সামান্য কয়েকটি জায়গা ছাড়া সর্বত্রই নাকচ হয়ে যায়। '...In April a scanty spring harvest was gathered in; and the council acting upon the advice of its Musalman Minister of finance, added ten percent to the land-tax for the ensuing year.'[৪]

উল্লেখ নিষপ্রয়োজন, হাণ্টার-কথিত Musalman minister of finance' রেজা খাঁ ছাড়া অন্য কেউ নন। স্মিথও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, The revenue affairs were solely incharge of Md. Reza Khan, who did not worry about the sufferings of the people. He collected the revenue almost in full and added ten percent for 1771.[৫]

১ P.E. Roberts, 'History of British India,' A. 1 67.

২ উদ্ধৃত, Hunts, The Annals of Rural Bengal, Vol I, Appendix-B, p. 399.

৩ J.C. Sinha, 'Economic Annals of Bangal' p. 101.

৪ Hunts, 'The Annals of Rural Bengal,' Vol, I, p. 23.

৫ V.A. Smith, 'Oxford History of India,' p. 508.

www.pathagar.com

কেউ কেউ রেজা খাঁকে আরো রূঢ়ভাবে আক্রমণ করেছেন। বলা হয়েছে, রজস্ব আদায়ের প্রধান, ধূর্ত মোহাম্মদ রেজা খাঁ তার প্রভুদের চরিত্র সম্পর্কে গভীর-ভাবে অবহিত ছিলেন এবং অর্থের যে কি অসীম ক্ষমত্য সে বিষয়েও তিনি অন-বহিত ছিলেন না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই ব্যক্তির ব্যবহারিক এবং বাস্তব জীবনের যাবতীয় কৌশল করায়ত্ত ছিলো। দূর্গত মানুষের সেই দুঃসময়ে তিনি তার স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নিপুণভাবে সেই সমস্ত দল ও কৌশল প্রয়োগ করেন।[১]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার Court of Directors-কে লিখিত ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি পত্রে প্রদত্ত ১১৭৫ থেকে ১১৭৮ সাল পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্রমবৃদ্ধির হিসেব উল্লেখ করে রেজা খাঁকেই কটাক্ষ করেছেন।[২]

প্রায় সব ঐতিহাসিকই, সঙ্গত কারণে, দুর্ভিক্ষের সময়ে বলপূর্বক নিঃস্ব মানুষের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব-সংগ্রহকে, লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্গতি এবং মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু রাজস্ব-সংগ্রহ সংক্রান্ত সব ক্ষমাহীন অপরাধের দায়িত্ব এবং অনপনেয় কলঙ্কের কালিমা কি শুধু রেজা খাঁরই প্রাপ্য? এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের মন্তব্য উল্লেখ্য: 'There was everywhere blindness to distress in the interest of Sarkar (Government). Md. Reza Khan alone should not be blamed for straining the collection beyond what the country could bear. The Resident at the Durbar was the directing and controlling power. He was there to see that the Naib Diwan, the amils and the Supervisors brought in to treasury larger and larger sums. The general demand for the increase of revenue extended from the Court of Directors down to every one employed in revenue collection.'[৩]

সুতরাং প্রাগুক্ত পরিবেশে (দুর্ভিক্ষের সময়েই শুধু নয়) রেজা খাঁর প্রভাব, প্রতিপত্তি বা দূর্বার আর্থিক মোহ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থার পরিকল্পক এবং শাসনযন্ত্রের পরিচালক স্বয়ং শ্বেতাঙ্গ প্রভু, সেখানে

১ Transaction in India from the commencement of the French war in the 1756 to the condusion of the Late Peace in 1783 containing a History of the British Interests in Indostan during a period of 30 years. (London, Printed for J. Debrett etc.) উদ্ধৃত, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, 'বঙ্কিমচন্দ্র,' পৃ. ১৭৬।

২ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা", 'আনন্দমঠ', শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ।।৶-।।৵।

৩ N.K. Sinha, 'The Economic History of Bengal', Vol. II, p. 55.

www.pathagar.com

রেজা খাঁর মতো কর্মচারীর বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করা না করার দায়িত্ব বা ক্ষমতা কতটুকু সেটা বিবেচনার বিষয়।

আর একটি কথা সর্বস্বীকৃত, স্বয়ং মীর জাফর ছিলেন 'Puppet Nawab of Bengal'.[১] মীর কাসিম ব্যতীত অন্যান্য উত্তরাধিকারিগণও ওই একই বিশেষণের যোগ্য। সুতরাং রেজা খাঁর ক্ষমতা যে কতোখানি সীমাবদ্ধ ছিলো বা আদৌ তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিলো কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা একেবারে অসংগত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, '...তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের... আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ট নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুল কলঙ্ক মীর জাফরের উপর। মীর জাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীর জাফর গুলি খায় ও ঘুমায়।'

মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাস বিদিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত সময়ে মীর জাফর জীবিত ছিলেন না।[২] সমালোচক সুধাকর চট্টোপাধ্যায় বলেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পাঁচ বৎসর পূর্বে মীর জাফর মৃত্যুবরণ করেন 'অথচ এই মন্বন্তরের আধি-ভৌতিক কারণ হিসেবে। [বঙ্কিমচন্দ্র] বলেছেন, "মীর জাফর গুলি খায় ও ঘুমায়"। মন্বন্তরের সময় মীর জাফর চির নিদ্রায় নিদ্রিত।'[৩]

সুতরাং এই দুর্ভিক্ষের পাপ মীর জাফরকে স্পর্শ করে না। অবশ্য মীর জাফরের ভাং জাতীয় মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তির কথা জানা যায়।[৪] যাই হোক, রেজা খাঁ বা প্রাকৃতিক কারণেই হোক দেশে যখন দুর্ভিক্ষ বিরাজমান, 'directing and controlling'-এর প্রত্যক্ষ ক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁদের ভূমিকা তখন কি ছিলো? তাঁরা দুর্গত মুমূর্ষু দেশবাসীর প্রাণ রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? তাঁদের বরাদ্ধকৃত 'relief' এর কি ছিলো? নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ তার হিশেব দিয়েছেন: 'Government

---

১ P.E. Roberts, 'History of British India', p. 153.

২ মন্বন্তরের পাঁচ বৎসর পূর্বে মীর জাফর ইহলোক ত্যাগ করেন। 'After Languishing several Weeks at Calcatta, he returned to Moorshedabad, loaded with disease, and did in January, 1765.'
—James Mill, 'The History of British India,' Vol. III, 5th edn. London, M Dccc LV III, p. 250.

৩ শ্রী সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, 'কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র', কলিকাতা, ১৩৭০, প. ২৬৮।

৪ মীর জাফরের ভাং প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, '...When once duly seasoned with his doze of bhang [ভাং] he [Mir Zaafar-Khan], was incapable of attending to bussiness, specially after his meal :—Syed Gholam Hossain, 'Seir Mutaqherin', p. 258.

www.pathagar.com

relief efforts according to Hunter amounted altogether, a distribution of 90,000 thousand rupees among thirty millions of people (of Bengal and Bihar) of whom six in every sixteen were officially admitted to have perished. 'Not even five percent of the land revenue was remitted and ten percent was added to it for the next year. The relief measures were inhumanly inadequate.'[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রেজা খাঁ, বা নবাব কেউই একা এই দুর্ভিক্ষ এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণনাশের জন্য দায়ী নন। এর মূল খুঁজতে হবে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের অবিবেকী শোষণনীতি এবং অমানবিক ঔদাস্য ও নজিরবিহীন অর্থ লোলুপতার অভ্যন্তরে।

শিবনাথ শাস্ত্রী বলছেন, 'দুর্ভিক্ষের বছরে প্রজা সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ যদি কালগ্রাসে পতিত হইল, তার পর বৎসরে এত রাজস্ব আদায় হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি পত্রে পেয়েছেন, যাতে পৈশাচিক শোষণের নির্মম চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। হেস্টিংস্ *লিখেছেন*, 'It was naturally to be expected the diminution of the revenue should have kept an equal pace with the other consequences of so great a calamity. That it did not was owing to its being violently kept up to its former standard. To ascertain all the means by which this was effected will not be easy.... One tax, however, we will endeavour to describe, as it may serve to account for the equality which has been preserved in the past collections, and to which it has principally contributed. It is called Najar, and it is an assessment upon the actual inhabitants of every inferior description of lands to make up for the loss sustained in the rents of their neighbours, who are either dead or fled from the country.'[২]

নিঃশেষিত মানুষের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত দোহন করার লিখিত দলিল আর হতে পারে?

সন্তানদের মুখ দিয়ে মুসলমান রাজার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশিত উপন্যাসের শুরু থেকেই। ভবানন্দ বলেছে, 'যে রাজা রাজ্যপালন করে না, সে আবার রাজা কি?... কোন দেশে মানুষ না খেতে পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উই মাটি খায়? বনের

১ N. K. Sinha, 'The Economic History of Bengal' Vol. II, p. 57.

২ উদ্ধৃত, শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ২য় সং, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৯২।

www.pathagar.com

লতা খায় ? . . . কোন দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউএর পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই ? পেট চিরে ছেলে বাহির করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ। আমাদের রাজা রক্ষা করে কই ?

ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশা-খোর দেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে ? . . .

মহে।...ইংরেজ মুসলমানের এত তফাৎ কেন ?

ভবা। ধর এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পালায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পালায়, শরবৎ খুজিয়া বেড়ায়—ইংরেজের জিদ আছে—যা ধরে তা করে, মুসলমানের এলা-কাড়ি।...একটা গোলা দেখিলে মুসলমানেরা গোষ্ঠীশুদ্ধ পালায়—আর গোষ্ঠী-শুধু গোলা দেখিলে তো ইংরেজ পালায় না।'

সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র নগরের কারাগারে বন্দী হলে, সমবেত সন্তানদের উদ্দেশ্যে 'মঠের দ্বারে দাড়াইয়া তরবারি হস্তে জ্ঞানানন্দ উচৈচঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমরা অনেকদিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া এই যবনপুরী ছারখার করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়ারের খোয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু যিনি অনন্ত জ্ঞানময়,...যিনি দেশ হিতৈষী...যিনি আমাদের শক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানদের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধার নাই ?... চল আমরা যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধুলি গুড়ি দিই। সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া খড় কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই।"

সন্তান সেনারা কারাগার ভেঙ্গে মহেন্দ্র ও সত্যানন্দকে মুক্ত করে 'যেখানে মুসল-মানের গৃহ দেখিল আগুন ধরাইয়া দিল'। কিন্তু তারা কামান ও বন্দুকের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো। মহেন্দ্র সন্তানদের মন্ত্রে দীক্ষিত হলো। মহেন্দ্রকে সত্যানন্দ তাদের ব্রতের উদ্দেশ্য জানালেন, 'আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল মুসল-মানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের বংশ নিপাত করিতে চাই।'

তারপর তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে বলে, ভাই বিষ্ণু পূজা করবি ? এই বলিয়া ২০/২৫ জন জড় করিয়া মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের গ্রামে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণ রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়। সন্তানেরা তাহাদের সর্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে।...মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ধর্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের

www.pathagar.com

জন্য আগ্রহ চিত্ত হইল। অতএব দিনে দিনে সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।... সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ-জীবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া দলবদ্ধ হইয়া দিগ দিগন্তরে মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল।...

যেখানে মুসলমানের গ্রাম দেখে প্রায় দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে।'

অবশেষে স্থির হলো রাজধানী দখল করা হবে। কিন্তু বাকি সন্তানদের খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, 'সবাই লুঠিতে বাহির হইয়াছে। গ্রাম সকল এখন অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম রেশমের কুঠি লুঠিয়া সকলে ঘরে যাইবে।' সত্যানন্দ বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'এ প্রদেশ সমস্ত আমাদের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।... হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে বৃহত্তর সেনা সন্তানের নিশান উড়াইবে।'

সেই রাত্রেই সন্তান সেনারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তারা পথিক বা গৃহস্থকে ধরে বলতে লাগলো, "বল বন্দে মাতরম্" নহিলে মারিয়া ফেলিব।" সকলেই বলিল, "মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে হরি হরি বল।"

গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলে তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্ব্বস্ব লুঠিতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, "মুই হেঁদু"।

দলে দলে... মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল।... মসলমানেরা বলিতে লাগিল, আল্লা আকবর এতনা রোজার পর কোরান শরিফ বেবাক কি ঝুটো হল; মোরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করি। তা এই তেলক কাটা হেঁদুর দল ফতে করতে পারলাম। দুনিয়া সব ফাঁকি।"... ইত্যাদি।

এখন বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত সন্তান সেনাদের সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই বলতে হয় 'আনন্দমঠ' ঐতিহাসিক কাল ও যুগগত অসঙ্গতি থেকে মুক্ত নয়। যেমন, এ উপন্যাসে যে-জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম বর্ণিত হয়েছে, তার উন্মেষ ঘটেছিলো উনিশ শতকের শেষ পাদে।[১] এই কালানোচিত্য দোষ বাদে, সন্তান সেনা পরিকল্পনার সামগ্রিক ত্রুটিও লক্ষ্য করার মতো। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন, 'প্রথমেই তো গোড়ায় গলদ'। 'আনন্দমঠ'-এর সন্তান সেনারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ,

১ Humayun Kabir, 'The Bengali Novel', Calcutta, 1968, p. 14.

www.pathagar.com

গীতা যোগশাস্ত্রে বুৎপন্ন। কিন্তু যে সমস্ত সন্ন্যাসী-ফকির প্রকৃত ইতিহাসের লোক, তারা বীরভূমে নয়, উত্তর বঙ্গে ঐ সমস্ত অত্যাচার করেছিলো। এবং তারা কাশী-এলাহাবাদ-ভোজপুরের নিরক্ষর অধিবাসী। তারা 'ভগবাদগীতার নাম পর্যন্ত জানিত না।...সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা...একেবারে লুঠেড়া ছিল,[১] কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারীও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায়ের কল্পনায় সৃষ্টি কুয়াশা মাত্র।[২]

অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুর্ভিক্ষের সুযোগে একদল লোক সে সময়ে এ জাতীয় দুর্বৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছিলো। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় এরা মুসলমানকে উচ্ছেদ করে হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গিত-প্রাণ। কিন্তু লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র যেকালের সন্ন্যাসীদের কথা বলেছেন, সেকালে কেবল হিন্দু সন্ন্যাসীরাই সেই বিশৃংখলায় অংশ গ্রহণ করেনি, মুসলমান ফকিরেরাও তাদের সঙ্গে ছিলো। যামিনী মোহন ঘোষ বলেন, '... the Muhammadan Fakir orders being organised in immitation of Hindu Sannyasis adopted a similar dress and similar habits. It was therefore difficult to distinguish one from another.'[৩] এই সকল ফকিরের নেতা ছিলেন মজনু শাহ।[৪] তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৭২ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে লিখিত এক পত্রে 'Supervisor of Rajshahi at Natore' জানান যে দুই সহস্র মুসলমান ফকির মজনু শাহের অধীনে আবির্ভূত হয়েছে। তিনি 'Khatta Pargana'-এর Deputy-এর চিঠি উল্লেখ করেন, 'Shah Mudjenoo, the Burrana Fakir being arrived with numerous body in the Pargana plundered all the goods and effects and carried away one of the principal men in the district under confinement.'[৫]

---

১ ওয়ারেন হেস্টিংস্ এই লুঠেরাদের বর্ণনা দিয়াছেন, 'Individuals of them are at all times scattered about the villages and capital towns of the province,...they are continually seen on the roads armed with swords lances matchlock and generally loaded with heavy bundles...' উদ্ধৃত, J. M. Ghosh, 'Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal', Calcutta, 1930, p. 18.

২ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা", 'আনন্দমঠ,' পৃ. ৸৹-৸৶।

৩ J. M. Ghosh, 'Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal,' p. 12.

৪ মজনু শাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আবু তালিব, 'ফকীর মজনু শাহ,' ২য় সং, ঢাকা, ১৯৮০।

৫ উদ্ধৃত, J. M. Ghosh, 'Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal', p. 47.

www.pathagar.com

এ জাতীয় অসঙ্গতি ছাড়াও সমালোচকগণ বলেন, সন্তান সেনাদের দেশপ্রেম 'বিলাতী Patriotism'-এর আদর্শে কল্পিত,[১] এবং কাহিনীর সাথে সমন্বয়ের অভাবে বর্ণিত তত্ত্ব যেন 'যায়গা পায়নি যায়গা জুড়েছে'।[২] কিন্তু তা সত্ত্বেও, মুসলমান-অত্যাচারের বিকল্প হিসেবে ইংরেজি শাসন ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণীয়,[৩]—যুগানুকূল এই বক্তব্যের জন্য 'আনন্দমঠ' জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো।[৪]

'আনন্দমঠ' সংক্রান্ত আলোচনা শেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন, মুসলমান শাসনের পতনের যুগে রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে অসহিষ্ণু হয়ে হিন্দু প্রজারা দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।[৫] অন্য একজন সমালোচক বলেন, 'সেই সময়ে বাঙ্গালী যদি মুসলমান শাসকদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক নহে কি?'[৬] অপর একজন সমালোচক প্রায় একই মত পোষণ করে মন্তব্য করেন, মুসলমান রাজশক্তি অত্যন্ত অসমর্থ তখন বিদ্রোহ বোঝাতে মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ বোঝাতে পারে 'এবং তখনকার বিদ্রোহী মুসলমানের বিরুদ্ধে ও হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠাকে একত্র করিয়া দেখিবে ইহাই স্বাভাবিক।'[৭]

এই যুক্তি খণ্ডন করা দুরূহ। কিন্তু সব সমালোচকই একটি বিষয়ে নীরব, তা'হলো উপন্যাসের সন্তান সেনারা মুসলমান শাসককে ছাড়িয়ে গিয়ে সাধারণ নিরীহ মুসলমান প্রজাদের সবংশ নিধনে ব্যাপৃত হয়েছে। অথচ ইতিহাস এমন কোনো

---

১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, "বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী", 'নারায়ণ', (বঙ্কিম-স্মৃতি-সংখ্যা), বৈশাখ, ১৩২২, পৃ. ৫৩৭-৩৮।

২ সত্যব্রত দে, 'রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা', কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ২০।

৩ R. C. Dutt, "Ananda Math", 'Encyclopaedia Britannica', Vol. VI, 11th edn. pp. 9-10. উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, "ভূমিকা", 'আনন্দমঠ', শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ১।/.।

৪ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, 'আনন্দমঠ' 'সাহিত্যরসের' জন্য আদর পায় নি, পেয়েছিলো দেশাভিমানের জন্য'। দ্রষ্টব্য, "শরৎচন্দ্র", 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৩৮, পৃ. ৮০৭। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলেছেন, 'ও ['আনন্দমঠ'] 'সেন্স' খুব ভাল বটে, ইহাতে আর্ট কম'। —হেমেন্দ্র কুমার রায়, "বঙ্কিম যুগের কথা : (৩)", 'ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১৩১৮, পৃ. ৮০৬।

৫ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা", 'আনন্দমঠ', পৃ. ।।৵.।

৬ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ১৭৭।

৭ সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ১৬৫।

www.pathagar.com

সাক্ষ্য বহন করে কিনা জানি না যে, মুসলমান নবাব বা শাসক স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত আচরণ করেছেন বা তারাও (মুসলমান প্রজারা) নিগৃহীত এবং নিপীড়িত হয়নি।

এই কারণে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সমদর্শিতা বিভ্রান্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে বার বার। অবশ্য শুধু 'আনন্দমঠ' দিয়েই যে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতার চূড়ান্ত বিচার সম্ভব নয়—সে বিষয়েও আমরা সচেতন।

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতারাম

'সীতারাম' (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস। এতে মুসলিম-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে নানাভাবে। তবে মুসলিম চরিত্রের ব্যবহার ব্যাপক নয়। উপন্যাসের শুরুতেই কাজির বিচারকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার চিত্র দেখা যায়। এই দাঙ্গার ফলে সীতারাম, গঙ্গারাম, শ্রী প্রভৃতি দেশ ত্যাগ করে—এর পরই উপন্যাসের মূল কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। অবশ্য পূর্বোক্ত ঘটনার প্রভাব ও মুসলিম-প্রসঙ্গ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এসেছে—মূল কাহিনী প্রবাহিত হয়েছে সীতারামের রূপজমোহ এবং সীতারামের ধর্মচ্যুতিকে কেন্দ্র করে। বলা বাহুল্য, উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে মুসলমান ফৌজদারদের সঙ্গে সীতারামের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমান সেনাদের দ্বারা সীতারামের সাময়িক বিপর্যয় এবং রাজ্যচ্যুতি ঘটেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের পতনের কারণ মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধের মধ্যে অবলোকন করেন নি; তিনি স্পষ্টই প্রমাণ করেছেন, সীতারামের পতনের অংকুর নিহিত ছিলো তার রূপজমোহ এবং তার ধর্মভ্রষ্টতার মধ্যে।

উপন্যাসের সূত্রপাত এইভাবে: '...ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতর, পথের উপর একজন মুসলমান ফকির শুইয়া আছেন।..সেকালে মুসলমান ফকিরেরা অতি মান্য ছিলেন। খোদ আকবর শাহ ইসলাম ধর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত হইয়াও একজন ফকিরের আজ্ঞাকারী ছিলেন। হিন্দুরা ফকিরদিগকে সম্মান করিত, যাহারা মানিত না, তাহারা ভয় করিত।...'

এ প্রসঙ্গে আকবরের 'ইসলাম ধর্ম্মে অনাস্থা'-বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতামত আলোচনা করা যেতে পারে। স্মিথ মনে করেন, সম্রাট আকবর ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চান এইভাবে, '...Monserrate reports a coversation between himself and Akbar in early 1582 when he did not pay any heed to the Muslim Formula of the faith'·১

১ V. A. Smith, 'Akbar the Great Mogul', 2nd edn., Bombay, 1962, p. 155.

www.pathagar.com

বাদায়ূনীও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে বলেন, 'after five or six years not a trace of Islam was left in him.'[১] এঁদের মতামতের সূত্র ধরে স্মিথ আরো জোর দিয়ে বলেন, '...Blochmann correctly states that 'the development of Akbar's veiws led him to the 'total rejection' of Islam,[২] and the gradual establishment of a new Faith combining the principal features of Hinduism and the five-worship of Parsis.'[৩]

কিন্তু ঐতিহাসিক রাম শর্মা, স্মিথ এবং অন্যান্যদের এই মন্তব্যকে খণ্ডন করে বলেন, 'There is nothing to warrant the statement of Smith that Akbar hated the very name of Prophet. Despite all that is recorded by Badayuni, his belief in the Prophet remained unshaken and any one insulting the Prophet in his dominion was sure of having a dagger-plunged in his breast. The Akbar-Nama mentions the Prophet with all respect ; Faizi's Nal-o-Daman presented to Akbar in 1595 contains a section on the prophet's praise. The observation of the Ain, that Akbar did not regard himself a Muslim falls to the ground when confronted with Akbar's assertion in his letters to Abdulla Khan than that he was a sound Muslim and a follower of the prophet as well. It simply implies that he could not consider as one fulfilling all the ordinances of Islam—a common enough confession in the orient.'[৪]

বাদায়ূনীর মতে আকবর তাঁর শাসনকালে দেশে নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।[৫] কিন্তু ঐতিহাসিক রামশর্মা বাদায়ূনীর এই বক্তব্যের তথ্যগত ত্রুটি এবং স্ববিরোধিতা প্রমাণ করেছেন। তিনি মনে করেন আকবর একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন।[৬]

---

১ Al-Badaoni, 'Muntakhabu-t-Tawarikh' (ed.), W. H. Lowe, Vol. II, Patna, 1973, p. 263.

২ Abul Fazal 'Allami, 'The Ain-i-Akbari', (tr.), H. Blochmann, Vol. I, Calcutta, 1873, p. 209.

৩ V. A. Smith, 'Akbar the Great Mogul,' p. 155.

৪ Sri Ram Sharma, 'The Religious Policy of the Mughal Emperors', Bombay, 1962, p. 42.

৫ বাদায়ূনী বলেন, 'The prayers of Islam, the fast, may even the pilgrimage were henceforth forbiddin.'—Al-Badaonie, 'Muntakhabu-t-Tawarikh', p. 316.

৬ Ram Sharma, 'The Religious Policy of the Mughal Emperors', pp. 36—38.

www.pathagar.com

আবুল ফজলও আকবরকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মুসলমান বলে চিহ্নিত করেছেন।[১] ইউসুফ আলী প্রমুখ পণ্ডিতও সম্রাট আকবরকে শুধু মুসলমান বলেই অভিহিত করেন নি, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন '...his [Akbar's] 'Devine Faith' or 'Devine Monothism' (Din or Tahid Ilahi) as being a mere reformed sect of Islam.'[২]

স্মিথ অবশ্য বলেছেন, আকবর প্রথম জীবনে ইসলামের বিধান অনুযায়ী পাঁচ বার নামাজ পড়তেন।[৩] সুতরাং আকবরের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য বিতর্কমূলক। প্রকৃতপক্ষে আকবর একটি নতুন ধর্মমত প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন এ কথা সত্যি, তবে তা 'ইসলাম ধর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত হইয়া' কিনা তা নিঃসংশয়ে বলা নিরাপদ নয়।

ঔপন্যাসিক বলেছেন, গঙ্গারাম অসুস্থ মাতার জন্য চিকিৎসকের বাড়ি যাচ্ছিল! সে অত্যন্ত সংকোচ ও বিনয়ের সঙ্গে ফকিরকে বললো, 'সেলাম শাহ সাহেব। আমাকে একটু পথ দিন।' কিন্তু ফকির কোনো সাড়া দিলেন না। তখন গঙ্গারাম কোনো উপায়ান্তর না দেখে ফকিরকে লঙ্ঘন করে গেলো। দুর্ভাগ্যবশতঃ ফকিরের শরীরে গঙ্গারামের পা ঠেকলো। ঔপন্যাসিক বলেন, এটি 'বোধ হয় ফকিরের নষ্টামি।' গঙ্গারামের প্রস্থানের পর ফকির সোজা কাজির কাছে চলে গেলেন। এবং অনতিকাল পরেই দু'জন পাইক নিয়ে গঙ্গারামকে গ্রেপ্তার করতে এলেন। গঙ্গারাম কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'কাফের! বদ বখ্‌ত! বেত্‌মিজ। চল।' পাইকরা গঙ্গারামকে প্রহার করতে করতে কাজির কাছে নিয়ে চললো।

'ফকির সাহেব দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে হিন্দুদিগের দুর্নীতি সম্বন্ধে অতি দুর্ব্বোধ্য ফারসী ও আরবী শব্দ সকল সংযুক্ত নানাবিধ বক্তৃতা করিতে করিতে সঙ্গে গেলেন।'

কাজি সাহেবের সামনে বিচার শুরু হলো। ফরিয়াদী শাহ সাহেব। কাজি সাহেব তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন এবং ফকিরের বক্তব্য সমাপ্ত হইলে

১ Abul Fazal 'Allami, 'The Ain-i-Akbari', pp. 162—167.

২ উদ্ধৃত, V. A. Smith, 'Akbar the Great Mogul,' p. 154. স্মিথ অবশ্য এই মত স্বীকার করেন না। দ্রষ্টব্য, ঐ, p. 154.

৩ তিনি বলেন আকবর বাল্যকালে একজন সুন্নী মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন এবং 'He continued to attend public worship regularly untill 1578.' 'The Oxford History of India', 3rd edn., Oxford, 1961, p. 357.

www.pathagar.com

কোরাণ ও নিজের চশমা এবং শাহ সাহেবের দীর্ঘ বিলম্বিত শুভ শ্মশ্রুর সম্যক সমালোচনা করিয়া পরিশেষে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, 'ইহাকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেল'।

গঙ্গারাম দেখলো প্রাণ তো গেলোই, তখন সে 'শাহকে এক লাথি মারল। তোবা তোবা বলিতে বলিতে শাহ সাহেব মুখে হাত দিয়া শাহ সাহেব ধরাশায়ী হইলেন। এ বয়সে তাঁর যে যে দুই চারটা দাঁত অবশিষ্ট ছিল, গঙ্গারামের পাদস্পর্শে তাহার মধ্যে অনেক গুলিই মুক্তি লাভ করিল।'

অতএব কাজি সাহেবের নির্দেশিত 'জীয়ন্ত কবর' অনিবার্য হয়ে উঠলো। যথা-রীতি গঙ্গারাম মাঠে আনীত হ'লো। দর্শনার্থীর ভিড়ে মাঠ ভরপুর। এমন সময়ে সীতারাম সেখানে উপস্থিত হয়ে কাজি সাহেবকে তোষণের সুরে বললেন, 'আলহম-দল-ইল্লা। মেজাজ মবারকের সংবাদ পাইলেই এ ক্ষুদ্র প্রাণী চরিতার্থ হয়।' তারপর সীতারাম অতি বিনয়ের সঙ্গে গঙ্গারামের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। এর বিনিময়ে দশ হাজার আসরফি দিতে চাইলেন, হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিলেন। কাজী সাহেবের ধর্মের দোহাই দিলেন কাজি। সাহেব বললেন, 'হিন্দু ধর্ম্ম যাহাই হোক, মুসলমানের ধর্ম্ম তাহার বড়। এ ব্যক্তি মুসলমানের অপমান করিয়াছে, উহার প্রাণ লইব—তাহাতে সন্দেহ নাই।' সীতারাম জানু পেতে অনুরোধ করলেন,... 'তোমার যে আল্লা আমারও সে বৈকুণ্ঠেশ্বর। ধর্ম্মাচারণ করিও।...'

চারিদিকে হর্ষধ্বনি 'ধন্য রায় মহাশয়। জয় কাজি সাহেব।' কাজি সাহেব তখন গোপনে শাহ সাহেবকে বললেন, দশ হাজার আসরফির পরিবর্তে গঙ্গারামকে মুক্তি দেওয়া যায় কিনা। শাহ সাহেব বললেন, 'আমার ইচ্ছা দুইটাকে এক কবরে পুঁতি।' কাজি সাহেব বললেন, 'তোবা। আমি তাহা পারিবনা। সীতারাম কোন অপরাধ করেন নাই।...'

তখন গঙ্গারামকে কবরস্থ করার জন্যে তার হাত-পায়ের বেড়ী খোলা হলো। এই সুযোগে সে সীতারামের ঘোড়া নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে পলায়ন করলো, কেউ তাকে ধরতে সক্ষম হলো না। কাজি সাহেব এর জন্যে সীতারামকেই দায়ী করলেন। সুতরাং তিনি বললেন, 'এবারে তোমাকেই পুঁতিব'। এবার অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে আরো সিপাহী এলো। কিন্তু দেখা গেলো ইতিমধ্যে জনতা দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে '... একদিকে সব মুসলমান আর একদিকে সব হিন্দু। মুসলমানদিগের অগ্রভাগে কতগুলি সিপাহী, হিন্দুদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি ঢাক-সড়কিওয়ালা

www.pathagar.com

হিন্দুরা বাছা বাছা আর সংখ্যায় বেশী। মুসলমানেরা তাহাদিগের কাছে হটিতেছে। হিন্দুরা "মার মার" শব্দে পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে।

এই মার মার শব্দে, আকাশ প্রান্তর, কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।... মার মার শব্দে হিন্দু চারিদিক হইতে চারিদিকে ছুটিতেছিল।..'

গঙ্গারামের ভগিনী শ্রী বৃক্ষা শীর্ষে বসে 'অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে মার! মার। শত্রু মার!...যেন সিংহ বাহিনী সিংহ পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছে। যেন মা অসুর-বধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছে "মার। মার শত্রু মার।" শ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, ভয় নাই, বিরাম নাই—কেবল ডাকিতেছে মার। মার। শত্রু মার। দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু মার, হিন্দু মানুষের—আমার শত্রু মার। শত্রু মার।...'

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল। চণ্ডীর বলে বলবান হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে রণক্ষেত্র মুসলমান শূন্য হইল।... এবং দেখা গেল একজন সড়কি-ওয়ালা শাহ সাহেবের কাটা মণ্ডু, সড়কিতে বিধিয়া উঁচু করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে।...'

বঙ্কিমচন্দ্র-বর্ণিত কাজির বিচার সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য নেওয়া যেতে পারে।

কাজিদের প্রভাব যে সে সময়ে অত্যন্ত প্রবল ছিলো নানা দিক দিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগ থেকেই কাজিরা যে বেশ স্বাধীন এবং উগ্র হয়ে উঠেছিলো, চৈতন্যদেবের কাজি দমন-প্রসঙ্গ স্মরণ করলে তা অনুমান করা যায়।

কাফি খাঁর বরাত দিয়ে যদুনাথ সরকার বলেন, সম্রাট ঔরঙ্গজেব রাজ্য চালনার কাজে এবং ছোট বড় সব বিষয়ে কাজিদের এতো প্রভুত্ব দিয়েছিলেন যে, বড় বড় ওমরা এবং মন্ত্রীদেরও তা ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।[১]

সেই সময়ে বাংলাদেশে সংঘটিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ঘটনা থেকে কাজিদের প্রতাপ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

চুনাখালিতে একজন মুসলমান ভিক্ষুক বৃন্দাবন নামে একজন তালুকদারের কাছে ভিক্ষা চাইলে বৃন্দাবন সেই ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেয়। তখন সেই ভিক্ষুক বৃন্দাবনের যাতায়াতের পথে কিছু ইট সংগ্রহ করে তাকে মসজিদ ব'লে ঘোষণা করে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা শুরু করে। বৃন্দাবন বিরক্ত হয়ে ইটগুলো ফেলে দিয়ে তাকে বিতাড়িত করে। ভিক্ষুক তখন নবাব জাফর খানের দরবারে বিচার প্রার্থনা করে। প্রধান কাজি মহম্মদ শরফ অন্যান্য উলেমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বৃন্দাবনের মৃত্যুদণ্ড দেবার

১ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা," 'সীতারাম', শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ১২।

www.pathagar.com

সুপারিশ করেন। নবাব জাফর খান বৃন্দাবনের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ কাজিকে জিজ্ঞাসা করেন, '... can in way this Hindu be saved from the death sentence? The Quzi replied : only so much interval may be allowed in the execution of his death-sentence as may be taken up in the execution of his interceder ; after that he must be executed.'[১]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আরো জানান, বাদশাহ এই মহম্মদ শরফকে নিজে নির্বাচন করে বাংলার কাজি নিয়োগ করে পাঠান। মুর্শিদ কুলী খাঁ সব মোকদ্দমায় এই কাজির মত (ফতোয়া) অনুসারে কাজ করতেন। 'সুতরাং গঙ্গারামের লঘু অপরাধে জীবন্ত সমাধির হুকুম সে যুগের বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সত্যের অনুসারী ; বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসূত অসম্ভব ঘটনা নয়।'[২]

এর পরের ঘটনা-প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য, 'এই দাঙ্গার পেছনে সীতারামের হাত ছিল, এ কথা বাহুল্য। কেননা মুসলমানের দৌরাত্ম বড় বেশী হইয়া উঠিয়াছে, কিছু দমন হওয়া ভাল। চন্দ্র ঠাকুরের মনটা এবিষয়ে আরও পরিষ্কার—মুসলমানের অত্যাচার এত হইয়াছে যে, গোটা কতক নেড়ার মাথা লাঠির আঘাতে না ভাঙ্গিলেই নয়। তাই সীতারামের অভিপ্রায়ের অপেক্ষা না করিয়াই চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধটা বেশী গড়াইয়াছিল—ফকিরের প্রাণ বধ এমন গুরুতর ব্যাপার যে সীতারাম ভীত হইয়া কিছুকালের জন্য ভূষণা ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। ...'

সীতারাম শ্যামপুকুর নামে এক গ্রামে গঙ্গারাম, চন্দ্রচূড় ঠাকুর প্রভৃতিকে নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং অচিরেই সেখানে একটা ছোট খাটো নগর গড়ে উঠলো।

'ইহা শুনিয়া দেশে বিদেশে যেখানে মুসলমান-পীড়িত, রাজভয়ে ভীত বা ধর্ম্ম রক্ষার্থে হিন্দুরাজ্যে বাসের ইচ্ছুক, তাহারা দলে দলে আসিয়া সীতারামের অধিকারে বাস করিতে লাগিল।'

অনতিকাল পরেই সীতারামের একটি সমৃদ্ধিশালী ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে উঠলো। কিন্তু তথাপি তিনি রাজা নাম ধারণ করলেন না, 'কেননা দিল্লীর বাদশা তাঁকে রাজা না করিলে তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন।'

---

১ Maulavi Abdus Salam, 'Riyazu-s-Salatin,' p. 283.

২ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা", 'সীতারাম', পৃ. ১৩-১৪।

www.pathagar.com

সুতরাং দিল্লীর বাদশাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে তাঁকে সম্রাট স্বীকার করে নিয়ে নিয়মিত জমিদারী খাজনা দিতে লাগলেন, 'আর নূতন নগরীর নাম "মহম্মদপুর" রাখিয়া হিন্দু মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন মুসলমানের অপ্রীতিভাজন হইবার আর কোন কারণই রহিল না।—

তথাপি, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতাপ খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, একটা ছল পাইলেই মহম্মদপুর লুঠপাট করিয়া সীতারামকে বিনষ্ট করিবেন।..'

তোরাব খাঁ অভিযোগ করলেন, সীতারামের জমিদারীতে বিদ্রোহী আত্মগোপন করে আছে। সুতরাং এই অজুহাতে 'তোরাব খাঁ সীতারামের ধ্বংসের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।'

সীতারামও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন, প্রজাদের অস্ত্র বিদ্যার প্রশিক্ষণ চলতে লাগলো। এই সময় চাঁদ ফকির নামে একজন মুসলমান ফকির সীতারামের সভায় যাতায়াত শুরু করলেন। ঔপন্যাসিক বলেন, 'ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী।... তাহারই পরামর্শ মতে নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সীতারম রাজধানীর নাম রাখিলেন "মহম্মদপুর"।—ফকির আসে যায়। জিজ্ঞাসা মতে পরামর্শ দেয়। কেহ বিবাদের কথা তুলিলে ক্ষান্ত করে।'

মুসলমানের সঙ্গে সীতারামের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো, তখন সীতারামের কনিষ্ঠা মহিষী রমা আতঙ্কিতা হয়ে ইষ্টদেবের কাছে প্রার্থনা করলো, 'হে ঠাকুর মহম্মদপুর ছারখার যাক—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হয়ে নির্বিঘ্নে দিনপাত করি।..' ইত্যাদি।

সাম্প্রদায়িক রেষারেষি রমার মতো স্নেহশীলা মাতাকে স্পর্শ করে না। স্বামীর সাম্রাজ্য নয়, স্বজাতির বিজয় উল্লাস নয়—সে চায় তার সন্তান যেন নিরাপদে থাকে। এমন কি এই নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজন হলে বিজাতীয় রাজার আনুগত্য স্বীকারও শ্রেয়।

'এই সময়ে হিন্দুর হিন্দুয়ানি বড় মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, মুসলমানের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজ মহম্মদপুর উচ্চচূড় দেবালয় সকলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিকটে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দৈবোৎসব, নৃত্যগীত হরিকীর্ত্তণে দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আবার এই সময়ে মহাপাপিষ্ঠ মনুষ্যাধম মরশিদ কুলি খাঁ মুরশিদাবাদের মসনদে আরূঢ় থাকায় সুবে বাংলার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার

www.pathagar.com

হইতে লাগিল—বোধ হয় ইতিহাস অত্যাচার কোথাও লেখে না। মুরশিদ কুলি খাঁ শুনিলেন হিন্দু ধুল্যবলুহিত, কেবল এইখানে তাদের প্রশ্রয়। তখন তিনি তোরাব খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন, "সীতারামের বিনাস কর"।

পাদটীকায় ঔপন্যাসিকের, মুরশিদ কুলি খাঁ সম্পর্কে মন্তব্য : 'ইংরেজ ইতিহাস-বেত্তাগণের পক্ষপাত এবং কিছুটা অজ্ঞতা নিবন্ধন সেরাজউদ্দৌলা ঘৃণিত এবং মুরশিদ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুরশিদের তুলনায় সেরাজউদ্দৌলা দেবতা বিশেষ ছিলেন।'

মুরশিদ কুলি খাঁ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য পরীক্ষণীয়। সীতারামের প্রতি মুরশিদ কুলি খাঁর ক্রোধের পরে আলোচিত হবে। সমালোচক বিজিত কুমার দত্ত বলেন, মুরশিদ খাঁ যথার্থই সিরাজদ্দৌলার চাইতে নিষ্ঠুর ছিলেন একথা অতিরঞ্জিত নয়। মুরশিদ কুলি খাঁ দিল্লীর বাদশার নির্দেশক্রমে বাংলার সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন এবং ক্ষমতা সংহত করার পর শোষণের নানাবিধ নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করতে থাকেন।[১]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও সেকালের শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে ফরাসী কুঠিয়ালদের প্যারিসে প্রেরিত পত্রের উল্লেখ করে বলেছেন, আজিম ও বাদশা মুরশিদ কুলি খাঁকে বিস্তর ক্ষমতা দিয়ে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। মুরশিদ কুলি খাঁ বঙ্গদেশে এসে 'নিজেই ঘৃণিত লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন'। তিনি প্রজা-শোষণের কোনো পন্থাই বাকি রাখলেন না। সমস্ত প্রদেশটি ক্রমাগত দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে লাগলো। শীঘ্রই লোকের হাতে আর টাকা থাকলো না। শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে অচিরেই মন্দা বিরাজ করতে লাগলো। 'বঙ্গদেশে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল।'[২]

অন্যদিকে ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট কিন্তু মুরশিদ কুলি খাঁর চরিত্রে আলো-আঁধারের মতো দোষ ও গুণের সমাবেশের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩] রাজস্ব আদায়, দুবৃত্তি অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে মুরশিদ কুলি খাঁর গৃহীত কঠোর ব্যবস্থার কথাও তিনি সবিস্তারে বলেছেন।[৪]

এ ছাড়া তিনি মুরশিদ কুলি খাঁ সম্পর্কে গ্ল্যাডউইনের যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তা-তে মুরশিদ কুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গ্ল্যাডউইন

১ বিজিত কুমার দত্ত, 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস', পৃ. ১১২।

২ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা", 'সীতারাম', পৃ. ১১।

৩ Stewart, 'History of Bengal', p. 253.

৪ ঐ, pp. 236-237.

www.pathagar.com

বলেন, 'Excepting Shaisteh Khan there has not appeared in Bengal, nor indeed in any part of Hindoostan, an Ameer who can be compared with Moorshed Cooly, for zeal in propagation of faith for wisdom, in the establishment of laws and regulations ; for munificence and liberality,...for rigid and impartial justice,...in short whose whole administration so much tended to the benefit of mankind and the glory of the creator.'[১]

তাঁর শাসনকালে ন্যায়বিচারের কথা 'রিয়াজ-উস-সালাতিন'-এ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি রাজ্যশাসন, ন্যায়বিচার এবং রাজনীতির সঠিক পথ অনুসরণে কাউকে অসন্তুষ্ট করার আশঙ্কায় ন্যায়পথ পরিহার করেন নি।[২] কথিত আছে, কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য তিনি তাঁর পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।[৩]

সুতরাং মুরশিদ কুলি খাঁকে 'মহাপাপিষ্ঠ' 'মনুষ্যাধম' বলে নির্বিচারে তিরস্কার করা সমীচীন নয়।

যাই হোক, সীতারামকে ধ্বংস করার উদ্যোগ শুরু হলো। সীতারামও সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগী হলেন। রমা আবার ভাবতে লাগলো তার শিশু সন্তানের কথা। সে মনে মনে বললো, 'মুসলমানেরা ডাকাত, চুয়াড়, গোরু খায়, শত্রু—তাহারা ছেলেই কি রাখিবে?' সে ভয়ে ভয়ে অনেককে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, 'হাঁগো, মুসলমানেরা কি ছেলে মারে?'

কেউ বললো, 'তারা কাকে না মারে? তারা গোরু খায়, নেমাজ করে, তারা ছেলে মারে না ত কি?' রমা ভয়ে শিহরিত হলো।

তোরাব খাঁ গঙ্গারামের গোপন সহযোগিতায় মহম্মদপুর আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর, 'বজ্রের প্রহারে আহতা অসুরী সেনার ন্যায় মুসলমান সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।' পীর বকস্ খাঁ নিহত হলেন। চন্দ্রচূড় এই সুযোগে ভূষণা দখল করার যুক্তি দিলেন। 'ভূষণা দখল হইল তোরাব খাঁ মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন।... বাদশাহী সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর

১ উদ্ধৃত, C. Stewart, 'History of Bengal', p. 253.

২ Maulavi Abdus Salam, 'Riyazu-s-Salatin', p. 258.

৩ 'Amongst his deeds of justice, it may be mentioned that to avenge the wrong done to another, obeying the sacred Islamic law, he executed his own son.'—ঐ, p. 258.

www.pathagar.com

আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহারাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।'

এখানে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যদুনাথ সরকার বলেন, সীতারাম তোরাব খাঁকে হত্যা করে ভূষণা দখল করলে মুরশিদ কুলি খাঁ অন্যান্য জমিদারের সহায়তায় সীতারামকে বন্দী করে রাজধানী দখল করেন।[১]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ভূষণা দখলের আগেই সীতারামের সঙ্গে যুদ্ধকালে মহম্মদপুরে মৃন্ময়ের হাতে পীর বক্‌স নিহত হন। পীর বক্‌স যদি ঐতিহাসিক বক্‌স আলি খাঁ হন, তাহ'লে পীর বক্‌সের মৃত্যুর ঘটনা ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয়। তবে লক্ষণীয়, বক্‌স আলি খাঁ মহম্মদপুর দখল করেন, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে মহম্মদপুর জয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বক্‌স আলি খাঁর নাম করেন নি, বলেছেন, 'মুসলমান সেনাপতি ও 'মুসলমান সেনা'।

এরপর মুসলিম-প্রসঙ্গ তেমনভাবে উত্থাপিত হয়নি। যা আছে তাহ'লো, গঙ্গা-রামের বিচারের সময় গঙ্গারামের বিরুদ্ধে চাঁদ ফকিরের সাক্ষ্য দান, জয়ন্তীকে প্রকাশ্যে প্রহার করতে অস্বীকার করলে জনৈক মুসলমান কসাইকে উপস্থিত করা হয়েছে। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'অনুচরবর্গ, কালান্তক যমের সদৃশ একজন কসাইকে লইয়া আসিল। সে মহম্মদপুরে গোরু কাটিতে পারিত না—কিন্তু নগর প্রান্তে বকরি মেড়া কাটিয়া বেচিত। সে ব্যক্তি অতিশয় বলবান ও কদাকার। সে রাজাজ্ঞা পাইয়া মঞ্চের উপর উঠিয়া বেতহাতে লইয়া জয়ন্তীর সন্মুখে দাঁড়াইল। বেত উঁচু করিয়া কসাই জয়ন্তীকে বলিল, 'কাপড়া উতার—তেরি গোস্‌ত টুকরা টুকরা করকে হাম দোকান মে বেচেঙ্গে।'

সীতারামের অধঃপতনের কালে চন্দ্রচূড় যখন তীর্থে গমন করেন তখন পথে চাঁদ ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ফকির জিজ্ঞাসা করলেন,

'ঠাকুরজি কোথায় যাইতেছেন?'

চন্দ্র। কাশী।—আপনি কোথায় যাইতেছেন?

ফকির। মোক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়?

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।'

---

১ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা", 'সীতারাম', পৃ. ।৶.।

www.pathagar.com

বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই উক্তি অবশ্যই ঔপন্যাসিকের।

উপন্যাসের একেবারে শেষে যখন মুসলমান সেনা সীতারামের দুর্গ অবরোধ করেছে, তখন রঘুবীর মিশ্র সীতারামকে বলেছে, '...আজ্ঞা পাইলে আমরা এই কয়জন নেড়া মুণ্ডকে হাঁকাইয়া দিই।'

কিন্তু কার্যত তা হয়নি। সীতারাম নন্দা, স্ত্রী ও জয়ন্তী মুসলমান সেনাকে অতিক্রম করে যাবার সময় সীতারাম একটি তোপ দখল করলো। 'সীতারামের হাতে তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিরাম শূন্য গভীর গর্জন করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত লৌহ পিণ্ড শ্রেণীর আঘাতে মুসলমান সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পালাইতে লাগিল। সূচীব্যূহের পথ সাফ। তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহিগণ লইয়া মুসলমান কণ্টক কাটিয়া বৈরি শূন্যস্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুঠিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল।'

সীতারাম মুসলমান সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে 'বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন'—উপন্যাসের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি ইতিহাস-সমর্থিত নয়।

সীতারামের পরিণতি সম্পর্কে 'রিয়াজ-উস-সালাতিন'-এ বলা হয়েছে, সীতারাম ধৃত হবার পর 'The Nawab enclosing Sitaram's face in cow-hide had him drawn to the gallow's in the eastern suburbs of Murshidabad and imprisoned for life Sitaram's women and children and companions.'[১]

স্টুয়ার্ট বলেছেন, বখস আলি খা, সীতারাম, তাঁর স্ত্রী পুত্র-কন্যা ও সহযোগীদের ধরে ফেলেন এবং 'sent them in irons to Moorshudabad, where Sitaram and the robbers were impaled alive and the women and children sold as slave.'[২]

ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন, ঢাকায় নবাবের কারাগারে বন্দী সীতারাম বিষাক্ত অঙ্গুরীয় চুম্বন করে প্রাণত্যাগ করে।[৩] নাটোর রাজবাড়ির একটি জীর্ণ অন্ধকার কক্ষে

১ Abdus Salam, 'Riyazu-s-Salatin', p. 267.

২ Stewart, 'History of Bengal,' p. 240.

৩ J. Westland, 'A Report on the District of Jessore,' Calcutta, 1874, pp. 27-28. 'বান্ধব' পত্রিকাতেও অনুরূপ মত প্রকাশ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য, "রাজা সীতারাম রায়", 'বান্ধব', মাঘ, ১২৮২, পৃ. ১৯৫।

www.pathagar.com

বন্দীদশায় সীতারাম মৃত্যুবরণ করেন, এমন একটি জনশ্রুতির কথা অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় উল্লেখ করেছেন।[১] শুলদণ্ডে সীতারামকে হত্যা করা হয়, একথা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন দিন কয়েক দীঘাপাতিয়ায় অবরুদ্ধ রাখার পর তাকে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[২] কিভাবে সীতারামের মৃত্যু হয়েছিলো সে বিষয়ে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। যদুনাথ সরকারও বলেন, 'Sitaram was overwhelmed and captured with his family and his capital was sacked (Feb-March, 1714).'[৩]

সীতারাম মুসলমানের হাতে ধরা পড়েছিলেন এবং (তাঁকে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছিলো এ নিয়ে মতোভেদ থাকলেও) তাকে হত্যা করা হয়েছিলো, এ বিষয়ে সব ঐতিহাসিক একমত। সুতরাং মুসলমান সেনাদের হাত থেকে সীতারামের উদ্ধার লাভের যে-চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করেছেন, তা ইতিহাস-সম্মত নয় সেটি লক্ষ্য করা গেলো। 'সীতারাম' উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলেছেন, 'সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এ গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই।'[৪] এখন সীতারামের পরিণতি বাদে, তার অভ্যুদয় ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে-কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা কতোখানি ইতিহাসানুগ এবং কতোখানি নয় সে-বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

যদুনাথ সরকার সীতারামের অভ্যুদয়ের সমসাময়িক কাল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ঔরঙ্গজেবের পতনোন্মুখ রাজত্বকালে বঙ্গদেশে অনেক অরাজকতা, বিদ্রোহ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। মারাঠা, রাজপুত এবং জাঠেরা বিদ্রোহ শুরু করে। বাদশার এই সব নিগ্রহ এবং অক্ষমতার সত্য সংবাদ সুদূর প্রান্ত বাংলায় অতিরঞ্জিত হয়ে এসে পৌঁছিল। এই সুযোগে জমিদারগণ খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিলো, দক্ষিণ বঙ্গ ও উড়িষ্যার অনেক ছোট ছোট পাঠান বংশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, সাধারণ ডাকাতের দল গ্রামে পথে লুণ্ঠন শুরু করলো। ১৬৯০ থেকে ১৬৯৭—এই আট বৎসর এভাবে বিদ্রোহ চললো। ১৭০০ সনের শেষ দিকে অসাধারণ দক্ষ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নতুন দেওয়ান মুরশিদ কুলি খাঁ বাংলায় এসে দেশে কিছুটা শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় অংশ ছাড়া তিনি

১ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, "সীতারাম", 'সাহিত্য', চৈত্র, ১৩০২, পৃ. ৮২৭।

২ ঐ, পৃ. ৮২৬-২৭।

৩ Jadunath Sarkar, (ed.), 'History of Bengal,' Vol. II, 2nd Imp., Dacca, 1972, p. 416.

৪ 'বিজ্ঞাপন", 'সীতারাম', শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

অন্যান্য অংশে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করতে পারলেন না—যেমন খুলনা জেলায় বিদ্রোহ অব্যাহত থাকলো।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে অরাজকতা রাজ্যময় আরো ব্যাপক আকার ধারণ করলো। ঠিক এই অশান্তি এবং অরাজকতার মধ্যে সীতারামের উত্থান।[১]

সীতারামের উত্থান ও পতন সম্পর্কে যদুনাথ সরকার অন্যত্র আরো বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন : 'Sitaram Ray of Bhushna an Uttar Rarhi Kayatha, and the son of the Hindu collector under the Muslim Foujdar of Bhushna (16 miles east of Magura in the Khulna district) took a lease of the Naldi Pargana (Modern Narail) from the Bengal Subadar, promising to pay the revenue regularly and to suppress the rebel Afgan and bandit gangs of that tract (c. 1688)...He is even said to have secured an imperial forman and title of Raja by paying tribute to the Emperor of Delhi. To keep up his new dignity he founded as new capital at the village of Bagjani (10 miles from Bhushna) and named it Muhammadpur (in honour of Muslim saint)....In pride of power, he humbled and robbed the smaller Zamindar of the country round and stopped sending any revenue to the Subadar....

At last in 1713 when he killed Sayyid Abu Turab, the Foujdar of Hugli, Murshid Quli could no longer overlook his audacity. A strong force was detached under Murshid Quli's relative Baks 'Ali Khan (newly appointed Foujdar of Bhushna) ; and with the help of all the neibouring Zamindars levis, Sitaram was overwhelmed and captured with his family, and his capital was sacked (Feb-March 1714). Thus fell the last Hindu Kingdom in Bengal.'[২]

সীতারামের রাজধানীর 'মহম্মদপুর' নামকরণ-প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র একটি প্রচলিত কাহিনী বা জনশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী, সীতারাম যখন রাজধানীর স্থান নির্বাচন করেন, তখন সেখানে মহম্মদ আলি বা মহম্মদ শাহ নামে জনৈক ফকির বাস করতেন। সীতারাম তাকে সে স্থান ত্যাগ করতে বললে তিনি সম্মত হন না। ফকিরের নামানুসারে রাজধানীর নামকরণ করলে ফকির সে স্থান ত্যাগ করবেন, একথা তিনি জানান। উপায়ান্তর না দেখে সীতারাম তাঁর রাজধানীর নাম রাখেন 'মহম্মদপুর'।[৩]

---

১ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা", 'সীতারাম', পৃ. ৯-১১।

২ Jadunath Sarkar (ed), 'History of Bengal', Vol. II p. 416.

৩ সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোর খুলনার ইতিহাস', ২য় খণ্ড, কলিকাতা, (?) পৃ. ২৩৭।

www.pathagar.com

এই মহম্মদ আলি বা মহম্মদ শাহকেই উপন্যাসের চাঁদ শাহ ফকির বলে মনে করা যেতে পারে। তবে পূর্বোক্ত জনশ্রুতি বাদে সতীশচন্দ্র মিত্র মনে করেন, 'পার্শ্ববর্তী সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতির প্রত্যাশায় এবং হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি বন্ধন করিবার উদ্দেশে' সীতারাম তাঁর রাজধানীর নাম 'মহম্মদপুর' রেখে-ছিলেন।[১]

যদুনাথ সরকার বলেন, সীতারাম নবাব-দরবারে নিজ উকিল (দূত) পাঠিয়ে সুবাদারকে সন্তুষ্ট করে তাঁর সুপারিশক্রমে দিল্লীর দরবার থেকে 'রাজা' উপাধি ও ফর্মান লাভ করেন।[২] তিনি সীতারামের রাজা উপাধি ও ফর্মান লাভ সংক্রান্ত একটি জনশ্রুতিরও উল্লেখ করেছেন, তা হ'লো, সীতারাম স্বয়ং দিল্লী গিয়ে, সেখানে মন্ত্রীদেরকে টাকা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে হস্তগত করে এই উপাধি ও ফর্মান লাভ করেন।[৩] বঙ্কিমচন্দ্রও সীতারামের দিল্লী গিয়ে মহারাজা উপাধি ও সনদ লাভের কথা বলেছেন।

তোরাব খাঁকে হত্যা করে সীতারাম ভূষণা দখল করলে, মুরশিদ কুলি খাঁ সীতারামের বিনাশের নির্দেশ দিয়ে বখ্‌স আলি খাঁকে প্রেরণ করেন, একথা ঐতি-হাসিক। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত 'সর্ব্বত্র হিন্দু ধূল্যবলুণ্ঠিত কেবল এইখানে তাদের বড় প্রশ্রয়' এবং এই কারণে মুরশিদ কুলি খাঁ ঈর্ষান্বিত হয়ে 'তোরাব খাঁর কাছে নির্দ্দেশ পাঠাইলেন—"সীতারামকে বিনাশ কর"—এই ঘটনা ইতিহাস বহির্ভূত।

এবারে তোরাব খাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, মহম্মদপুর আক্রমণ করে প্রচণ্ড যুদ্ধে তোরাব খাঁ 'মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন'। এই সংবাদ সত্য নয়। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন'-এ তোরাব খাঁর মৃত্যুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে এইভাবে : আবু তোরাব খাঁ যখন কোনক্রমেই সীতারামকে ধরতে পারলেন না, তখন তিনি তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ পীর খানকে দুইশতজন সৈন্য নিয়ে আসতে বলেন, '....On being apprised of this Sitaram concentrating his forces lay in ambush to attack aforesaid general [Pir Khan]. One day Mir Abu Turab with a number of friends went out for hunting, and in that heat of the chase alighted on Sitaram's frontires. Pir Khan was not in Abu Turab's company. The Zamindar [Sitaram] on hear-ing of this fancing Mir Abu Turab to be Pir Khan suddenly issued

১ শতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোর খুলনার ইতিহাস,' ২য় খণ্ড, কলিকাতা, (?) ২৩৮।

২ যদুনাথ সরকার, "ঐতিহাসিক ভূমিকা," 'সীতারাম', পৃ. ৭।

৩ ঐ, পৃ. ৭ (পাদটীকা)।

www.pathagar.com

out from the forest with his forces and attacked Mir Abu Turab from the rear. Although the later with a loud voice announced his name, Sitaram not hearing it inflicted wounds on Abu Turab with bamboo-clubs, and felled him from his horse.'[১]

তোরাব খাঁর মৃত্যু-সংক্রান্ত স্টুয়ার্টের বর্ণনায় সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, সীতারাম তোরাব খাঁকে চিনতে না পেরে হত্যা করেন এবং 'when Sitaram found that it was the Foujdar he had slain, he much regretted the circumstance, and told his followers that the Nawab would certainly revenge the in insult offered to his government, by flaying them alive, and by destroying the pergunnah of Mahmoodabad : he then respectfully delivered the body to the Foujdar's attendant, who carried it to Bhooshna, and intered it in the vicinity of that town.'[২]

এই উপন্যাসে বর্ণিত সীতারামের উত্থানের কাহিনী ইতিহাসের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক-শূন্য নয়। বাদশাহী সনদ লাভ, রাজধানীর মহম্মদপুর নামকরণ, দেশময় অরাজকতার সুযোগে তার উত্থান ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা।

তবে উপন্যাসে সীতারামের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে তার দুর্নিবার্য রূপজমোহ। এই দুর্বার রূপ-মোহের তাড়নায় সে রাজ্য হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে, পরিবার পরিজনের সর্বনাশ ডেকেছে, এমন কি তার নিজের জীবন বিপন্ন হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, চরম হঠকারিতা এবং অপরিণামদর্শী ঔদ্ধত্যই সীতারামের মর্মান্তিক পরিণতির মূল।

সুতরাং সীতারাম-চরিত্রে রূপজমোহ ইত্যাদির প্রভাব-কল্পনার জন্যই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রকে বলতে হয়েছে, 'এ গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই।'

১ Abdus Salam, 'Riyazu-s-Salatin,' p. 266.

২ Stewart, 'History of Bengal', p. 239.

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

বঙ্কিম-উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ : সমকালীন প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিচার

বর্তমান গ্রন্থের শুরুতেই আমরা বঙ্কিম-উপন্যাসের বিপুল জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছি।[১] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ যেমন বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অভিনন্দিত হয়েছিলো, তেমনি পরবর্তীকালে এর প্রবল প্রতিকূল সামাজিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছিলো। শুধু 'দুর্গেশনন্দিনী'ই নয়, বঙ্কিম-চন্দ্রের শিল্প-সৃষ্টির প্রশংসা করা সত্ত্বেও বহু হিন্দু সমালোচকই তাঁর সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসে হিন্দু মানস ও হিন্দু সমাজ-চিত্রের বিরূপ সমালোচনা করে-ছিলেন। তাঁদের অভিযোগের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো—বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সনাতন মূল্যবোধগুলো চূর্ণ করছেন, পরিবর্তে পাশ্চাত্যগন্ধী আচার-সংস্কার আমদানী করছেন, বিধবাদের প্রেম ও পরিণয়ের প্রশ্রয় দিচ্ছেন, বিবাহিতা হিন্দু রমণীদের পূর্ব প্রণয়ীদের সঙ্গে মিলনে উৎসাহিত করছেন, ইত্যাদি।[২]

বঙ্কিম-উপন্যাস, অনুকূল-প্রতিকূল এই যুগল প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই শুধু আক্রান্ত হয় তা নয়, অনতিকাল পরে মুসলমান সম্প্রদায়ের দিক থেকেও প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। মুসলমানদের বক্তব্য ও হিন্দুদের বক্তব্যের প্রায় অনুরূপ। তাঁরা দেখলেন বঙ্কিম-উপন্যাসে মুসলিম-প্রসঙ্গ বিকৃত হয়েছে, মুসলিম-চরিত্র সমূহ হয়েছে কল্পিত কলঙ্কে কলুষিত।

কিঞ্চিৎ বিলম্বে হ'লেও বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য শিল্প-প্রতিভা এবং তাঁর উপন্যাসের অনন্য সাধারণত্ব হিন্দু সমাজে যথার্থভাবে উপলব্ধ হয়। বিরূপ সামাজিক প্রতিক্রিয়াও ক্রমশ প্রশমিত হয়ে আসে। কিন্তু মুসলিম সমাজে এ নিয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ নেবার

---

১ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক সমাজে কী আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তার বিশদ বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য, সারোয়ার জাহান, "বঙ্কিম-উপন্যাসের উপসংহার," 'বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা,' মাঘ-আষাঢ়, ১৩৮৩-৮৪, পৃ. ৩৩-৩৪।

২ এ-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ ও তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য, সারোয়ার জাহান, "উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনা ও বঙ্কিমচন্দ্র," 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,' আষাঢ়, ১৩৮৮ (জুন, ১৯৮১), পৃ. ১-২৩।

www.pathagar.com

প্রয়াস অক্লান্ত থাকে সুদীর্ঘকাল ধ'রে, নানা ভাবে। ফল দাঁড়ায় এই, বঙ্কিমচন্দ্র একটি সম্পদায়ের কাছে 'ঋষি'র স্থায়ী শ্রদ্ধা-মর্যাদা পেলেন,[১] আর অপর সম্প্রদায়ের কাছে 'মুসলিম বিদ্বেষী' ব'লে ধারাবাহিক ঘৃণা পেতে থাকলেন। কাজী আবদুল ওদুদের ভাষায় 'একদল তাকে ভাবছেন দানব, অপর দল ভাবছেন দেবতা।'[২]

মুসলমানদের এই ক্ষোভ যে নিরঙ্কুশ সাহিত্যিক বোধ থেকে উৎসারিত নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ-প্রসঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মানস-পটভূমি বিশ্লেষণ করলে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বুঝা যাবে।

ইংরেজ এদেশের শাসনভার করায়ত্ত করার পর উনিশ শতকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সূচিত হয়। ক্ষমতাহৃত মুসলমান সম্প্রদায় স্বাভাবিক কারণেই নতুন রাজশক্তির প্রতি বিরূপতা পোষণ করতে থাকে, অপরপক্ষে হিন্দু সম্প্রদায় অনিবার্যভাবেই নব রাজশক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। নিজেদের বিরোধিতা এবং ইংরেজের অপ্রসন্নতা 'এই দুই শক্তির একমুখী টানে প্রাধান্য গর্বিত মুসলমান-দল অন্তর্হিত হয়ে গেল দেশের আমদরবার থেকে, সেখানে আসর জমলো দীর্ঘ দিনের অবহেলিত হিন্দুর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকারে বাংলার প্রধান অধিবাসী হলো হিন্দুই।'[৩] এই পরিস্থিতিতে হিন্দুর

---

১ সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু ঋষিই নয়, হিন্দু সমাজের ত্রাতা হিসেবে পূজিত হয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি : যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বিষ-বৃক্ষ," 'আর্য্যদর্শন', মাঘ, ১২৮৪, পৃ. ৪৩৬-৮৭; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "বাঙ্গালা সাহিত্য। বর্ত্তমান শতাব্দীর," 'বঙ্গদর্শন', ফাল্গুন, ১২৮৭, পৃ. ৪৮৯-৫১২ ; লোকনাথ চক্রবর্ত্তী, "চন্দ্রশেখর," 'নবভারত,' অগ্রহায়ণ, ১২৯০, পৃ. ২৯৭—৩১৩ ; "সাহিত্য সমালোচনা," 'পাক্ষিক সমালোচক,' মাঘ (২য় পক্ষ), ১২৯১, পৃ. ৬৩৫-৩৬ ; চন্দ্রনাথ বসু, "দুইটি হিন্দু পত্নী" 'প্রচার' ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৯৫, পৃ. ২১২-২০ ; অজ্ঞাতনামা, "ষ্টারে চন্দ্রশেখর," চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ,' কার্তিক, ১৩০১, পৃ. ১০৬-১৯ ; বীরেশ্বর পাঁড়ে "আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ," 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ; বৈশাখ, ১৩০২, পৃ. ৫১—৭৪ ; কিশোরী মোহন রায়, "বাঙ্গালার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান," 'ভারতী,' বৈশাখ, ১৩০২, পৃ. ৩—১৯। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও সমালোচকদের এই প্রবণতা লক্ষ্যযোগ্য। দ্রষ্টব্য, হেমচন্দ্র বসু, "বঙ্কিমচন্দ্র," 'সাহিত্য,' ফাল্গুন ১৩০৯, পৃ. ৬৮০—৭১৪ ; লোকনাথ চক্রবর্ত্তী, "ভ্রমর প্রসঙ্গ" 'বঙ্গদর্শন,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬, পৃ. ৬৮—৮৩ ; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও বঙ্কিমচন্দ্র," 'মানসী,' কার্তিক, ১৩২১, পৃ. ৪১৭—৩৯ ও অন্যান্য।

২ "বঙ্কিমচন্দ্র," 'শাশ্বত বঙ্গ,' কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ১২৬।

৩ কাজী আবদুল ওদুদ, "বঙ্কিমচন্দ্র," 'শাশ্বতবঙ্গ,' পৃ. ১২৯—৩০।

www.pathagar.com

পুনর্জাগরণের সূচনা হলো। এই পুনর্জাগরণবাদী মানসিকতা থেকেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঔপন্যাসিকের উত্থান। তাঁদের উপন্যাস সমূহ হিন্দু মুসলমানের তিক্ত অতীতের 'স্মৃতিকে জাগ্রত করে বর্তমান সম্পর্কের মধ্যে ছায়া' ফেললো।[১]

ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা এবং ইংরেজদের বিরূপতা—মূলতঃ এ-দু'টি কারণে মুসলমানগণ আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী এবং অন্যান্য সুবিধা থেকে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়লো। কিন্তু বিলম্বে হ'লেও তাদের মধ্যে এক সময়ে পুনর্জাগরণের সূচনা দেখা দিলো। এটা বোধ হয় একটা স্বাভাবিক নিয়ম যে, নব জাগৃতির কালে মানুষ 'তার অতীতে গৌরব-সন্ধানের অভিযান করে, তার ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্মাণ করে, আর ভবিষ্যতের জন্যে অতি কাংক্ষিত এক কল্পলোক গড়ে তোলে।'[২] মুসলমানদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয় নি। বাঙ্গালী মুসলমানগণ নিজেদের ঐতিহ্য-গৌরবের সন্ধান করলেন ইসলামের অতীত ইতিহাসের মধ্যে। পরাধীনতার দুশ্ছেদ্য বেষ্টনে আবদ্ধ থেকেও তারা অতীতের মুসলমান কর্তৃক দেশ-বিজয়ের কাহিনী উদ্ধার করতে ব্যাপৃত হ'লো 'অসাধারণ আবেগময়তার সঙ্গে'।[৩] হিন্দুরা যেমন পুরাণ প্রভৃতি থেকে নিজেদের গৌরবের সন্ধানে নিমগ্ন হয়েছিলো, মুসলমানরা প্রায় অনুরূপভাবেই ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসে গৌরবদীপ্ত স্বরূপ আবিষ্কারে মগ্ন হলেন।

এই পুনর্জাগরণের কালে তারা যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে এলো, তখন দেখলো হিন্দু-রচিত সাহিত্যে (বিশেষত উপন্যাস-কাব্য-নাটকে) মুসলমানদের অতীত ইতিহাসের গৌরবান্বিত চরিত্র সমূহ, যাঁদেরকে নিয়ে তাদের নবোদিত গর্ব সীমাহীন, তাঁদেরকে বিকৃত করা হয়েছে—তাদের ঐশ্বর্যময় অতীত যুগ হয়েছে ধূলি ধূসরিত। তারা ক্ষোভে বিস্ফোরিত হ'লো। মুসলমানদের ক্ষুব্ধ হওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয় তা বলাই বাহুল্য। তবে হিন্দু ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে বিরোধ-চিত্রের অঙ্কন বা ইতিহাস-খ্যাত মুসলিম চরিত্রের প্রতি বিদ্বেশ প্রকাশের মূল বোধ হয় শুধুই তাঁদের 'সাম্প্রদায়িক' মানসিকতার মধ্যে নিহিত ছিলো না। আগেই বলেছি উক্ত উপন্যাসগুলি হিন্দু ঔপন্যাসিকদের পুনর্জাগরণবাদী এবং জাতীয়তাবাদী মানসের সৃষ্টি। অর্থাৎ সেগুলি 'বাঙালি হিন্দুর জাতীয়তাবাদী ভাব-প্রকাশের বাহন হিসেবে পরিণত হয়েছিল।' তাঁরা

১ আনিসুজ্জামান, "মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য", ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৪০৬-৪০৭।

২ মুস্তফা নুরউল ইসলাম, "ভূমিকা," 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত,' ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১১।

৩ আনিসুজ্জামান, "ভূমিকা," 'মুসলিম' বাংলার সাময়িক পত্র' ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. [৩২]

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে দেশাত্মবোধ এবং বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রেরণাও লাভ করেছিলেন। অথচ একেবারে সরাসরি ইংরেজ-শাসকের বিরুদ্ধে লেখাও সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া আপন শ্রেণীস্বার্থেই হিন্দু মধ্যবিত্তের পক্ষে ইংরেজ শাসনের সরাসরি অবসান কামনা সম্ভব ছিলো না। 'তার কারণ ছিল একাধিক : ইংরেজের শক্তিমত্তায় বিশ্বাস, ইংরেজ শাসনের কল্যাণকর দিক সম্পর্কে আস্থা[১] এবং শিক্ষাদাতা ও কর্মদাতা হিসেবে ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ। সুতরাং স্বদেশ প্রেমের আবেগ ও পরাধীনতার গ্লানিবোধ প্রকাশের একটা পরোক্ষ উপায় খুঁজে নেওয়া হয়েছিল।'[২] সেটি আর কিছুই নয়, ইংরেজকে আক্রমণ করতে হ'লে আক্রমণ করতে হবে অতীত শাসক মুসলমানকে, বিশেষত মোগলকে।[৩] সেখানে তারা খুঁজে বের করলেন হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের কাহিনী অর্থাৎ রাজপুত-মারাঠাদের সঙ্গে মোগল-পাঠানের যে-লড়াই পাওয়া গেলো, সেগুলি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে চয়িত হলো। মুসলমানকে বহিরাগত শত্রু হিসেবে চিত্রিত করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হ'লো প্রথম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) কাব্যে। এই কাব্যের বিখ্যাত চরণ 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব-শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে,/কে পরিবে পায়!'—'টমাস মুরের কবিতা অবলম্বনে রচিত, আপাততঃ মুসলমানের বিরুদ্ধে কথিত'।[৪] কিন্তু একদা অবহেলিত

---

১ বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, 'ইংরাজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজের ধার ভারতবর্ষ কখন শোধিত পারিবে না।...ইংরাজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে।..' "ভারত কলঙ্ক," "বঙ্গদর্শন", বৈশাখ, ১২৭৯, পৃ. ১৭। 'আনন্দমঠ'-এর শেষে চিকিৎসকের জবানীতে বলেছেন, 'ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক শিক্ষায় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।..., 'আনন্দমঠ,' পৃ. ৭৮৭।

২ আনিসুজ্জামান "বাঙালি মুসলমান লেখকদের ভাবজগৎ," 'স্বরূপের সন্ধানে,' ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৬১।

৩ সমালোচক আনিসুজ্জামান বিষয়টির সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন ছোট্ট, একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে : কিশোর রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা, হিন্দু মেলায় পঠিত হয়েছিলো (১৮৭৭)। সেই কবিতার 'ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না' চরণটি, কবি-ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নময়ী' (১৮৭৮) নাটকে কিঞ্চিৎ অথচ অত্যন্ত তাৎপর্য পরিবর্তনসহ ব্যবহৃত হয়। পরিবর্তনটি আর কিছুই নয়, 'ব্রিটিশ'-এর জায়গায় 'মোগল' শব্দ যোজিত হয়। দ্রষ্টব্য, আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬২।

৪ আনিসুজ্জামান, "জাতীয়তাবাদ ও আমাদের সাহিত্য," 'পরিক্রম', চৈত্র, ১৩৬৯ (এপ্রিল, ১৯৬৩, পৃ. ৬৪১। তবে যেহেতু এই কাব্যের মর্মবাণী স্বদেশ-প্রেম, সেহেতু সেটি দীর্ঘকাল ধ'রে স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্ররূপে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পাঠকের কণ্ঠে আবৃত্ত হয়েছিলো।

www.pathagar.com

অথচ বর্তমানে শিক্ষা-সাহিত্য-চাকুরী ইত্যাদিতে অগ্রগামী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু সাহিত্যিকদের দেশ-প্রেম-প্রকাশের সূক্ষ্ম এই কৌশলকে প্রতাপচ্যুত ক্ষুব্ধ মুসলমান সম্প্রদায় একটি কঠোর সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির নগ্ন প্রদর্শন বলে গণ্য করলো। ক্রোধ যেখানে প্রবল, যুক্তি সেখানে নিশ্চল।

আর একটি কারণে তারা স্বজাতির অবমাননাবোধ ক'রে উত্তেজিত হয়েছিলো : বাংলা উপন্যাসের সূচনাকালে হিন্দু সমাজে অনূঢ়ার প্রেম স্বীকৃত ছিলো না ব'লে ঔপন্যাসিকদের হয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অবিবাহিত নর-নারীর প্রেম অঙ্কন করতে হয়েছে, নয়তো হিন্দু নায়কের বিপরীতে মুসলমান নায়িকা কল্পিত হয়েছে, তাদের উপন্যাসে।[১] এ প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রধান নায়িকাদ্বয়ের কথা স্মর্তব্য। আর পূর্বোল্লিখিত জাতীয়তাবাদ প্রকাশের মানসে তাদের উপন্যাসে অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছিলো হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-চিত্র একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভূদেব-বঙ্কিম-রমেশের আদর্শ অনুসরণে অনেক যশঃপ্রার্থী ঔপন্যাসিক তাদের উপন্যাসে এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।[২]

২

হিন্দু ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে উপস্থাপিত এইসব প্রসঙ্গ ও চিত্র মুসলমান লেখকগণকে উত্তেজিত করে তোলে। তবে তাদের ক্রোধ সর্বাপেক্ষা বেশি লক্ষ্য করা গেলো বঙ্কিমচন্দ্রের উপর। তার একটি কারণ সম্ভবত এই, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এ রোশিনারা শিবাজীর প্রেমের প্রসঙ্গ থাকলেও, বঙ্কিমের প্রতিভা নিঃসন্দেহে ভূদেব অপেক্ষা অনেক বড়ো। সে কারণে তার আয়েষা-জগৎসিংহের প্রণয়-সম্বলিত 'দুর্গেশনন্দিনী' 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু মুসলমান লেখকগণের বঙ্কিমচন্দ্রের উপর রুষ্ট হবার যে-টি প্রধান কারণ ব'লে অনুমিত হয় তা হ'লো তার ইতিহাসাশ্রিত

১ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য,' পৃ. ৪০৭।

২ যে সমস্ত ঔপন্যাসিক তাঁদের উপন্যাসে জাতীয়তাবাদ প্রকাশের নামে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-চিত্র অঙ্কন করেছিলেন এবং মুসলমান রাজশক্তিকে উৎখাত করে হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : স্বর্ণকুমারী দেবী, 'দীপ-নির্বাণ' (১৮৭৬); উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, 'পৃথ্বীরাজ (বা ক্ষত্রকুল-ভাগ্য-শশী রাহুর গরাসে)' (১৮৮০); দামোদর মুখোপাধ্যায়, 'প্রতাপসিংহ' (১৮৮৪); হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'কমলাদেবী' (১৮৮৬); হারান চন্দ্র রক্ষিত, 'বঙ্গের শেষবীর' (১৮৯৭); যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, 'সুন্দরী' (১৯০১) প্রভৃতি।

www.pathagar.com

উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রায় সব ক'টিই মুসলমান শাসনের পটভূমিতে বিন্যস্ত। আর তা-তে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের চিত্রই প্রধান প্রতিপাদ্য।

মুসলমান রমণী আয়েষার প্রকাশ্যে হিন্দু জগৎসিংহকে 'প্রাণেশ্বর' ব'লে ঘোষণা, জগৎসিংহ-ওসমানের দ্বৈরথে ওসমানের অসহায় পরাভব, কতলু খাঁর লাম্পট্য এবং হিন্দুনারী বিমলা কর্তৃক ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ ইত্যাদি কল্পিত ঘটনার মধ্যে তারা বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম-বিদ্বেষ সহজেই খুঁজে পেলেন।

সতের জন মুসলমান সেনা বঙ্গদেশ জয় করেছিলো বাহু-বলে নয়—হীন ষড়-যন্ত্রের মাধ্যমে, বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি বীর নয় প্রবঞ্চক। মীর কাসিমের মতো স্বদেশ-প্রেমিক নবাব রমণী প্রেমে দুর্বল, তকি খাঁর ন্যায় ইতিহাস-খ্যাত বীর বিশ্বাসঘাতকই শুধু নয়, নারীর সতীত্বনাশে উদ্যত।

তবে 'রাজসিংহ' এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেই বোধ হয় মুসলমান সম্প্রদায়কে সর্বাপেক্ষা বেশি আঘাত করেছিলো। তারা দেখলেন ঔরঙ্গজেব কেবল ভণ্ড-হিন্দু-দ্বেষী—চুক্তি ভঙ্গকারীই নয়, পর্বত রন্ধ্রপথে সসৈন্য আবদ্ধ, একখণ্ড রুটির ভিখারী ঔরঙ্গজেব শেষে 'বেত্রাহত কুকুরের মত বদনে লাঙ্গুল নিহিত করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন' করে। তাছাড়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব নির্মল কুমারীর মতো একজন অতি সাধারণ হিন্দু যুবতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। জেবউন্নিসার মতো বিদুষী বাদশাহজাদী স্বেচ্ছাচারিণী তো বটেই, এমন কি তার কাম-প্রবণতা এতোদূর বিস্তৃত যে, তা পিসীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে পর্যন্ত পৌঁছোয়।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম' গীতটি নিয়ে তাদের সবচেয়ে আপত্তি, তদুপরি রেজা খাঁকে দুর্ভিক্ষের জন্যে অন্যতম প্রধান দায়ী ব্যক্তি ব'লে প্রতিপন্ন করাটাও তারা নিশ্চয় ভালো চোখে দেখেন নি। আর সাধারণ নিরীহ মুসলমানদের উপর সন্তান সেনাদের বিচ্ছিন্ন পীড়ন এবং অনুচিত কটূক্তি ও কটাক্ষ প্রয়োগ মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে।[১] তারা পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থে তাদের প্রবল প্রতিবাদ প্রকাশ করতে শুরু করেন।

---

১ এই ক্ষোভ এতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যে, তাঁরা মহাসমারোহে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের বহ্নুৎসব পালন করেন। রেজাউল করীমের অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে বৃটিশ সরকারের হাত ছিলো। তাঁরা অনেকদিন থেকেই এই গ্রন্থটির প্রতি বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু 'একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত গ্রন্থকে সরাসরি বাজেয়াপ্ত' করতে পারছিলেন না। অথচ 'আনন্দ-মঠ' তৎকালীন মুক্তি-আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রেরণার উৎস হয়ে উঠছিলো। মুসলমানগণ যাতে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে না পারে—ইংরেজ সরকার পরোক্ষভাবে তারই ব্যবস্থা করেছিলেন এই বহ্নুৎসবের মাধ্যমে। দ্রষ্টব্য, রেজাউল করীম, "আনন্দমঠের" বহ্নি-উৎসব," 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ,' কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ [১৯৪৪], পৃ. ৮৪।

www.pathagar.com

৩

আমাদের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সেখ আবদোস সোবহান বঙ্কিম-উপন্যাসে চিত্রিত মুসলমান চরিত্রের বিকৃতিতে প্রথম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি 'হিন্দু-মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় 'লিখকগণ'কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বলেন...ইহারা না লিখিতে পারেন, এরূপ মিথ্যা ঘটনার সৃষ্টিই হয় নাই, ইহাদের কল্পনা সাগরে যাহা উপস্থিত হয়, প্রকৃতি তাহার কিছুই সৃষ্টি করেন নাই।' এই শ্রেণীর 'লিখক'দের অলীক কল্পনার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন,'—যে মোসলমান মহিলাদের দর্শনলাভ চন্দ্র সূর্য্যের ভাগ্যেও প্রায় ঘটিয়া উঠে না, সেই মোসলমান রাজকন্যা—মোসলমান রাজ অন্তঃপুরবাসিনী আয়েষা। সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষ জগৎসিংহ—দাসত্ব, ধূর্ত্তামী, পলায়ন, যাহাদের ব্যবসা,—জাতীয় গৌরব,—কবির কল্পনায় আয়েষা এই জগৎসিংহের উপর [প্রতি] আসক্ত হইয়া, কত কাণ্ডই না করিয়া ফেলিলেন। যবনের কন্যা বলিয়া, ধার্মিক (?) বীরহৃদয় (?) জগৎসিংহ আয়েষার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, অথচ কৌশলে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করিয়া লইলেন। এই কবিবাবু স্যার ওয়ালটার স্কটের ছায়া অবলম্বন করিয়া "কবি" হইয়াছেন।'[১] গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় বঙ্কিম-উপন্যাসে মুসলিম-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লেখা-লেখির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রতিরোধ করার উদ্দেশে একটি সাংগঠনিক প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে 'মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র কলিকাতা অধিবেশনে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর উদ্যোগে সামগ্রিকভাবে "বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষ"-এর বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে প্রস্তাবটির ইংরেজি অনুবাদ "Vernacular Education in Bengal" নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ-খানি 'বহু হিন্দু সম্পাদকের নিকট' প্রেরিত হ'লেও 'তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করেন নাই' বলে আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়।[২]

ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রথমত 'উপন্যাসের ঘোর বিরোধী' ছিলেন,[৩] তদুপরি হিন্দু ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে মুসলিম-প্রসঙ্গ তাঁকে ক্ষুব্ধ করে। তিনি বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'হিন্দু নায়কের জন্য অসূর্যম্পশ্যা মুসলমান

১ উদ্ধৃত, কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,' পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১৮৭।

২ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, "মুসলমান ও হিন্দু লেখক," 'ইসলাম-প্রচারক,' অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০। উদ্ধৃত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত,' পৃ. ৪০৫-৪০৬।

৩ দ্রষ্টব্য, 'উপক্রমনিকা,' "রায়নন্দিনী", "সিরাজী রচনাবলী" উপন্যাস খণ্ড, ঢাকা ১৯৬৭, পৃ. ৫।

www.pathagar.com

বাদশাহজাদিগণকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া বাহির কর—হতভাগ্য মুসলমানদিগকে তীব্র বিদ্রূপবাণে মর্ম্মাহত কর...খুব মজাদার একখানা উপন্যাস হইয়া গেল।...হিন্দু মুসলমান হিংসানল প্রজ্জ্বলিত হউক, তাহাতে তোমার কি? তুমি ত রায় বাহাদুর বঙ্কিম।'[১]

জনৈক অজ্ঞাতনামা সমালোচকের স্থির ধারণা 'বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা'। অতএব এ-ভাষা ও সাহিত্যে তারা যে অগ্রণী হবেন তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে দুঃখের বিষয় 'সাহিত্য-রক্ষী বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য পুটিরাম পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজের অযথা নিন্দাবাদ' করে জগতের সামনে তাদেরকে 'চির-কলঙ্কিত' করে রাখার প্রয়াসী।[২] তিনি আরো বলেন, 'হিন্দুগণ সাহিত্যরাজ্যে যে আমাদিগকে নানা প্রকারে অন্যায়রূপে লাঞ্ছিত করেন, তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিবার জন্য বহুদূর যাইতে হয় না।'[৩] সত্যিই অন্য একজন সমালোচককে বেশি দূর যেতে হলো না, তিনি 'দুর্গেশনন্দিনীর লেখক আয়শার [আয়েষা] প্রতি' যে 'অতি নির্দয় ব্যবহার করিয়াছেন' তার বিবরণ দিলেন। সমালোচক বিস্ময়-মিশ্রিত চোখে দেখলেন 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা, কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর 'রোশিনারা'র (১৮৬৯) রোশিনারা এবং রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭)-এর জেলেখা—'এই তিন জনই হিন্দু প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী'। তার বিবেচনায় এই সমস্ত ঔপন্যাসিক 'ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষবৃক্ষ রোপণ' করেছেন। তিনি সক্ষোভে জানতে চাইলেন '...এমন উদ্যানপাল কোথায়, যাহার বলিষ্ঠ বাহু এই বিষবৃক্ষ সকলকে বাঙ্গালা সাহিত্যোদ্যান হইতে সমূলে উৎপাটন করিতে ক্ষমতাবান।'[৪]

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কণ্ঠ এই ব্যাপারে অতিশয় তপ্ত। তার অভিযোগ 'ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র...হইতে আরম্ভ করিয়া...টুনীরাম, পুটিরাম, পাচুরাম পর্য্যন্ত সকলেই' মুসলমান জাতিকে কুৎসিৎ গালাগালি দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, দিল্লীর বাদশাহগণকে 'মর্ম্মরখচিত শান্ত সমাহিত গৌর হইতে উঠাইয়া উপন্যাস এবং কাব্যের পৃষ্ঠায়...অত্যাচারী...পিশাচ এবং ঘৃণিত কাম কুক্কুররূপে চিত্রিত

১ সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন [সিরাজী], "সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন," 'নবনূর,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০, পৃ. ৬১।

২ কেনচিৎ মর্ম্মাহতেন হিতকামিনা, "মুসলমানের প্রতি হিন্দু-লেখকের অত্যাচার," ঐ, ভাদ্র, ১৩১০, পৃ. ১৬৮।

৩ ঐ, পৃ. ১৭০।

৪ শ্রীতঃ, "হিন্দু সাহিত্য", 'ইসলাম-প্রচারক', আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩১০। উদ্ধৃত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত,' পৃ. ৩৫৫।

www.pathagar.com

করিয়া' পরম আনন্দ উপভোগ করছেন। আবার তারা 'অসূর্যম্পশ্যা বাদশাজাদী-গণকেও...শূকরভোজী রাজপুতের প্রেমাভিলাষিণী'রূপে অঙ্কিত ক'রে সুখ অনুভব করছেন। তার মতে '...প্রত্যেক হিন্দু লেখকই এক একটি মুসলমান শত্রু দ্বিতীয় বঙ্কিম...।' তিনি আশা করেছিলেন 'কালে হিন্দুর এ মন্দ স্বভাব শোধরাইয়া যাইবে। ...কিন্তু হায়!...'[১]

'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলীর আক্ষেপ এই যে, যদিও 'বঙ্কিমবাবু সর্ব্বপ্রথম মুসলমান সমাজের দেহে অস্ত্রাঘাত করেন,' তাকে তবু 'কতকটা ক্ষমা করা যায়', কারণ এখন তিনি মৃত, অতএব, 'নিন্দা-প্রশংসার বাহিরে'। কিন্তু এখন যারা এই পথে চলছেন তাদের বিরুদ্ধে 'কি ব্যবস্থা করা কর্তব্য? বাঙ্গালার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথও এ ক্ষেত্রে বাদ পড়েন না'।[২]

ডাক্তার হবিবর রহমান 'দুর্গেশনন্দিনী'তে স্কটের 'আইভানহো'র অনুকরণ লক্ষ্য করেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা অস্বীকার করলেও[৩] তিনি এ-বিষয়ে নিশ্চিত।[৪] ওসমান ও জগৎসিংহের তুলনামূলক একটি ক্রম প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওসমানকে রাজসিংহের তুলনায় হীন বর্ণে অঙ্কিত করেছেন। তার ভাষায় বীরত্ব, যোগ্য সৈন্যাপত্য, 'পতিত শত্রুর সেবায়' 'পরুষতা [পুরুষতা] ও কমনীয়তা'য় 'ওসমান কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি!'[৫] আয়েষা যখন জগৎসিংহকে 'অতিমাত্র নির্লজ্জার ন্যায়' ওসমানের সামনে প্রণয় ঘোষণা করলো, তখন ওসমান 'গাম্ভীর্য্যের সহিত' আয়েষাকে তিরস্কার করে চলে গেলো। 'বঙ্কিম-বাবু এই পর্য্যন্ত পাঠানবীর ওসমান খাঁর চরিত্র অতি নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন।'[৬] এরপর দ্বৈরথের ঘটনা উল্লেখ ক'রে সমালোচক বলেন, পরবর্তী ঘটনা

---

১ সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী, "মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক", 'ইসলাম-প্রচারক', অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০। উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ৩৫৫-৫৬।

২ "মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান," 'নবনূর', পৌষ, ১৩১০, পৃ. ৩৫০।

৩ বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক ব্যক্তিকে জানিয়েছেন 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখার আগে তিনি 'আইভানহো' পড়েন নি। দ্রষ্টব্য, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, "বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ", 'সাধনা,' শ্রাবণ, ১৩০১, পৃ. ২৪৯; চন্দ্রনাথ বসু, "বন্ধু বৎসল বঙ্কিমচন্দ্র," 'প্রদীপ,' আষাঢ় ১৩০৫, পৃ. ২১৫; কালীনাথ দত্ত, "বঙ্কিমচন্দ্র" ঐ, আষাঢ়, ১৩০৬, পৃ. ২১৯; হেমেন্দ্র কুমার রায়, "বঙ্কিম বাবুর কথা (২)," 'ভারতী,' ১৩১৮, পৃ. ৬৬৬ ও অন্যান্য।

৪ "ওসমান ও জগৎসিংহ," 'নবনূর,' বৈশাখ, ১৩১২, পৃ. ২২।

৫ ঐ, পৃ. ২৩-২৪।

৬ ঐ, পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

প্রবাহ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা-তে 'জগৎসিংহকে বড় করিবার জন্যই যে বঙ্কিমবাব ওসমানকে খাটো করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা কে না বলিবে?...ওসমান জগৎ-সিংহ হইতে কোন অংশে হীন ছিলেন না।'[১] পরের কিস্তিতে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি কতলু খাঁর লাম্পট্যকে অনৈতিহাসিক ব'লে চিহ্নিত ক'রে বীরেন্দ্রসিংহকে লাম্পট্যের 'চূড়ামণিরূপে' প্রমাণ করেছেন।

জগৎসিংহ সম্পর্কে তার অভিমত তিনি '...বীর হইয়াও কার্য্যক্ষেত্রে বীরের শৌর্য্য ও সাহস প্রেমের নিকট বলি দিতে কণ্ঠিত হন নাই।...চোরের ন্যায় দুর্গ-স্বামীর অজ্ঞাতসারে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াও কার্য্যকালে তিনি অন্ধ প্রেমিকের মতই ব্যবহার করিলেন—...।'[২]

শেষে ওসমানের নানা গুণের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দেবার পর সমালোচক মন্তব্য করেন, 'কি বীরোচিত আকৃতিতে..কি যুবরাজোচিত সৌন্দর্য্যে ও শৌর্য্যে...ওসমান খাঁ কোন অংশেই হীন ছিলেন না।'[৩]

সমালোচক একিন উদ্দীন আহমদ 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত ধর্ম্মানন্দ মহা-ভারতীর "গুরু গোরক্ষনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদে বললেন,'...ভূদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া চুণোপুটী..মুসলমানকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর..'। তার মতে এর ফল অবশ্য ভালো হয়নি '..তাহাদের স্বদেশ প্রেমের গদ্য পদ্য সমস্তই' মাটী হইবার উপক্রম হইয়াছে।'[৪] ইমদাদুল হকের ধারণাও অনুরূপ, কারণ গল্প ও নাটক প্রভৃতিতে মুসলমানের যে 'হীন চরিত্র' নির্মিত হয়ে থাকে তার 'উদ্দেশ্য যে মুসলমানকে গালি দেওয়া' তা সহজেই অনুমেয়।[৫] 'বঙ্কিমের অনেক শিষ্য মুসলমানকে..গালাগালি করিয়া আসিতেছেন।' এবং এজাতীয় সাহিত্য যে হিন্দু পাঠককে গভীর আনন্দ দিচ্ছে তা অনুধাবন করে অন্য একজন সমালোচক 'কিছু ভীত এবং চিন্তিত' না হয়ে পারেননি।[৬]

---

১ "ওসমান ও জগৎসিংহ" 'নবনূর', বৈশাখ, ১৩১২, পৃ. ২৭।

২ "ওসমান ও জগৎসিংহ (শেষার্দ্ধ)," 'নবনূর,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, পৃ. ৮৮। [এই সংখ্যায় সমা-লোচকের নাম মুদ্রিত হয়েছে 'স্বর্গীয় ডাক্তার মোহাম্মদ হবিবর রহমান।']

৩ ঐ, পৃ. ৯৩।

৪ "নব্য ভারতে মুসলমান চিত্র," 'ইসলাম-প্রচারক,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, পৃ. ১৬।

৫ "গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য," 'নবনূর' আশ্বিন, ১৩১২, পৃ. ২৬৭।

৬ তসলিমুদ্দীন আহমদ বি-এল, "বাদশাহ্ আকবর এবং রাণা প্রতাপ," 'বাসনা', ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১৬। উদ্ধৃত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত', পৃ. ৪০৬।

www.pathagar.com

বঙ্কিম উপন্যাসে চিত্রিত মুসলিম নারী চরিত্রের বিবৃতিতে যাঁরা অতি মাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, সমালোচক আবদুল মালেক চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম। মুসলমান রমণীদের চরিত্র-অঙ্কনে হিন্দু ঔপন্যাসিকগণের 'সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতা'য় সমালোচক 'লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মাণ' হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রথমে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবুর কথাই ধরা যাক্।...তাহার আয়েশা [আয়েষা], তাহার দলনী বেগম, তাহার রোশেনারা, জাহানারা, সর্ব্বোপরি তাহার জেবুন্নিসা;..তাহার..উদ্ভট কল্পনা বিজৃম্ভিত প্রত্যেক মুসলমান রমণীই' বাঙ্গালার আবহাওয়ার গুণে..কিম্ভূতকিমাকার [রূপ] ধারণ করিয়াছে..।'[১] 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বর্ণিত জেবউন্নিসার কামপরায়ণ, বিশেষতঃ 'পিসী ভাইঝী উভয়ে অনেক স্থলেই, মদন-মন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন' বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'কি ঘৃণার কথা। কি লজ্জার কথা। একমাত্র বাঙ্গালীর কলম লেখনীতেই [জেবউন্নিসা] এই প্রকার বীভৎস পশুভাবনিচয়ের পরিস্ফুটন সম্ভবপর।'[২] দলনী বেগমের পাতিব্রত্য নিঃসন্দেহে প্রশংসাই, কিন্তু তার 'বিষপানে আত্মহত্যা অনৈতিহাসিক, অধর্ম্মীয়। মুসলমান শাস্ত্রে আত্মহত্যা মহাপাপ।'[৩] আয়েষা চরিত্র সম্পর্কে তার অভিমত, "Love knows no bounds and love obeyes no law," এই শ্রুতিসুখকর অথচ বিপ্লববাদী মতবাদ' তিনি প্রচারের বিরোধী।[৪] 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তারতম্য নির্দ্দেশ করাই' যে 'রাজসিংহ' এর মতো 'একদেশদর্শিতামূলক উপন্যাস প্রকাশের উদ্দেশ্য'—এই অন্তর্নিহিত সত্য তিনি 'রাজসিংহ' উপন্যাসের 'উপসংহার'-এ খুজে পেয়েছেন।[৫] উক্ত উপন্যাসে চঞ্চল-কুমারী কর্তৃক ঔরঙ্গজেবের চিত্র দলন, ঔরঙ্গজেবকে 'বেত্রাহত কুক্কুর'-এর সঙ্গে তুলনা, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মুসলমান খানসামাদেরকে পৃথিবীর 'সর্ব্বনিকৃষ্ট' জীব ব'লে অভিহিত করা প্রভৃতি দৃষ্টান্তের উল্লেখ ক'রে সমালোচক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, উক্ত 'গুটি কয়েক উদাহরণ হইতেই উপলব্ধি [উপলব্ধ] হইবে যে, বঙ্কিমবাবুর মুসলমান-বিদ্বেষ কিরূপ ছিল। বঙ্কিমবাবুর মুসলমান চিত্র একটীতেও বস্তুতন্ত্রতা বা বাস্তবতা নাই।'[৬]

---

১ "বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান," 'আল্‌এস্‌লাম,' বৈশাখ, ১৩২২, পৃ. ৪৬।
২ ঐ, পৃ. ৪৮।
৩ ঐ, পৃ. ৪৯।
৪ ঐ, পৃ. ৫০।
৫ ঐ, পৃ. ৫১।
৬ ঐ, পৃ. ৫২।

www.pathagar.com

ইসমাইল হোসেন সিরাজী উদ্বিগ্ন এ-কারণে যে, 'হিন্দু সাহিত্য আমাদের শিক্ষিত যুবকদের মনেও আত্মসম্মানের ভাব' এমনভাবে কমিয়ে দিয়েছে যে হিন্দুদের রচিত সাহিত্যে আমাদের 'প্রাতঃস্মরণীয় বীর পুরুষদিগের, বাদশাহ..বেগম..শাহজাদীদিগের কল্পিত ও অতি জঘন্য' রূপায়ণ দেখে তাদের 'ধমনী পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয় না।'[১]

মোহাম্মদ কে, চাঁদ বিস্মিত এই ভেবে যে, হিন্দু সাহিত্যিকগণ অদ্যাবধি মুসলমানের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকলেন না। 'বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী সকল লেখকই এরূপ লিখিয়াছেন' তাতে তিনি দুঃখিত নন। কিন্তু সাম্প্রতিক মিলনের প্রচেষ্টার-লগ্নেও যদি এগুলির অবসান না হয় তা'হলে 'মিলন সুদূরপরাহত'। যদি কোনো মুসলমান লেখক হিন্দুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে থাকেন, তাহ'লে, তাঁর বিশ্বাস 'ওরূপ লিখিতে তাঁহারা শিখিয়াছেন হিন্দুদের নিকট'।[২]

এস, এম, আকবর উদ্দীন 'আল্-এস্লাম' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় বঙ্কিম-উপন্যাসে মুসলিম-প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। প্রবন্ধের 'বঙ্কিমে মুসলমান' শিরোনামায় বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গালী সাহিত্যের "তাজ" বিশেষণে ভূষিত করেও গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কেননা তার মতো 'জ্ঞানী ও মনীষী জাতি বিরোধের হাত' থেকে মুক্ত নয়।[৩] 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম' গীত সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশী হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র সেই গীত থেকে মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে 'প্রমাণ করিয়াছেন যে তিনি আমাদের এত হেয় মনে করেন যে ...নব জাতি গঠনে [মুসলমানকে] হিন্দুদের পদানত থাকিতে হইবে।'[৪] অতঃপর 'আনন্দমঠ'-এ কথিত 'যবনপুরী', 'শুয়ারের খোয়াড়' ইতাদি মন্তব্যের উল্লেখ ক'রে বলেন, 'এই স্থানে তিনি যে জাতীয় বিদ্বেষ ও জাতিবিরোধের পরিচয় দিয়া গেলেন, তাহা আমরা কোন মতে ক্ষমা করিতে পারি না।...আমাদের বিশ্বাস তিনি বিদ্বেষ বশে অথবা আমাদিগকে হেয় করিবার জন্যই এই কথা লিখিয়াছেন।'[৫]

'সীতারাম' শিরোনামায় 'সীতারাম' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে ফকীরের শরীরে গঙ্গারামের পদ-স্পর্শের ঘটনা এবং তার পরিণতি বিশ্লেষণ ক'রে সমালোচক বলেন, 'আসল কথা জোর করিয়া এমন একটা কিছু সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে

১ "সাহিত্য ও জাতীয় জীবন," ঐ, আষাঢ়, ১৩২৩, পৃ. ১৩৪।
২ "বঙ্গভাষা ও মুসলমান," 'আল্-এস্লাম,' ফাল্গুণ-চৈত্র, ১৩২৩, পৃ. ৬৪০-৪১।
৩ "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান," ঐ, পৃ. ৬৯০।
৪ ঐ, পৃ. ৬৯১।
৫ ঐ, পৃ. ৬৯২।

www.pathagar.com

বেশ প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দু মুসলমানের বিবাদের কারণ মুসলমান এবং সেই বিবাদে মুসলমানেরই অন্যায় ও সে নিকৃষ্ট।'[১] মুর্শিদ কুলি খাঁর অত্যাচারের বর্ণনাকে তিনি ঔপন্যাসিকের কল্পিত এবং ইতিহাস-বিরুদ্ধ ব'লে মত প্রকাশ করেন।[২]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রসঙ্গে পূর্বগামী মুসলমান সমালোচকদের মতোই তিনি বলেন, '...নায়ক হিন্দু ও সেই হিন্দুর প্রেমে মাতোয়ারা এক মুসলমান নারী।..ইহা আমাদের নিকট বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। তবু বঙ্কিম দুইজনের বিবাহ দেন নাই—ইহা তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ বলিতে হইবে।' তিনি প্রশ্ন করেন, আয়েষা যদি জগৎসিংহকে ভালোবাসতে পারে, তবে তিলোত্তমা কি আমাকে ভালোবাসতে পারে না?[৩] অনেকে আয়েষাকে যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' ব'লে সম্মানিত করেন, তিনি তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, 'আয়েষার "Love at first sight" ...কোন মতেই প্রশংসনীয় বা commendable নহে'। কারণ জগৎসিংহের তুলনায় ওসমান শ্রেষ্ঠ।[৪] তদুপরি, জগৎসিংহ-আয়েষার সাক্ষাৎকে তিনি 'ঠিক যুক্তিসঙ্গত ও Logical, ব'লে বিবেচনা করেন নি।[৫]

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের 'সাহিত্যগুরুর বাঙ্গালী-প্রীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী যাঁরা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পাঠ করেছেন, তাঁরা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালী-প্রীতি আসল নহে, নিতান্তই মেকী'। তাঁর দেশ-প্রেম একটি 'অশ্বডিম্বের' ন্যায়,—তাহার কোন অস্তিত্ব নাই!'[৬] তিনি যদি যথার্থ দেশ-প্রেমিক হতেন তাহ'লে মীর কাসিমকে 'গৌরবমন্ডিত' না করে 'নির্মমভাবে বিকৃত' করতেন না; অথবা 'মীর কাসিমের সেনাপতি বীর চূড়ামণি তকি খাঁর চরিত্র...বিকৃতভাবে' অঙ্কন করার প্রয়াসী হতেন না।[৭] তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস এই বিকৃতকরণ 'কেবল মুসলমানকে বিদ্বেষ করিবার জন্য'।[৮]

---

১ "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান," ঐ, পৃ. ৬৯০, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, পৃ. ৯৮।

২ ঐ, পৃ. ১০০।

৩ ঐ, পৃ. ১০১।

৪ ঐ, পৃ. ১০২।

৫ ঐ, পৃ. ১০৩।

৬ 'আল্-এস্‌লাম' জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, পৃ. ১১৩।

৭ ঐ, পৃ. ১১৫।

৮ ঐ, পৃ. ১১৫-১৬। এই চরম বঙ্কিম-সমালোচনার মধ্যেও সৈয়দ এমদাদ আলী বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট বাংলা ভাষার প্রশংসা করে বলেন, সেই ভাষাই 'আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। উহা বুঝিতে কাহাকেই বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়না'। দ্রষ্টব্য, "বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান সমাজ," 'বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা,' শ্রাবণ, ১৩২৫' পৃ. ৮৫। পরে 'ব-মু-সা-প' ব'লে উল্লিখিত।

www.pathagar.com

পরে তার বক্তব্যকে আরো পরিষ্কার করে বলেন, 'আসল কথা, মুছলেম বিদ্বেষ বঙ্কিমবাবুর হাড়ে হাড়ে বিজড়িত'। তিনি জোর দিয়ে প্রমাণ করতে চান যারা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মুসলমান বিদ্বেষ খুঁজিয়া পান না' তাঁরা হয় বঙ্কিম-রচনাবলী যথার্থভাবে পড়েন নি, অথবা তা তাঁদের 'সম্পূর্ণ ন্যাকামী'। বঙ্কিমচন্দ্র 'মুসলমানদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের বিদ্বেষ স্বীয় গ্রন্থাবলীতে কোথাও চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। মুসলমান বিদ্বেষ দ্বারাই তিনি তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি জমাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।...বাঙ্গালী মুসলমানকে তিনি সুচক্ষে দেখেন নাই, এই জন্য বাঙ্গালী মুসলমানও তাঁহাকে সুচক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালী মুসলমানকে তিনি শত্রু ভাবিয়াছেন, এই জন্য বাঙ্গালী মুসলমানও তাহাকে স্বার্থপর, দেশদ্রোহী মনে করেন'।[১]

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরাজমান শত্রুতায় উদ্বিগ্ন জনৈক আহমদ মিঞা 'মিলনের উপায়' খুঁজতে গিয়ে উপলব্ধি করেন, 'এই বঙ্গদেশে যদি বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্র ও হরিসাধন প্রভৃতির মুসলমানের কুৎসা কাহিনীতে পরিপূর্ণ নাটক' ইত্যাদি প্রচারিত না হতো তাহ'লে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান 'এত বিচ্ছেদ-ব্যবধানে' পতিত হতো না।[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রতিভায় বাঙ্গলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত' হয়েছে, এই সত্য অপর একজন মুসলমান সমালোচক স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নন, কিন্তু তাঁর দুঃখ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের 'পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে উৎকট জাতিবিদ্বেষ' পরিস্ফুট হবার ফলে তিনি চিরদিনের জন্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের 'ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি' থেকে বঞ্চিত থাকবেন।[৩]

পূর্বোক্ত সমালোচকের মতো সফিয়া খাতুন বি, এ, বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যিক হিসেবে 'অদ্বিতীয়' ব'লে মেনে নিয়েও বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'তাহার হৃদয়েও সঙ্কীর্ণতা ছিল।' কারণ, তার উপন্যাসে 'মুসলমান যুবতী হিন্দু যুবকের জন্য পাগল হইয়া যায় এবং হিন্দু যুবক সেই পাগলিনীর প্রেমকে শিবের ন্যায় অচল অটল থাকিয়া প্রত্যাখ্যান করে ইহা তাহার [বঙ্কিমচন্দ্রের] যেন মজ্জাগত বিশ্বাস ছিল।' অন্যান্য মুসলমান সমালোচকের মতো সফিয়া খাতুনও প্রত্যক্ষ করেছেন, 'এসব সাহিত্যে আর কিছু হউক আর না হউক হিন্দু [হিন্দু] মুসলমানে বেশ বিরোধ বাধান যায়।'[৪]

---

১ 'আল্-এস্‌লাম,' অগ্রহায়ণ, ১৩২৫, পৃ. ৪২০-২১।

২ "মিলনের উপায়," 'ব-মু-সা-প,' শ্রাবণ, ১৩২৬, পৃ. ১১৪।

৩ মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, "বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান," 'ইসলাম-দর্শন', ফাল্গুন, ১৩২৭, প. ৪৮৭।

৪ "বাংলা সাহিত্যে অনুদারতা," 'ব-মু-সা-প,' মাঘ, ১৩২৯, পৃ. ২৭৯।

www.pathagar.com

বঙ্কিমচন্দ্র তার 'আনন্দমঠ' এবং অন্যান্য মুসলমান-বিদ্বেষী হিন্দু সাহিত্যিক তাদের সাহিত্যে যে-বিদ্বেষ-বিষ সঞ্চার করে গেছেন তা হিন্দু সমাজের গভীরে প্রবেশ ক'রে 'হিন্দু সাহিত্যে মোছলেম হিংসার বান' ডেকেছে—এই বিশ্বাস সিরাজীর দৃঢ়মূল।[১]

এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়, বঙ্কিম উপন্যাসে বিধৃত মুসলিম-প্রসঙ্গ নিয়ে মুসলমান সমাজের যখন ক্ষোভের সূচনা, তখনই একজন হিন্দু সমালোচক নির্মলচন্দ্র ঘোষের মনকেও বিষয়টি বিশেষভাবে নাড়া দেয়। তাঁর মতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বীজ বপন করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি স্পষ্টই বলেন, বঙ্কিম বাবু যদি মোসলমানদের কলঙ্ক অঙ্কনে মনোযোগী' না হয়ে তাঁদেরকে 'প্রেমপাশে' বাঁধতে সচেষ্ট হতেন, তাহ'লে মুসলমান সমাজ তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হ'তো না। এর ফল হয়েছে এই, হিন্দু লেখকের অঙ্কিত মুসলমানদের কলঙ্ক হিন্দু সম্প্রদায় বিশ্বাস ক'রে তাদেরকে ঘৃণা করতে শেখে; অপরপক্ষে 'মোসলমানগণ হিন্দুর শিক্ষিত শ্রেণীর মুখে কটুক্তি শুনিয়া সমগ্র হিন্দুর প্রতি বিষ নয়নে ভ্রূকুটি করে'।[২]

নির্ম্মল চন্দ্র ঘোষ 'নবনূর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি হিন্দু-রীতি সাহিত্যে মুসলিম-প্রসঙ্গ নিয়ে পরে অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতির জন্যে হিন্দু সাহিত্যিকদের, বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রকে কঠোরভাবে দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'এখন.... উচচনাদে মুসলমানকে গালী দিবার যুগ আসিয়াছে।'[৩] এরপর তিনি হিন্দু সাহিত্যিকদের রচিত মুসলিম বিদ্বেষমূলক কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করে বলেন, এগুলোর কোনো মূল্য থাক বা না থাক 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক অসত্য কথায় তাহাদের প্রতি পৃষ্ঠা কলঙ্কিত। তাই হিন্দুর মনে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।'[৪]

সাহিত্য-ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের বীজ বপন করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর ভাষায়, 'সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য ক্ষেত্রে মধু ধারার সহিত

---

১ "ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা ও মোছলমানের কর্ত্তব্য," 'ছোলতান,' ভাদ্র, ১৩৩০, পৃ. ১১।

২ "ইতিহাসের শিরেঘাত," 'ইসলাম প্রচারক,' নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০১। উদ্ধৃত, কাজী আব্দুল মান্নান, 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পৃ. ২৫৬। উক্ত প্রবন্ধটি হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "ঐতিহাসিক চিত্রোদ্ধার" প্রবন্ধের প্রতিবাদ। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় জেবউন্নিসা ও শিবাজীর প্রেমের ঘটনা তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য, 'প্রদীপ', আশ্বিন, ১৩০৭, পৃ. ৩১৯-২৭।

৩ "গোটা দুই কথা," 'নবনূর,' মাঘ, ১৩১০, পৃ. ৩৬৬।

৪ ঐ, পৃ. ৩৬৭।

www.pathagar.com

এমন বিষধারা ঢালিয়া দিয়াছেন...,' এবং তাঁর 'বিষগ্রাহী' কতিপয় শিষ্য মুসলিম-বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে 'ইতিহাসের সোনার অঙ্গে পদাঘাত' করেছে। এই অন্যায় কাজ করার জন্যে 'গুরু ইহার এক পথও রাখিয়া গিয়াছেন। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সে পথের ডাকনাম। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর নামে হিন্দু সাহিত্যিকগণ 'মুসলমান-সমাজ ও তাহাদের পূর্ব্বগত নৃপতি সমাজকে বৃথা অভিযোগে আক্রমণ করিয়া স্বেচ্ছা-মত কটূক্তি করাই এ পথের উদ্দেশ্য।'[১]

তাঁর মতে এই সব হিন্দু লেখকের রচনার ফল এই হয়েছে, মুসলমানদের অপ-কীর্ত্তি, তাদের লাঞ্ছনা, কুরীতি 'অতি অযৌক্তিক ও অপ্রমাণিত' হলেও তার 'সত্যাসত্য বিচার রহিত হইয়া' হিন্দু সমাজ তা সাগ্রহে পাঠ করে এবং বন্ধুদের উপহার দেয়। তিনি প্রশ্ন করেন, এ-তে গোড়া 'হিন্দুগণের' আনন্দের উপকরণ জোটে, কিন্তু মুসলমান সমাজের 'হৃদয়ে যে কি বিষের ছুরি বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা কেহ ভাবেন কি?' তাছাড়া হিন্দুগণ মুসলমান সমাজের কুৎসিত চিত্র অঙ্কন করে 'অর্থোপার্জ্জন করতে পারে, আর মুসলমান তাহার প্রতিশোধ লইতে অর্থের অপব্যয় করিতে পারে না?'[২] তিনি অত্যন্ত সঙ্গত এবং নিরপেক্ষভাবে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন: মুসলমানগণ 'সঙ্কীর্ণহৃদয়' বা 'অশিক্ষিত' এ ধারণা ভ্রান্ত। মীর মোশাররফ হোসেন প্রমুখ কয়েকজন 'সুলেখকের গ্রন্থ এখন মুসলমানের ঘরে ঘরে বিরাজিত। অতএব তাঁরা যদি প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচনা করিতেন তবে কি হিন্দুর কলঙ্ক কাহিনী মুসলমানের মুখে মুখে বিচরণ করিত না? প্রতিপক্ষ প্রতিশোধ প্রদানে সক্ষম হইয়াও নির্ব্বাক রহিয়াছে, ইহা দেখিয়াও যদি আমরা হৃদয়ে হিংসার ভাব পোষণ করি, তবে তাহা হইতে নীচতর বিষয় আর কি হইতে পারে?'[৩] অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ইঙ্গিত করে তিনি প্রবন্ধ শেষ করেন: 'নিরপেক্ষ পাঠক! বুঝিলেন কি, কতিপয় হিন্দু লেখক কর্ত্তৃক সমাজ বিশেষের মনে কি বিষম বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া হিন্দু সমাজের আদম্য শত্রুর অভ্যুত্থানের পথ সহজ ও সরল করিয়া দিতেছে?'[৪]

---

১. "গোটা দুই কথা," 'নবনূর, মাঘ, ১৩১০, পৃ. ৩৬৬। পৃ. ৩৬৯।

২ ঐ, পৃ. ৩৭০।

৩ ঐ, পৃ. ৩৭০-৭১।

৪ ঐ, পৃ. ৩৭২। শরৎচন্দ্রও বলেছিলেন, 'বঙ্কিমবাবু অনেক জায়গায় অকারণ মুসলমানদের আক্রমণ করেছেন। তখন ওরা ছিল অত্যন্ত নির্জ্জীব। কিন্তু সমস্ত action-এরই reaction আছে।'—"মুসলমান সাহিত্য" 'শরৎ-সাহিত্যসংগ্রহ,' ৬ষ্ঠ সম্ভার, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ (এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড সংস্করণ), কলিকাতা [তারিখবিহীন], পৃ. ৩৬৪।

www.pathagar.com

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মুসলিম-প্রসঙ্গ এবং চরিত্রের বিকৃত-চিত্রন ছাড়া বঙ্কিম-চন্দ্র প্রমুখ হিন্দু সাহিত্যিকের ব্যবহৃত 'যবন' শব্দটি নিয়েও মুসলমানগণ অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিলো, শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা-ই হোক না কেন, হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমান সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই 'যবন' শব্দ ব্যবহার করছেন।

এই বিতর্কমূলক শব্দটির ব্যবহার শুধু মুসলমান নয়, শুরু থেকেই কোনো কোনো হিন্দু সমালোচকেরও বিরক্তির কারণ হয়েছিলো ব'লে প্রতীয়মান হয়। শ্রী মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা রচিত 'ভারত-বন্দিনী' (১২৮২) কাব্য আলোচনা-প্রসঙ্গে সমালোচক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'যবন ও ভারত আমাদের জ্বালাতন করিয়া তুলিল। আজি কালি যবন-বিদ্বেষ-বিধায়ক গ্রন্থ অধিক পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে। এ যবন কাহারা? এবম্বিধ গ্রন্থ সমস্ত পাঠ করিয়া বোধ হয়, মুসলমানগণই যবন শব্দের লক্ষ্য'।[১] তিনি প্রশ্ন করেন, 'এ অসময়ে' উনিশ শতকে 'যবন বিদ্বেষ সমুৎপাদনের চেষ্টা' কেন? যবনদের অত্যাচারের স্মৃতি এখন বিস্মৃত হওয়াই বিধেয়। কারণ অত্যাচারী ও আধিপত্য বিস্তারকারী যবন 'এক্ষণে....ভারত-ভূমি ত্যাগ করিয়াছে। এখন বিদ্বেষ জন্মাইয়া অনর্থক নিরীহ টিকে ওয়ালা, দরজি ও বাবরচিগণের সহিত বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন কি? আমরা বলি বঙ্গীয় নবীন কবিগণ 'যবন ভারত' ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে মস্তিষ্ক চালনা করুন'।[২]

জনৈক মুসলমান সমালোচক স্বসম্প্রদায়ের উপর কিঞ্চিৎ অভিমানবশতঃ বলেন, এহেন ঘৃণাব্যঞ্জক আখ্যালাভের জন্য হিন্দুর দোষ দিয়ে লাভ নেই, দোষ আমাদেরই। কারণ নিজেদের বল কার্যের উপর 'আমাদের আত্মনির্ভররতা' নেই বলেই আমরা 'দীনাতিদীন ও ঘৃণিত ''যবন'' (?) আখ্যা' পাচ্ছি।[৩]

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'যবন' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন।[৪] উক্ত প্রবন্ধের বক্তব্য ও যুক্তিতে আফতাবউদ্দীন

---

১ ''প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন,'' 'জ্ঞানাঙ্কুর,' জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৩, পৃ. ৩৩২।

২ ঐ, পৃ. ৩৩২—৩৩৩।

৩ শেখ ফজলল করিম, ''উন্নতির উপায় কি?,'' 'ইসলাম প্রচারক,' জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১০, পৃ. ২১৪—১৫।

৪ দ্রষ্টব্য, ''যবন,'' 'বঙ্গদর্শন,' ভাদ্র ১৩০৯, পৃ. ২৪৬-৫৪। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র বহু বৎসর আগে জনৈক হিন্দু সমালোচক 'যবন' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে বলেছিলেন, এখন পাঠান আরব বা তুর্কীদের 'যবন' বলা হয়ে থাকে। সাগর রাজার উপাখ্যানে ধর্মভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়দেরকে 'যবন' বলা হতো। কিন্তু অশোক রাজার রাজত্বকালে মুসলমান ধর্ম বিস্তৃত হবার পূর্বে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে বসবাসকারী গ্রীকদেরকেও 'যবন' বলা হতো। দ্রষ্টব্য, শ্রী নীলমণি বসাক, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস, (প্রথম ভাগ, হিন্দু সাম্রাজ্যকাল),' কলিকাতা, ১৮৫৮, পৃ. ৯৬।

www.pathagar.com

আহমদের 'সন্দেহ মিটে নাই'।[১] তাঁর বক্তব্য, যদি 'যবন' শব্দটি হিন্দুগণ ঘৃণা ও অবজ্ঞার অর্থে ব্যবহার না করেন, তবে 'ণনীচ যবনঃপর' একথা কেন? যবন =মুসলমান=যাহা হইতে নীচ জাতি আর নাই, ইহাই হিন্দুর ব্যাখ্যা।'[২]

'যবন' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং অর্থগত বিকৃতি নিয়ে এই বিতর্কের মধ্যে সমন্বয়-কামী মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা শব্দটির ব্যো'ৎপত্তিক জটিলতায় না গিয়ে সবিনয়ে মীমাংসার একটি প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, হিন্দুরা 'যবন' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ক'রে বলছেন এ-টি মোটেই 'দুষনীয় নহে'। মুসলমান এর 'বিপরীতার্থই সমর্থন' করছেন। তবে যে অর্থেই হোক 'যবন' শব্দটি যে 'বিকৃতার্থে মুসলমান ঘৃণা সূচিত করিয়া শতাধিক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।'[৩] তিনি হিন্দু লেখকদের উদ্দেশে বলেন, 'মুসলমান সম্পর্কে এই শব্দটির ব্যবহার ছাড়িয়া দিলেই যদি সমস্ত গোল মিটিয়া যায়, তবে শব্দটির পরিত্যাগ বিষয়ে এত রক্ষণশীলতা দেখানই বা আবশ্যক কি?'[৪]

ইমদাদুল হক প্রশ্ন করেন, মুসলমান সমাজকে 'যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি গালি দিয়া শোণিত উত্তপ্ত' করার প্রয়াস পাওয়া কি হিন্দু ভ্রাতৃগণের কর্ত্তব্য?'[৫]

আর একজন ক্ষুব্ধ সমালোচকের অভিযোগ হিন্দুরা মুসলমানদেরকে 'যবন' 'নেড়ে' ইত্যাদি 'বাক্যবাণবর্ষণে জর্জ্জরিত'ই শুধু করেন না, এমন কি সাধারণ আলাপ-আলোচনার সময়েও 'প্রায়ই চাচা, নেড়ে যবন, ব্যাটা...' ব'লে পরিহাস করে থাকেন।[৬]

গোলাম মোস্তফার কটাক্ষ, মুসলমানগণের সাহিত্য ক্ষেত্রে যে জাগরণ ঘটেছে, তার 'মূলে বঙ্কিম দ্বিজেন্দ্র ইত্যাদি উদার (?) ব্যক্তিবর্গের "যবন" "নেড়ে" রূপী তীব্র আহ্বানগুলিই বিরাজমান...।'[৭] আর মতিনউদ্দীন আহমদের দুঃখ এই যে, পূর্বে 'যবন' অর্থে বিদেশীদের বোঝাতো এবং তা-তে কোনো ঘৃণার ইঙ্গিত ছিলো না। কিন্তু সম্প্রতি যাঁরা 'যবন' ব'লে 'মুসলমান' শব্দটির ভাব প্রকাশ করেন, তাঁদের

---

১ "হিন্দু লেখক ও মুসলমান সমাজ," 'নবনূর,' আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩১০, পৃ. ২২৯।

২ ঐ, পৃ. ২৩১।

৩ "বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান," ঐ, কার্ত্তিক, ১৩১১, পৃ. ৩১৪।

৪ ঐ, পৃ. ৩১৫।

৫ "গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য," 'নবনূর,' পূর্বে, পৃ. ২৬৮।

৬ মোহাম্মদ কে. চাঁদ, "বঙ্গভাষা ও মুসলমান," 'আল্-এস্‌লাম,' পূর্বে, পৃ. ৬৪০।

৭ "(আনোয়ারা) সমালোচনা," 'ব-ম-সা-প,' বৈশাখ, ১৩২৬, পৃ. ৫৯।

www.pathagar.com

মনে 'একটা বেশ ঘৃণার ভাব পরিষ্কার টের পাওয়া যায়।...বাংলা সাহিত্যে মুসলমান অর্থে যবন শব্দ বিশেষ ভাবে পরিচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণার ভাবও সুস্পষ্ট।[১]

এ পর্যন্ত বঙ্কিম-উপন্যাসে মুসলিম-প্রসঙ্গ সংক্রান্ত যে সমস্ত বিরূপ আলোচনার উল্লেখ করা হলো, অধিকাংশই যে প্রকৃত শিল্পবোধ দ্বারা প্রাণিত নয়, তা সহজেই বুঝা যায়। এই সমালোচকদের মনে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে তিক্ততা দীর্ঘকাল যাবৎ সঞ্চিত ছিলো, এগুলি আসলে তারই বহিঃপ্রকাশ। এবং এমন ধারণা করাও বোধ হয় অসঙ্গত নয়, বঙ্কিম-উপন্যাসের মুসলিম-প্রসঙ্গ সেগুলির বিস্ফোরণের উপলক্ষ মাত্র। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, হিন্দুর বিরুদ্ধে তাদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে বঙ্কিম-উপন্যাসের মুসলিম-প্রসঙ্গ সমূহ তীব্রতর করে তুলেছিলো। ফলে তাঁদের কাছে বঙ্কিম-উপন্যাসের যথার্থ শিল্পমূল্য বিবেচিত হয় নি—অনিবার্যভাবেই মুসলিম প্রসঙ্গের বিকৃতি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য এ-জাতীয় প্রতিবাদী সাহিত্য-সমালোচনায় শিল্প-বিচারের প্রত্যাশাও নিরর্থক।

বঙ্কিম-উপন্যাসে বর্ণিত মুসলিম-প্রসঙ্গ ও চরিত্র নিয়ে মুসলমান সমালোচকদের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ প্রকাশ শুধু পত্র-পত্রিকায় সীমাবদ্ধ থাকে নি, এর পাশাপাশি কয়েকজন মুসলমান ঔপন্যাসিক প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশে এমন কয়েকটি উপন্যাস রচনা করলেন, যা-তে পাওয়া গেলো, হিন্দু যুবতী মুসলমান যুবকের প্রেমে উন্মত্ত। এই ঘটনা ঘটলো সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় শ্রেণীর উপন্যাসে। বুঝতে অসুবিধা হয় না এগুলি বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ার ফসল। হিন্দু ঔপন্যাসিকগণ যেমন অতীত ইতিহাস থেকে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষের কাহিনী বেছে নিয়ে তাদের উপন্যাসে মুসলমানকে আক্রমণ করেছিলেন, মুসলিম ঔপন্যাসিকগণও একই পথ অবলম্বন করলেন। তাঁদের ঐতিহাসিক উপন্যাসে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু রাজ-রাজড়াদের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গীরিত হ'লো। হিন্দু ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য যেমন ছিলো মোগল-পাঠান, মুসলমানদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল তেমনি হয়ে উঠলো অনিবার্যভাবেই রাজপুত-মারাঠা।

আর্জু মান্দ আলীর সামাজিক উপন্যাস 'প্রেম-দর্পণ' (১৮৯১)-এ বিবাহিতা ক্ষেত্রমণি মুসলমান যুবক কাসেমকে ভালোবেসেছে এবং একারণে স্বামী গজপতি কর্তৃক বেত্রাহত হবার পর আয়েষার অনুকরণে ঘোষণা করেছে '...কাসেম আমার

১ "যবন," 'সওগাত,' ভাদ্র, ১৩৩৫, পৃ. ৮৯।

www.pathagar.com

প্রার্থনাথ, প্রাণেশ্বর...।[১] পরিশেষে ক্ষেত্রমণি কাসেমকে বিয়ে ক'রে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতা হয়েছে।

মতীয়র রহমানের 'মোক্ষ প্রাপ্তি' (১৩০৯-১০ বঙ্গাব্দে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) উপন্যাসে জয়পুরের ব্রাহ্মণ যুবক রামচন্দ্র এবং বারাণসীর বণিক কৃষ্ণদাসের বিধবা কন্যা গোপা কাজী নূরুদ্দীনের সাহচর্যে এসে ইসলাম ধর্মের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তার 'যমুনা' (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'ইসলাম প্রচারক'-এ পুনর্মুদ্রিত) উপন্যাসের শেষে 'মারাঠা-নন্দিনী যমুনা হৃষ্টচিত্তে আবদালীকে পতিত্বে বরণ করিলে মহারাষ্ট্রীয় বন্দীগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া পুতিগন্ধময় পৌত্তলিক জীবন পরিত্যাগপূর্বক ইসলামের পবিত্র নির্ঝরে অবগাহন করতঃ নিজ নিজ আত্মার বিশুদ্ধি সাধন' করে।[২]

ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দাঁত ভাঙ্গা জবাব' দেবার জন্যেই উপন্যাস রচনা করছেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করার অভিপ্রায়ে তিনি তার প্রতিটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে কয়েকটি ঐতিহাসিক হিন্দু-চরিত্রের কলঙ্ক উদঘাটন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে দেখালেন একজন মুসলিম নারী একজন হিন্দু যুবকের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। সিরাজীর 'রায়নন্দিনী' (১৯১৬) উপন্যাসে দেখা গেলো দু'জন হিন্দু নারী ও (কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী এবং প্রতাপাদিত্যের কন্যা অরুণাবতী) দু'জন মুসলমান যুবকের (খিজিরপুরের নবাব ঈসা খাঁ এবং প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি মাহতাব খাঁ) প্রণয় ও পরিণয়। অনুরূপভাবে 'তারাবাঈ' (১৯১৬) উপন্যাসে মারাঠাধিপতি শিবাজীর কন্যা তারাবাঈ বিজাপুরের সেনাপতি আফজাল খাঁর প্রেমে উন্মত্ত। তবে শঠ শিবাজীর চক্রান্তে আফজাল খাঁ নিহত হন এবং তারাবাঈও পরে মৃত্যুবরণ করে। চিতোরের রাণা উদয় সিংহের কন্যা রুক্মিনীর সঙ্গে মালবের যুবরাজ নুরউদ্দীনের এবং রুমী খাঁর সঙ্গে রাণার ভগ্নী স্বর্ণবাঈ-এর প্রণয় ও পরিণয় 'নূরউদ্দীন' (১৯১৬) উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। অবক্ষয়োন্মুখ ভারতীয় মুসলমান সমাজের উপর মারাঠা জাতির প্রভাব এবং তাদের প্রভাব থেকে মুসলমান সমাজকে উদ্ধারের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী

১ 'প্রেম-দর্পণ', মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা-রাজশাহী, ১৯৬৫, পৃ. ৪২।

২ "যমুনা" 'মতীয়র রহমান গ্রন্থাবলী,' ঢাকা, ১৯৬০, পৃ. ১০৭।

www.pathagar.com

(১৯১৮) উপন্যাসের প্রধান বিষয় হ'লেও—সদাশিব রাও-এর শঠতা এবং লাম্পট্য-চিত্রণ উপন্যাসের একটি অন্যতম লক্ষ্য।[১]

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'চাঁদ তারা বা হাসানগঙ্গা বাহমণি' (১৯১৭) উপন্যাসেও পূর্বোক্ত রীতি অনুসরণে হিন্দু নায়িকা এবং মুসলমান নায়কের প্রেম-বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। এই সমস্ত উপন্যাসে প্রকাশিত প্রতিশোধাত্মক প্রবণতাকে আনিসুজ্জামান প্রেমের 'রায়ট' বলে অভিহিত করেছেন।[২] এই মন্তব্যে কিঞ্চিৎ কৌতুক থাকলেও, এর অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য অকিঞ্চিৎকর নয়।

উপন্যাস ছাড়া, শেখ ইদরিশ আলীর 'বঙ্কিম-দুহিতা' (?) এবং ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেনের 'জ্ঞান ভাণ্ডার' (১৯২৪) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর উপন্যাসকে অত্যন্ত কদর্য ও অশ্লীলভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। 'জ্ঞান ভাণ্ডার' প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিম-উপন্যাসের কুরুচিপূর্ণ রঙ্গানুকরণ।

হিন্দু ঔপন্যাসিকগণের উপন্যাসের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমানদের রচিত হিন্দু বিদ্বেষমূলক উপন্যাসকে মুসলমান সমাজের কোনো কোনো রুচিশীল ও নিরপেক্ষ সাহিত্যিক-সমালোচক মোটেই পছন্দ করেননি। তাঁরা এই উগ্র প্রবণতাকে উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অকল্যাণকর এবং বিপজ্জনক মনে করেছেন।

মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ বলেন, বাঙ্গালী মুসলমান নানাভাবে অভিযোগ করে আসছে, বাঙ্গালী হিন্দু তাদেরকে ঘৃণা করে। 'কথাটা অর্দ্ধ অসত্য, অর্দ্ধ সত্য'। অনেক সময় হিন্দুরা 'পরিহাস-প্রিয়তাবশে' অথবা 'সত্য ঘটনা মূলে কিম্বা প্রকৃত ভ্রমক্রমে' মুসলমানদের 'অগৌরবজনক' কোনো কথা লেখে, 'অমনি মুসলমান তাহাতে মুসলমান-বিদ্বেষের গন্ধ অনুভব করিয়া হিন্দুর চতুর্দশ পুরুষের, মায় দেবদেবীর পর্যন্ত শ্রাদ্ধ করিয়া নিজের কল্পিত ক্ষোভের নিবারণ করে (?)।...[৩] এরপর তিনি কোরান শরীফ থেকে মূল উদ্ধৃতি দিয়ে তার অর্থ তুলে ধরেন : 'যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করে তাহাদিগকে মন্দ বলিও না, তাহা হইলে তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ বে-আদবী করিয়া আল্লাহকে মন্দ বলিবে (সুরা আন'আম, রু ১৩)।' এবার তাঁর অখণ্ডনীয়

১ সিরাজীর উপন্যাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, সারোয়ার জাহান, 'প্রতিক্রিয়ার ফসল : সিরাজীর উপন্যাস,'' 'বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা,' কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৪, পৃ. ১-২৬।

২ আনিসুজ্জামান, ''জাতীয়তাবাদ ও আমাদের সাহিত্য,'' 'পরিক্রম,' পৃ. ৬৪২।

৩ ''আমাদের (সাহিত্যিক) দরিদ্রতা,'' (যশোহর খুলনা সিদ্দিকা সমিতির ৮ম অধিবেশনে গঠিত), 'আল্-এস্‌লাম,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃ. ৭৩।

www.pathagar.com

যুক্তি, 'যখন কোরান অনুযায়ী মুসলমান জড়বাদীকে পর্যন্ত মন্দ বলিতে পারে না, তখন "এক সেবা দ্বিতীয়ম্" বাদী হিন্দুকে মুসলমান কি করিয়া গালি দিতে পারে ?[১]

তিনি মুসলমানদেরকে পরামর্শ দেন, 'রাজসিংহ'ও 'চন্দ্রশেখর'-এর লেখককে শুধু 'গালাগালি' দিলে চলবে না, 'ঐতিহাসিক সার্চ লাইট দ্বারা' তার প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে হবে। তিনি প্রশ্ন করেন, 'বাঙ্গালী মুসলমান তাহা করিয়াছে কি ?' বরং যদুনাথ সরকার, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক মুসলমানদের সেই অসম্পন্ন কাজ করছে।[২] অবশ্য ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ গবেষণাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো পণ্ডিতও মোটেই ভালো চোখে দেখেননি।[৩]

কাজী আবদুল ওদুদও উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টির নামে হিন্দু সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আচরণ করছেন। তিনি বলেন, যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ হিন্দু সাহিত্যিক' মুসলমানের নানা বীভৎস চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন', সেহেতু মুসলমান কিছু সাহিত্যিক তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে 'উল্টো সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন।' প্রসিদ্ধ হিন্দু লেখকগণ যেখানে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান-চরিত্র হীন বর্ণে চিত্রিত করেছেন, 'মুসলমান লেখকেরা ঠিক সেইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া হিন্দুকে মুসলমান অপেক্ষা হীন অঙ্কিত করিতেছেন। এক পক্ষের এরূপ অন্যায় করা এবং অপর পক্ষের এরূপ প্রতিশোধ লওয়া নিশ্চয়ই আনন্দের সংবাদ নয়।' বাংলার দুটি সন্তান হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াসের মধ্যেই দেশের কল্যাণ নিহিত।[৪] তিনি হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ করে প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির আবেদন করে বলেন, 'আমরা মুসলমান সাহিত্যিকের কাছে সেই ধরনের পূর্ণ সৃষ্টি চাই—শুধু নিন্দাবাদ চাই না'।[৫]

---

১. "আমাদের (সাহিত্যিক) দরিদ্রতা," যশোহর খুলনা সিদ্দিকা সমিতির ৮ম অধিবেশনে পঠিত, 'আল-এসলাম,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃ. ৭৪।

২ ঐ, পৃ. ৭৯।

৩ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যদুনাথ সরকারের উদ্দেশে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ...আমি বলি, হিন্দুর দিক হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া কি আরঙ্গেবের একটা ইতিহাস লেখা যায় না ?... আমার বিশ্বাস যায়।' দ্রষ্টব্য "হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা", (অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস শাখায় পঠিত) 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২, পৃ. ২৯২।

৪ মুসলমান সাহিত্যিক", 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩২৫, পৃ. ২২২।

৫ ঐ, পৃ. ২২৪।

www.pathagar.com

আহমদ মিঞার 'মিলনের উপায়'[১] প্রবন্ধের পাদটিকায় সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, '...হিন্দু লেখকগণের রচনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইদানীং মুসলমান সমাজে হিন্দু-বিদ্বেষ-মূলক গ্রন্থের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এই উভয় সম্প্রদায়কে এইরূপ পরস্পর ধ্বংসকারী কার্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করি। সাহিত্যের একটি আদর্শ থাকা চাই, নচেৎ সাধনা বিফল বরং বর্জ্জনীয়।'[২]

সাহিত্যে বৈচিত্র্যের নামে মুসলমান ঔপন্যাসিকগণ যে হিন্দু নায়িকা এবং মুসলমান নায়কের প্রেমের চিত্র অঙ্কন করছেন, তার উল্লেখ করে অপর একজন সমালোচক নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধে বলেন,—'মুসলমান-লিখিত অনেকগুলি উপন্যাসেই হিন্দু নায়িকার সহিত মুসলমান নায়কের প্রণয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রেমের রাজ্যে জাতি বিচার নাই, এবং সাহিত্যের দিক দিয়া ইহা একটি বৈচিত্র্যও বটে। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি এক কথা আর প্রতিহিংসা-সাধন আর এক কথা। হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ যেন এই বৈচিত্র্যের অবতারণা না করেন।[৩]

ওই একই সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলিম-সাহিত্য পত্রিকায় সৈয়দ এমদাদ আলী শৈলবালা ঘোষ জায়া রচিত 'শেখ আন্দু' উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, এতকাল হিন্দু সাহিত্যিকদের 'রচিত কুচিত্রিত মোসলেম পুরুষ ও নারী চরিত্রের কথা ভেবে...'ক্রোধে গর্জ্জিতেছিলাম। বৈর নির্য্যাতনের স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের কোনও কোনও লেখক ইহার প্রতিশোধ লইতেও দাঁড়াইয়াছিলেন। বঙ্কিম-দুহিতা' প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।' সমালোচক উল্লেখ করেন যে, 'শেখ আন্দু' উপন্যাসের হিন্দু লিখিকা 'বাঙ্গালা সাহিত্যের এই কুৎসিৎ, কলহ-কণ্টকিত ধারাটাকে বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন...।[৪]

৪

বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে বেশ কয়েকটি মুসলিম চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছেন, মুসলিম-প্রসঙ্গ তার হাতে বিকৃত হয়েছে এবং মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যায় ও অসঙ্গত মন্তব্য করেছেন, এ-বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধ নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে মুসলিম-বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু যে-কোনো শিল্পীর মানস-বিশ্লেষণের কালে এ-জাতীয় সরল-রৈখিক

১ দ্রষ্টব্য, 'ব-ম-সা-প,' শ্রাবণ, ১৩২৬, পৃ. ১১৩-২০।

২ ঐ, পৃ. ১১৫ (পা, টী)।

৩ এম, আনসারী, "সাহিত্যে বৈচিত্র্য," ঐ, কার্ত্তিক, ১৩২৮, পৃ. ১৭১।

৪ ঐ, পৃ. ১৯১।

www.pathagar.com

বিচার কোনো সময়েই অভ্রান্ত বা নিরাপদ নয়, এ কথাও স্বীকার করতে হবে বা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে (অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি) বঙ্কিম-বিচার করার সময়ে পূর্বোক্ত কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। নিরপেক্ষ এবং ভাবাবেগহীন দৃষ্টিতে যদি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিকে দেখি, তাহ'লে দেখবো 'মুসলমান-বিদ্বেষী' বঙ্কিমের হাতে এমন কিছু মুসলিম চরিত্র নির্মিত হয়েছে যা পাশাপাশি হিন্দু-চরিত্রের তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত এবং শিল্প-বিভাসিত।[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে ঐতিহাসিক মুসলিম-চরিত্র সুবিচার থেকে বঞ্চিত, কিন্তু কল্পিত মুসলিম-চরিত্রসমূহের প্রতি তার মমতা এবং শিল্প-প্রেরণার উৎসারণ যে শতমুখী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'দুর্গেশনন্দিনী'র উল্লেখযোগ্য মুসলিম চরিত্র কতলু খাঁ, ওসমান ও আয়েষা। বঙ্কিমের বর্ণনায় ঐতিহাসিক চরিত্র কতলু খাঁ নির্দয়, মদ্যপ এবং লাম্পট্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু ওসমান ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও বঙ্কিমের ভাষায় সে 'পাঠান কুলতিলক'। পূর্বে লক্ষ্য করেছি জনৈক মুসলমান সমালোচক ওসমান-জগৎসিংহের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, জগৎসিংহের তুলনায় ওসমানকে হীন বর্ণে চিত্রিত করা হয়েছে, অথচ জগৎসিংহের তুলনায় '...ওসমান খাঁ কোন অংশেই হীন ছিলেন না'।[২]

পূর্বোক্ত সমালোচকের মন্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, ওসমান খাঁ জগৎসিংহের তুলনায় হীন তো নন, বরং ওসমান শৌর্য, বীর্য, প্রেম, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিহিংসা—সব কিছুর সমন্বয়ে বাস্তব ও প্রাণ-সম্পদে দ্যুতিময়। ওসমানের মোহনীয় রূপ বর্ণনার পর বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলছেন, 'বিমলার যদি তৎক্ষণে মনের স্থিরতা থাকিত, তবে বুঝিতে পারিতেন যে, স্বয়ং জগৎসিংহের সহিত তুলনায় এ ব্যক্তি নিতান্ত ন্যূন হইবেন না ; জগৎসিংহের সদৃশ দীর্ঘায়ত বা বিশালোরস্ক নহেন, কিন্তু তৎসদৃশ বীরত্বব্যঞ্জক সুন্দর-কান্তি ; তদধিক সুকুমার দেহ।'

বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে হেয় করতে চাইলে 'পাঠান কুলতিলক' সম্মানে ভূষিত করতেন না, বা প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাকে এমন ক্ষত-বিক্ষত ক'রে জীবন্ত ও বাস্তব

---

১ কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, যে-কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা অর্থাৎ মুসলমান-বিদ্বেষ, সে অপরাধে তাঁকে সহজেই অপরাধী না ভাবা যায় এই বিবেচনা থেকে যে মীর কাসেম দলনী বেগম, চাঁদ শা ফকির, ওসমান প্রভৃতি কয়েকটি সর্ববাদি সম্মতরূপে উৎকৃষ্ট মুসলমান চরিত্র তাঁর কলম থেকে উৎরেছে...,।'—"বঙ্কিমচন্দ্র," 'শাশ্বত বঙ্গ,' পৃ. ১২৭।

২ স্বর্গীয় ডাক্তার মোহাম্মদ হবিবর রহমান, "ওসমান ও জগৎসিংহ (শেষার্দ্ধ)," 'নবনূর,' পূর্বে, পৃ. ৯৩।

www.pathagar.com

মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতেন না। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎসিংহের প্রতি তার ঈর্ষাময় মানবিক উক্তি, 'আমরা পাঠান—অন্তঃকরণ প্রজ্জ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না ; এই পৃথিবী মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।'—এই হলো ব্যর্থ প্রণয়ীর মর্মহিত ঔচিত্যানৌচিত্যবোধ শূন্য দীপ্ত অথচ করুণ উক্তি।[১]

আর ওসমানের প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎসিংহ? তিলোত্তমা-আয়েষার প্রেমের দ্বিমুখী টানে যেখানে তার হৃদয় তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ হবার কথা, অন্তঃশায়ী বিলোড়নের প্রাবল্যে চূর্ণ হয়ে যাওয়া অনিবার্য ছিলো—সেখানে সে একেবারে নির্দ্বন্দ্ব; সুকুমার সেনের ভাষায় জগৎসিংহ '...নববিবাহিত বাঙ্গালী প্রেমিকদের মতই রঙচটা ও ব্যক্তিত্বহীন'।[২]

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা। এ মন্তব্যে কোনো অতিরঞ্জন নেই। এই উপন্যাসে প্রধান তিনটি নারী চরিত্রের মধ্যে মুসলমান নারী আয়েষা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। ঔপন্যাসিক এই তিন প্রধান নারীর রূপের যে তুলনা করেছেন সেখানেও আয়েষার রূপ শীর্ষে। শুধু তাই নয়, আয়েষার রূপের বিবরণ দেবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তরিকতা, শিল্পী সত্তার উন্মোচন, সর্বোপরি তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, সেইটেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। তার তুলিতে তখন আয়েষা যবনী বা হিন্দু নয়—শিল্পীর কল্পনার নির্মল প্রতিবিম্ব।

ক্ষুব্ধ মুসলমান সমালোচকগণ জ্ঞাতসারে অথবা উত্তেজনার বশে এই নির্মল চরিত্রের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষের ঘ্রাণ আবিষ্কার করেছেন। কারণ আয়েষা মুসলিম হিন্দু যুবকের প্রেমে বিহ্বল। এমন একটি যুক্তি প্রায় শোনা যায়,পাঠানদের অন্দরমহল এমন সুদৃঢ় ছিলো যে আয়েষা-জগৎসিংহের প্রেম তো দূরের কথা সাক্ষাৎ হওয়াই অসম্ভব। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে এই যুক্তি অকাট্য ; তাছাড়া কতুল খাঁ ও ওসমানকে ঔপন্যাসিক তেমন উদার করে আঁকেন নি যে তারা সেবা শুশ্রূষার জন্যে জগৎসিংহকে অন্দর মহলে আশ্রয় দেবেন—এ যুক্তিও খণ্ডনীয় নয়। কিন্তু শিল্পের যে-শ্রেষ্ঠ সম্পদ রস, সেই রসের দিক

১ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়—'ওসমানের হৃদয়ে অনির্বাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তীব্র প্রতিহিংসার বিকাশ দেখাইয়া বঙ্কিম তাহাকে একটি বাস্তব মূর্তি করিয়া তুলিয়াছেন, একটা বিশেষত্বহীন আদর্শ মাত্রে পর্যবসিত হইতে দেন নাই। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ক্রোধই তাহাকে একটি বিশেষ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ... আনিয়া দিয়াছে।'—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,' ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৬৭। সুকুমার সেন বলেন, 'ওসমানের ভূমিকায় ব্যক্তিত্বের প্রবলতা আছে'।—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭।

২ ঐ, পৃ. ২১৭।

www.pathagar.com

দিয়ে বিচার করলে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক তথ্যকে তো বড়ো করে দেখা চলে না। 'এই যে বিপন্ন বীরের প্রতি নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, এই যে মিলনের চিত্র—যে মিলন জাতি, সমাজ, পারিবারিক বন্ধন—সমস্ত গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া নিজের মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সে দৃষ্টি ত কোন সাহিত্য রসিকই অবজ্ঞা করিতে পারেন না।[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সাহিত্যরসিকগণও তাই আয়েষা চরিত্রকেই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-ফসল বলে অভিনন্দিত করেছেন।[২]

'মৃণালিনী' উপন্যাসে বর্ণিত স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র খিল্‌জির গোপন ষড়যন্ত্র অপেক্ষা পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতা বড়ো করে দেখেছেন। স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা যে, যে-কোনো ক্ষেত্রেই ঘৃণ্য এবং অমার্জনীয় তিনি তা প্রদর্শন করেছেন পশুপতি-চরিত্রে। তবে লক্ষণীয়, পশুপতির মধ্যে কোনো অনুশোচনা নেই, বরং খিল্‌জির সহযোগী মহম্মদ আলি তার কৃতকর্মের জন্যে আন্তরিক-ভাবে অনুতপ্ত এবং অজান্তে-কৃতপাপের গ্লানি মোচনের উদ্দেশে পশুপতিকে ধর্মান্তর গ্রহণ থেকে রক্ষা করে কৌশলে মুক্তি দিয়েছে। পশুপতিকে বিদায় দেবার মুহূর্তে লজ্জা অনুশোচনায় সংকুচিত মহম্মদ আলি বলেছে, "ধর্ম্মাধিকার...বখ্‌তিয়ার খিলজির এরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্ত্তাবহ হইয়া আপনার নিকট যাইতাম না।...আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। গঙ্গাতীরে নৌকা প্রস্তুত আছে—আপনি যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করুন।..."

এখানে কল্পিত গৌণ মুসলিম চরিত্র মহম্মদ আলি মানবিক ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে, অপরপক্ষে পশুপতিকে দেশদ্রোহিতার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে জলন্ত মন্দিরের মধ্যে আত্মাহুতি দিয়ে।

আমরা আগেই দেখেছি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মীর কাসিম চরিত্র নির্মাণে ঐতিহাসিক তথ্য, শিখা ও সততার সঙ্গে রক্ষা করেছেন। মীর কাসিম এক-দিকে কঠোর, আপোষহীন এবং স্বাধীনচেতা নবাব, অন্যদিকে প্রেমিক। মীর কাসিম দলনীর এই প্রেম ও করুণ পরিণতি শিল্পী বঙ্কিমের কল্পনার সৃষ্টি। প্রেমিক

---

১ কাজী আব্দুল ওদুদ. "মুসলমান সাহিত্যিক," প্রবাসী,' পূর্বে, পৃ. ২২৩।

২ দ্রষ্টব্য, "রেবেকা ও আয়েষা," মাসিক সমালোচক,' ১ম খণ্ড [মাসের উল্লেখ নেই], ১৮৮৬, পৃ. ২১৩—২২ ; পূর্ণচন্দ্র বসু, "আয়েষা," 'আর্য্যদর্শন,' আষাঢ়, ১২৮৮. পৃ. ১১৯—২৬ ; "নবেলের পাঠোপযোগিতা," 'বামাবোধিনী পত্রিকা,' শ্রাবণ, ১২৯০, পৃ. ১২৪—২৫ ; হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, "বঙ্কিমচন্দ্র", 'দাসী,' জুলাই, ১৮৯৫, পৃ. ৩৯০ ও অন্যান্য।

www.pathagar.com

মীর কাসিমকে যখন জানানো হলো দলনী অন্য পুরুষে আসক্তা,—তার প্রেমিক হৃদয়ে তা অসহনীয় হয়ে উঠলো। দলনীকে বিষপ্রয়োগ করে তিনি হত্যার আদেশ পাঠালেন। দলনী বেগম সতী-সাধ্বী নারী। স্বামীর নির্দেশে এবং কিঞ্চিৎ অভিমান ও অপমানে বিষপান করলেন। বিষপানের পূর্ব মহূর্তে '...দলনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—' এবং স্বামীর উদ্দেশে বললেন '...তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—... আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার দুঃখ।'

উল্লিখিত পরিবেশ ও চিত্র বর্ণনায় ঔপন্যাসিকের সহানুভূতি ও মমতা সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে। দলনীর বিষপান ও মৃত্যুদৃশ্য এমন মমত্ব-মণ্ডিত হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য চরিত্রে এই মমত্ব দুর্লভ না হলেও একেবারে সুলভ নয়। তৎকালীন সমালোচকগণও দলনী-শৈবলিনীর তুলনামূলক আলোচনা করে অকুণ্ঠভাবে দলনীকে সার্থকতম চরিত্র ব'লে উল্লেখ করেছেন।'[১]

মীর কাসিম সম্পর্কে মুসলমান সমালোচকদের অভিযোগ, তাঁকে স্ত্রৈণরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এ-অভিযোগ ঐতিহাসিক তথ্যের প্রেক্ষিতে সত্য, তবে তাঁকে স্ত্রৈণ কোনো মতেই বলা যায় না। ইতিহাস উপেক্ষা করে ঔপন্যাসিক মীর কাসিমকে রমণী প্রেমে কোমল, দুর্বল করেছেন। কুলসুম যখন প্রকাশ্যে দলনীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের কথা ঘোষণা করলো, তখন মীর কাসিম মর্মে অনুভব করলেন বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড তাঁর হস্তচ্যুত হয়ে পড়ছে, 'কিন্তু যে অজেয় রাজ্য বিনা যত্নে থাকিত—সে কোথায় গেল?' তিনি উপস্থিত ওমরাহগণকে অনুরোধ করলেন, যদি ইংরেজরা তাঁকে হত্যা করে তাহলে 'দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও'। এবং

---

১ 'আর্যদর্শন' পত্রিকা বলে, 'এই বিলাস ভূমিতেও যে কখন কখন প্রকৃত প্রণয় জন্মিতে পারে দলনী তাহারই দৃষ্টান্ত।' শৈবলিনীর সঙ্গে তুলনা করে পত্রিকা মন্তব্য করে, শৈবলিনী কৌশলময়ী-প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্না। কিন্তু দলনী-চরিত্রে ভালবাসা ও কোমলতা ভিন্ন...অন্য কোন উপকরণ নেই। দ্রষ্টব্য, "দলনী বেগম," ঐ, আষাঢ়, ১২৮৫, পৃ. ৪-৭। পূর্ণচন্দ্র বসু উভয়ের তুলনা করতে গিয়ে বলেন, 'একদিকে শৈবলিনীর গৌরব' অন্যদিকে দলনীর মহত্ত্ব। দলনীর মৃত্যুকালে একদা তাহার মহত্ত্বে শৈবলিনীর গৌরব পরাজিত হইয়াছিল।' তিনি দলনীর প্রেমের গভীরতা উল্লেখ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, তার প্রেম-সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে উন্মুখ। সেই সমুদ্রের সঙ্গে মিলন হ'লো না বলে 'আপনি বালুকা-ভূমিতে বিশুষ্ক হইয়া গেল, তথাপি এক পঙ্কিল প্রবাহিনীর সহিত মিলিল না।'—'কাব্য সুন্দরী,' কলিকাতা, ১২৮৭, পৃ. ৯৩।

www.pathagar.com

এক সময়ে নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করে 'ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া 'দলনী! দলনী! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন'।

পূর্বোক্ত অভিযোগের একটি অন্যতম লক্ষ্য সম্ভবত এই বর্ণনাংশ। কিন্তু একজন ন্যায়-নিষ্ঠ, স্বাধীনচিত্ত নবাবের চরিত্রে নিষ্কলুষ প্রেমের কল্পনা দোষণীয় বা কলঙ্ক-জনক নয়—রসজ্ঞ পাঠক তা সহজেই স্বীকার করবেন। বরং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কঠিনতা এবং প্রেমের ক্ষেত্রে কোমলতা—এই দুই বিপরীত উপাদানের সমাহারে মীর কাসিম বাস্তব মানুষ হয়ে উঠেছেন বলেই মনে করি। তিনি যখন জানতে পারলেন দলনীর কলঙ্ক মিথ্যে এবং তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী তকি খাঁ,[১] তখন তকি খাঁকে তিনি স্বহস্তে হত্যা করলেন। এ নবাবী নিষ্ঠুরতা নয়—প্রিয়তমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী ব্যক্তির প্রতি সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক নির্মমতা।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালে প্রাপ্ত তথ্য এবং কল্পনার সহযোগে ঔরঙ্গজেব চরিত্র বিকৃত করেছেন। ঔরঙ্গজেবের বিভিন্ন-বিচিত্র কলঙ্ক, বিশেষত বঙ্কিম-কল্পিত ঔরঙ্গজেব নির্মল কুমারী প্রসঙ্গ মুসলমান সম্প্রদায়কে সবচেয়ে বেশি বিচলিত ও অসহিষ্ণু করে তোলে।

জনৈকা রাকচতুরা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী হিন্দু যুবতীর প্রতি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অনুরক্ত হবার ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক সত্যের ব্যত্যয়। ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি কোনো কোনো সাহিত্য সমালোচক এবং ঐতিহাসিক এই কাহিনীকে ঐতিহাসিক আবহের পরিপন্থী এবং উপন্যাসের পক্ষে রসহানিকর ব'লে অভিহিত করেছেন। ইতিহাসচ্যুত ঔপন্যাসিক এক্ষেত্রে যেমন নিন্দিত হ'তে পারেন, তেমনি মানবের, এমন কি সেই মানব যদি 'পৃথিবীশ্বর' ঔরঙ্গজেবও হন, তার হৃদয় বৃত্তির চিরন্তন সত্যের রূপ-কার হিসেবে তিনি শ্রদ্ধা বা প্রশংসাও পেতে পারেন না কি? হ'তে পারে মোগল-বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবকে নারী আসক্ত ব'লে চিত্রিত ক'রে তাকে হেয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ এবং নিরাবেগ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, ঔরঙ্গজেব-নির্মল-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তেমন কোনো মনোভাব আবিষ্কার করা যায় কি? মুসলমান-বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত এই কাহিনী-নির্মাণকালে শিল্পীর আসনে বসে এমন সতর্কভাবে শিল্প-সংযম রক্ষা করেছেন যে সেখানে ঐতিহাসিক তথ্যচ্যুতি ছাড়া তার অন্য কোনো বিরূপতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

১ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে আলোচনা-কালে আমরা লক্ষ্য করেছি বঙ্কিমচন্দ্র তকি খাঁ-চরিত্রে ঐতি-হাসিক-সত্য রক্ষা করেন নি, বরং বিকৃত ক'রে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।

www.pathagar.com

বয়সী সম্রাট স্বীকার করেছেন তিনি নির্মলকুমারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হননি। তার চোখে নির্মল অপেক্ষা উদিপুরী অনেক সুন্দরী। শুধু নির্মলের সত্যভাষিতা, বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য ও সাহস দেখে তাকে তার 'উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে'। নির্মলকে বিদায় দেবার সময় ঔরঙ্গজেব গভীর বেদনার সঙ্গে নিজের হৃদয় উন্মোচন করেছেন: 'দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না—। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালবাসিয়াছি—কিন্তু তোমাকে পাইলাম না।..তোমায় আটকাইব না—ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিব না। তুমি যাও। আমাকে স্মরণ রাখিও। যদি কখনও আমা হইতে তোমার কোন উপকার হয়, আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।'

ভাবতে অবাক লাগে বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের প্রতি এতো বিরূপ থাকা সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠেই 'দুনিয়ার বাদশাহ হলেও কেহ সুখী হয় না'—এই শাশ্বত সত্যের গভীর ও বেদনাময় বাণী আরোপ করেছেন। অথবা 'আমি তোমায় যেরূপ স্নেহ করিতাম, কোন মনুষ্যকে কখনও এমন স্নেহ করি নাই'—, নির্মলকুমারীকে লিখিত ঔরঙ্গজেবের এই পত্রে ঔপন্যাসিক বর্ণিত পরিস্থিতিতে কতো সাবধানতার সঙ্গে ঔরঙ্গজেবকে সংযমী ও শালীন করে তুলতে পেরেছেন। অথচ তাঁর কথিত 'জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ'কারী ঔরঙ্গজেবকে ইচ্ছানুরূপ কদর্য বর্ণে অঙ্কিত করার কী সুযোগই না তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। সম্রাটের পক্ষে একজন সাধারণ নারীকে এমন কথা বলা আভিজাত্য-বিরোধী (ইতিহাস-বিরোধী তো বটেই) হ'তে পারে, তবে একেবারে বাস্তবতা-বিরোধী ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি ?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সম্রাট ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে মুসলমানদের একটা স্বতন্ত্র শ্রদ্ধা ও গর্ববোধ ছিলো তা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই দেখি, তাঁদের পুনর্জাগরণের কালে রচিত ইতিহাসে মোগলদের স্মরণ করা হয়েছে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে এবং সেই ইতিহাসে ঔরঙ্গজেবের স্থান ব্যাপক। মুসলমান-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ঔরঙ্গজেব-সম্পর্কিত প্রবন্ধ সমূহের উদ্দেশ্যই ছিলো প্রচলিত ইতিহাস, বঙ্কিম-প্রমুখ সাহিত্যিকদের উপন্যাস-নাটকাদিতে চিত্রিত ঔরঙ্গজেবের কলঙ্ক-মোচন।[১] তাঁরা প্রমাণ করতে চাইলেন, শুধুমাত্র জাতি-বিদ্বেষের বশবর্তী

১ ঔরঙ্গজেব সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বিবরণ দেওয়া হলো: এস, এম, এ, আহাদ, "সম্রাট আওরঙ্গজেব," নবনূর,' অগ্রহায়ণ, ১৩১০, পৃ. ২৮৮—৯৪; ঐ মাঘ, পৃ. ৩৮৬—৯০; ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১, পৃ. ৬৭—৭৩; ঐ, আষাঢ়, পৃ. ১৩৩—৩৬, ঐ, শ্রাবণ, পৃ. ১৭১—৭৫; ফজলুর রহমান খাঁ, "মহাশ্মশান কাব্য," ঐ, মাঘ, ১৩১২, পৃ. ৪৬০; তসলিমউদ্দীন আহমদ,

www.pathagar.com

হয়ে ঔরঙ্গজেব হিন্দু বা 'অন্য জাতির ধর্মমন্দির ধ্বংস করেন নাই'।[১] ঔরঙ্গজেব প্রবর্তিত 'জিজিয়া' বা সামরিক বিভাগ-বহির্ভূত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্যে তাদের উপর আরোপিত 'সামরিক ট্যাক্স ব্যতীত কিছুই ছিল না'[২] এটি প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে অনেক সমালোচক যুক্তি ব্যাখ্যা প্রদান করলেন।[৩] ভবিষ্যদ্বাণী করা হ'লো যদি কখনো ঔরঙ্গজেব সম্পর্কিত প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন প্রমাণিত হবে, তিনি শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে 'উচ্চস্থান পাইবার অধিকারী'।[৪] ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে ধারাবাহিক উপন্যাসও প্রকাশিত হ'লো।[৫] কিন্তু ঔরঙ্গজেব-নির্মল কুমারীর অলীক ও 'কলুষিত' কাহিনীকে মুসলমান সমালোচকগণ আলোচনা বা বিতর্কের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করাকেও বোধ হয় গর্হিত কর্ম হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাই তাঁদের রচিত প্রবন্ধে বিষয়টির অনুপস্থিতি বিশেষ-ভাবে চোখে পড়ে।

ফকর-উন্নিসার কলঙ্ক বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে জেবউন্নিসার উপর আরোপ করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি। কিন্তু তিনি যতোক্ষণ জেবউন্নিসাকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে দেখেছেন ততোক্ষণ জেবউন্নিসা স্বেচ্ছাচারিণী। মবারককে

"আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ," ঐ, আষাঢ়, ১৩১৩, পৃ. ৯৭—১০৬ ; ঐ, ভাদ্র, পৃ ১৯৩—৯৯ ; ১, অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩৫১—৬১ ; [সম্পাদক], "দুর্গাদাসে" আওরঙ্গজেব," ঐ, পৌষ, পৃ. ৩৭৭—৯৫ ; ওসমান আলী বি, এল, "সম্রাট আওরঙ্গজেব ও সত্তরাণী বিদ্রোহ," ইসলাম প্রচারক' মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩, পৃ. ১৩৮—৪২ ; মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ' সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর আব্দুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি," ঐ, নভেম্বর, ১৯০৪, পৃ. ২৫৭—৬৪ ; ঐ, ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫, পৃ. ৪৮৩—৯৪ ; ঐ, জুন, পৃ. ২৭—৩১ ; এস, এম, আকবরউদ্দীন, "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান," 'আল-এস্‌লাম', পৌষ, ১৩২৩, পৃ. ৪৫৪—৬৬ ; এসলামাবাদী, "আওরঙ্গজেব," ঐ, অগ্রহায়ণ, পৃ. ৪৭৭—৮৫ ; ঐ, ফাল্গুণ-চৈত্র, পৃ. ৬৪৪—৫২ ; বেগম সৌদামিনী খাতুন, "আওরঙ্গজেব,' ঐ, শ্রাবণ, ১৩২৫, পৃ. ২১৪—২৩ ও অন্যান্য।

১ এসলামাবাদী, "মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার," 'আল্-এস্‌লাম,' অগ্রহায়ণ, ১৩২২, পৃ. ৪৭১।

২ এসলামাবাদী, "মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার," ঐ, আশ্বিন, পৃ. ৩৮৩।

৩ দ্রষ্টব্য তস্‌লিমউদ্দীন আহমদ, "জজীয়া," "বাসনা,' আষাঢ়, ১৩১৬ ; উদ্ধৃত, মুন্তাকা নূরউল ইসলাম, 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত,' পৃ. ৪২৪-২৫ ; রেজাউল করিম, "বিজয়া," 'মাসিক মোহাম্মদী,' আষাঢ়, ১৩৫, পৃ. ৫৩৫—৩৯।

৪ এসলামাবাদী, "আওরঙ্গজেব (১)," 'আল্-এস্‌লাম' অগ্রহায়ণ, ১৩২৩, পৃ. ৪৭৭—৮৫।

৫ দ্রষ্টব্য, শেখ হবিবুর রহমান, "আলমগীর" [ঐতিহাসিক উপন্যাস], ঐ, বৈশাখ, ১৩২৫ পৃ. ২১—২৮ ; ঐ, জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৭৫—৮২ ; ঐ, আষাঢ়, পৃ. ১১৪—১৯ ; ঐ, শ্রাবণ, পৃ ১৮৭—৯৫।

www.pathagar.com

সে প্রেম-বিবাহ সম্পর্কে উপহাস করে বলেছে,—'এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমাকে আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।' তবে তার এই বিশ্বাসের অন্তঃসার শূন্যতা উপলব্ধি করতে বেশি সময় লাগেনি। শিল্পী বঙ্কিমের কল্পনায় অনতিপরেই সেই জেবউন্নিসার মধ্যেই প্রেম নানা বর্ণে পুষ্পিত হয়েছে—নিজের মধ্যে অজ্ঞাতে সে প্রেমময় চিরন্তন নারীসত্তা আবিষ্কার করেছে। ক্রমশ তার উপলব্ধি হয়েছে—'বাদশাহজাদীরাও ভালবাসে; জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, নারীদেহ ধারণ করিলেই ঐ পাপকে হৃদয়ে আশ্রয় দিতে হয়।—' তখন সে আর ইতিহাসের কলঙ্কিনী জেবউন্নিসা নয়। শিল্পী বঙ্কিম তাকে সাধারণ মানবীর পংক্তিতে নিয়ে এসেছেন : 'বাদশাহজাদী আর বাদশাহদাজী নহে, মানুষী মাত্র।—জেব-উন্নিসা বুঝিয়াছে যে, স্নেহশূন্য নারীহৃদয় জলশূন্য নদী মাত্র—।' তাইতো সমগ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসের সুবিস্তৃত পটভূমিকায় বর্ণিত যুদ্ধ-বিগ্রহ, মোগল অন্তঃপুরের নারকীয় আবহ, মোগল সৈন্যদের পৈশাচিক উল্লাস অথবা রাজপুতদের অভাবনীয় বীরত্ব ও রণকৌশল—সবকিছুকে ছাপিয়ে জেবউন্নিসার প্রেম-সিক্ত করুণ চিত্রই আমাদের মনে স্থায়ী উজ্জ্বলতায় রেখাঙ্কিত হয়ে থাকে।

মানুষের প্রতি বঙ্কিমের স্বতঃস্ফূর্ত মমত্ববোধ এবং ভালোবাসার জন্যেই মতিবিবি, শৈবলিনী, জেবউন্নিসা, ভবানন্দ প্রভৃতি 'অসাধু চরিত্র' জীবন্ত। সেই তুলনায় তাঁর মনস্কতা এবং সমাদরপুষ্ট, প্রফুল্ল, ব্রজেশ্বর, ভবানী পাঠক, জয়ন্তী প্রমুখ 'সাধু চরিত্র সহজ মানবতার দিক দিয়েও সাহিত্যকে সৃষ্টি হিসাবে কত হীন।'[১] অথচ তাঁর 'অসাধু' চরিত্র ক'টি—সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে কত বেশী গৌরবময়। মানব-চরিত্রজ্ঞানের, মানুষের সঙ্গে সহজ আত্মীয়তার, কত গভীর পরিচয় এ-সবে রয়েছে'।[২] আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত হিন্দু নারী-পুরুষ চরিত্রের মাধ্যমে নীতি বা আদর্শ প্রচার করতে গিয়েছেন সেগুলি মানবিকগুণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু কল্পিত মুসলমান চরিত্রের মধ্যে আদর্শ প্রচারের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত থেকেছেন বলেই জেবউন্নিসার মতো চরিত্রকে তিনি ইতিহাস থেকে উদ্ধার করে পুনর্নির্মাণ করতে পেরেছেন সফলতার সঙ্গে।

---

১ কাজী আব্দুল ওদুদ, "বঙ্কিমচন্দ্র" উদ্ধৃত, রেজাউল করীম, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ,' 'পরিশিষ্ট,' পৃ. ১২৬—১২৭।

২ কাজী আব্দুল ওদুদ, "বঙ্কিমচন্দ্র," 'শাশ্বত বঙ্গ,' পৃ. ১২৯।

www.pathagar.com

জেবউন্নিসার চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র কলঙ্কিত করেছেন—এ-নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের অন্ত ছিলো না। জেবউন্নিসার চারিত্রিক-স্খলন সংক্রান্ত অপবাদ যে একেবারে ভিত্তিহীন, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে তা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, 'No mention of Zeb-un-nissa's love-intrigue with Aqil Khan, or indeed any person whether, is made in any work of her father's reign or even for half a century after his death'. তিনি যুক্তি দেখান, এই কলঙ্ক সম্পর্কে দরবারী ঐতিহাসিক-গণের নীরব থাকা নিশ্চয় স্বাভাবিক ; কিন্তু দরবার বহির্ভূত ঐতিহাসিক, বিশেষত ভীমসেন এবং ঈশ্বরদাস, এই দু'জন হিন্দু ঐতিহাসিকও পর্বোক্ত বিষয় সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেন নি। আর ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বার্নিয়ার এবং মনুচী 'wrote for the eyes of foreigners'[২]। তাঁর মতে 'scandals'-এ পূর্ণ মনুচীর ইতিহাসকে সঙ্গত কারণেই 'a chronique of scandaleuse' বলা হয়েছে। তিনি বলেন, জেবউন্নিসার প্রণয় সংক্রান্ত কলঙ্ক-কাহিনী—'modern—a growth of the 19th century and the creation of Urdu romancists, probably of Lucknow.'[১] যদুনাথ সরকার অন্যত্র বলেছেন, জেবউন্নিসার প্রণয়ঘটিত '...story as fully developed by these writers is inconsistent with the facts of recorded history in all vital points.'[২] তিনি উল্লেখ করেন সূক্ষ্ম রুচি ও শিল্পবোধসম্পন্না এই মহিয়ষী রমণী অনেক পণ্ডিতকে বিস্তর মাইনে দিয়ে সাহিত্য কর্মে উৎসাহিত করতেন। পারশি ও আরবী ভাষায় রচিত তাঁর অনেক কবিতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।[৩]

কিন্তু যদুনাথ সরকারেরও অনেক আগে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে জেবউন্নিসা-চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কের প্রতিবাদ করেন হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ঐতি-হাসিক তথ্য পরীক্ষা করে তিনি বলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শক্তিশালী এবং জন-প্রিয় ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি জেবউন্নিসা-চরিত্রকে পাঠক সত্য ব'লে বিশ্বাস করে। অথচ '...বড়ই পরিতাপের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা সম্ভূত জেবুউন্নিসা, ঐতিহাসিক প্রকৃত জেবুউন্নিসার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র।' তাঁর মতে 'স্বর্গে ও নরকে'

১ "Zeb-un-nissa's Love," 'Modern Review,' January, 1916, p. 34.

২ History of Aurangzib', Vol. III, 3rd edn. (Orient Longman's, Ist Impression), Calcutta, 1972, p. 35.

৩ ঐ, Vol, I, pp. 69—70.

www.pathagar.com

যে-প্রভেদ, ইতিহাসে জেবউন্নিসা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জেবউন্নিসার মধ্যে পার্থক্য সেই পরিমাণ। এবং '...ইহা তাঁহার [বঙ্কিমচন্দ্র] উদ্ভাবনী শক্তির সামান্য প্রয়াসোদ্ভূত ক্রীড়ন মাত্র'।[১] তিনিই সম্ভবত প্রথম ধরতে পারেন বঙ্কিম-ব্যবহৃত মনুচীর ইতিহাস 'প্রমাদপূর্ণ'।[২] জেবউন্নিসার কলঙ্কে মর্মাহত মুসলমান লেখকরা তাঁর কলঙ্ক মোচনের জন্যই সম্ভবত তাঁর সাহিত্য-শিল্পবোধের পরিচয় তুলে ধরেন।[৩]

বঙ্কিম-কল্পিত মুসলিম চরিত্র সমূহের মধ্যে উজ্জ্বলতম চরিত্র মবারক। সে শুধু প্রণয়-দ্বন্দ্বের জন্যেই দ্যুতিবিমণ্ডিত নয়, স্বজাতিদ্রোহিতাজনিত পাপ-বোধের দহনেও প্রদীপ্ত ও জীবন্ত। বঙ্কিম-উপন্যাসে আর একজন স্বজাতি-দ্রোহী পশুপতির উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি। কিন্তু চরিত্রদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো।

পশুপতির স্বজাতি-দ্রোহিতার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক—বাংলার শাসনকর্তা হবার উচ্চাকাঙক্ষা। তদুপরি কৃতকর্মের জন্যে তার কোনো অনুশোচনা নেই। ঔপন্যাসিকের সহানুভূতি থেকেও সে বঞ্চিত। কেবল ধর্মান্তর গ্রহণের বিপদ থেকে পশুপতিকে রক্ষা করেছেন, এইটুকুই তার প্রতি ঔপন্যাসিকের ঘৃণা-মিশ্রিত করুণা। অপরপক্ষে মবারককে জ্যোতিষী বলেছিলো কোনো রাজপুত্রীকে বিয়ে

---

১ "ঐতিহাসিক চিত্রোদ্ধার : জেবুউন্নিসা বেগম," 'প্রদীপ,' আশ্বিন, ১৩০৭, পৃ. ৩১৯।

২ ঐ, পৃ. ৩২০।

৩ অনেক মুসলমান লেখক-সমালোচক জেবউন্নিসার প্রশস্তি মূলক প্রবন্ধ যেমন রচনা করেন, তেমনি তাঁর অনেক কবিতার বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করেন। যথা, মুন্সী আব্দুল আলী, "জেবন্নেসা বেগম" [প্রবন্ধ], 'ইসলাম-প্রচারক,' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০১, উদ্ধৃত আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' পৃ. ৩৭। গোলাম মোস্তফা, "প্রেমের সাধনা" [জেবউনিসার পারশি কবিতার অনুবাদ], 'ব-মু-সা-প', শ্রাবণ, ১৩২৬, পৃ. ৮৯; 'জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা', "গোলাপ ও বুলবুল" [জেবউনিসার কবিতার অংশ বিশেষের অনুবাদ], 'ইসলাম দর্শন,' বৈশাখ, ১৩২৭, পৃ. ২৫; মোহাম্মদ এসহাক বি-এ, "শাহজাদী জেবউন্নিসার কবিতা" [কবিতা]. 'বঙ্গনূর,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭, উদ্ধৃত আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩। এছাড়া হিন্দু সাহিত্যিকগণের রচিত সাহিত্যেও বিদুষী জেবউন্নিসা সম্মানিত স্থান লাভ করেন। যেমন হরিসাধন মুখোপাধ্যায় জেবউন্নিসার কবিতা নিয়ে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন 'দ্রষ্টব্য, "জেবউন্নিসার কবিতা", 'প্রদীপ," পৌষ' ১৩০৭, পৃ. ৩১—৩৬)। কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত ("সৌন্দর্য্য-সূর্য্যের প্রতি" [জেবউন্নিসার পারশি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে রচিত কবিতা], সওগাত,' অগ্রহায়ণ, উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র'; পৃ. ২৫৯।) ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ("মোগল-বিদুষী (জেব-উন্নিসা)" ['সওগাত,' ফাল্গুন, ১৩২৫, পৃ. ২৩৩—৪৩) প্রমুখ সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মেও জেবউন্নিসা একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হিশেবে পরিগণিত হন।

www.pathagar.com

করলে 'আপনার খুব পদোন্নতি হবে'। কিন্তু মবারক পদোন্নতির অভিলাষে স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, বরং এই গর্হিত কর্মের জন্যে সর্বক্ষণ বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করেছে। যুদ্ধে মোগলের বিরুদ্ধে সহায়তা করার জন্যে রাজসিংহ মবারককে পুরস্কৃত করতে চাইলে মবারক বড়ো মর্মভেদী কণ্ঠে বলেছে, "মহারাজ! বে-আদবী মাফ হৌক! আমি মোগল হইয়া মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া হিন্দু রাজ্য স্থাপনের কার্য্য করিয়াছি। আমি সত্যবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছি। আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমি মৃত্যু যন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাইতেছি। আমার আর কোন পুরস্কারে সাধ নাই। অমি কেবল এক পুরস্কার আপনার নিকট ভিক্ষা করি। আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।" তার চেয়েও বড়ো কথা তার জীবনদানকারী মাণিকলালের অনুরোধ 'অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা পাপে' পড়তো, এই কারণেই সে এমন অমার্জনীয় অপরাধ করেছে। তাই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তার স্থির প্রতিজ্ঞা 'এ প্রাণ আর রক্ষা করিব না।' সে রাজসিংহের কাছে এই ভিক্ষাই প্রার্থনা করেছে, "আমাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে আদেশ করুন। অথবা আমাকে বাঁধিয়া বাদশাহের নিকটে পাঠাইয়া দিন, অথবা অনুমতি দিন যে, আমি যে প্রকারে পারি, মোগল সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।' জেবউন্নিসাকেও সে বলেছে, 'আমাকে যুদ্ধে মরিতে হইবে।' মবারক যুদ্ধে নিহত হয় নি—দরিয়া তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। তবে বলা যায়, দরিয়া তাকে হত্যা না করলেও সে যুদ্ধে স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ করতো। তার এই অদম্য মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষা দরিয়া-জেবউন্নিসার প্রেমের মধব্যর্তী আকর্ষণে দিশেহারা হবার জন্যে ততোটুকু নয়—যতোখানি স্বজাতি-দ্রোহিতার জন্যে। শিল্পী বঙ্কিম মুসলিম-দ্বেষী ব'লে নিন্দিত হয়েও মবারকের স্বজাতির প্রতি আনুগত্য ও প্রীতিকে মহামূল্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে পশুপতির মতো স্বজাতি-দ্রোহী ক'রে চিরস্থায়ী কলঙ্কে কলঙ্কিত করে রাখেন নি।

আমরা পূর্বে দেখেছি কোনো কোনো সমালোচক 'আনন্দমঠ'-এর 'বন্দে মাতরম' গীতটি সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। ওই গীতটি সম্পর্কে তাঁদের মূল অভিযোগ ছিলো দু'টি; এক, গীতটিতে পৌত্তলিকতা প্রচারিত হয়েছে; দুই, দেশের বৃহত্তর মুসলমান সমাজ এই গীতে বিয়োজিত হয়েছে।[১] ফলে পরবর্তীকালে

১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই উভয় অভিযোগই অস্বীকার করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। দ্রষ্টব্য, "বন্দেমাতরম্" 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, পৃ. ২৯১-৯২।

www.pathagar.com

যখন 'বন্দে মাতরম' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়, তখন মুসলমান সমাজ এর প্রবল প্রতিবাদ করে।[১] জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত স্মরণীয়। তিনি তৎকালীন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জওহরলালকে এক পত্রে (২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৭) জানান, ওই গানের প্রথমাংশে মাতৃভূমির যে রূপ-মহিমা বর্ণিত হয়েছে, তা তাঁর মতো একেশ্বরবাদীকেও মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে। সুতরাং গানটির প্রথম দুই স্তবক ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হ'লে কোনো সম্প্রদায়ের মনে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। তবে পুরো 'বন্দে মাতরম্' গীতটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হ'লে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে আঘাত করতে পারে।[২] অবশ্য অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ব্রাহ্ম এবং রবীন্দ্র-ভক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ('প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক), যিনি ব্রাহ্মণ হবার পর কোনো দিনও প্রতিমা পূজা করেন নি,[৩] তিনি এবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন 'গানটি পৌত্তলিকতা-ব্যঞ্জক বা পৌত্তলিকতা প্রণোদক' কিংবা 'মুসলমানবিদ্বেষ প্রসূত বা মুসলমান বিদ্বেষ-জনক নহে।'[৪] যাই হোক না কেন 'বন্দে মাতরম' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতকেই-আমরা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। কেননা তৎকালীন তপ্ত মানসিকতায় 'বন্দে মাতরম্' পুরো গানটি মুসলমানদের যথার্থই আঘাত করতো।

'আনন্দমঠ'-এর 'বন্দে মাতরম্' ছাড়াও সন্তান সেনাদের মুখে আরোপিত মুসলমানদের উদ্দেশে কিছু অন্যায় উক্তি এবং অসংযত কটাক্ষও তাদের ক্ষোভের উৎস হয়ে

---

১ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সময় থেকে এই গানটি ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম প্রেরণা হয়ে উঠলেও মুসলমান সমাজ এতে আপত্তি করে। এমন কি কোনো কোনো সার্বজনিক সভায় মুসলমান ছাত্র ও জনতার আপত্তির ফলে এই গান গাওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী,' ৪র্থ খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃ. ১১৩।

২ দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ১১১। "বন্দেমাতরম্" সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি বিরূপ প্রতিক্রিয়া এমন পর্যায়ে যায় যে, কেউ কেউ কবিকে হীন এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে আক্রমণ করেন যা 'শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম' করে। (দ্রষ্টব্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "বন্দেমাতরম্" গান সম্বন্ধে আন্দোলন, 'প্রবাসী', পূর্বে, ২৯১) কেউ কেউ এমনও বলতে কুণ্ঠিত হলেন না যে, রবীন্দ্রনাথ-রচিত জাতীয় সঙ্গীতগুলির...মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নাই', স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার জন্য 'মানুষ সেগুলি হইতে কোন প্রেরণা পায় না।' (দ্রষ্টব্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রনাথ ও স্বাধীনতা," ঐ, পৃ. ২৯৩।)

৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী,' ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১২ (পা. টী.)।

৪ "বন্দেমাতরম্," 'প্রবাসী,' পৃ. ২৯২।

www.pathagar.com

দাঁড়িয়েছিলো। সমালোচক রেজাউল করীম এ-প্রসঙ্গে বলেন, উপন্যাসে বর্ণিত সংলাপ 'অনেক সময় লেখকের নিজের কথা হয় না'। অতএব 'আনন্দমঠ'-এ মুসলমানদের সম্পর্কে যে বিরূপ উক্তি ও অশোভন মন্তব্য করা হয়েছে 'তাহাও লেখকের নিজের কথা নয়'।[১] এ যে কোনো যুক্তি নয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ উপন্যাসের চরিত্রের স্রষ্টা যেমন ঔপন্যাসিক, তার সংলাপ, রাগ-অনুরাগ, গালাগালিরও স্রষ্টা তিনিই, অপর কোনো ব্যক্তি নন। চরিত্রের মধ্যে লেখক নিজের ধ্যান-ধারণা-বক্তব্য-আদর্শ ব্যক্ত করেন। অতএব 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মুসলমানদের প্রতি যে অন্যায়-অসংগত উক্তি উচ্চারিত হয়েছে তার দায় ভার বহন করতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রকেই।

এ বিষয়ে বরং যদুনাথ সরকারের মত বিবেচনীয়। তিনি বলেন, 'আনন্দমঠ'-এ বর্ণিত মুসলমান নবাবী আমলের অরাজকতা, অবিচার সবই 'ঐতিহাসিক সত্য'। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখছেন, ইতিহাস নয়। কাব্য-নাটক প্রভৃতির নিয়ম এই যে, 'প্রত্যেকে চরিত্র নিজ শিক্ষা, মনোবৃত্তি ও তৎকালীন অবস্থার অবিকল অনুযায়ী কথা বলিবে।...' সন্তান সেনারা বাংলার শাসকের অত্যাচার-অবিচারে নিঃশেষিত হয়ে যুদ্ধে আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছে, 'তাহারা মারিতে ও মরিতে প্রস্তুত; সুতরাং তাহাদের পক্ষে রাগারাগি গালাগালি তো স্বাভাবিক ভাষা, এরূপ ভাষাই কাব্য প্রকাশের নিয়ম (dramatic necessity) অনুসারে গ্রন্থকার কল্পনা করিতে বাধ্য।'[২] তিনি তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন : 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে ইমাম হোসেনের শত্রু মদ্যপ এজিদ এবং তার 'কশাই সেনাপতি' শমিরের [সীমার] প্রতি প্রীতিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করা হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য কি এই বঙ্গীয় মুসলমান লেখককে ইসলাম-বিদ্বেষী বলিয়া গণ্য করিব?... তিনি [মশাররফ হোসেন] কাব্যের নিয়ম পালন করিয়াছেন মাত্র; বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন।'[৩] যুক্তি হিসেবে যদুনাথ সরকারের এই বক্তব্য কতোখানি গ্রহণযোগ্য, মুসলমান সমাজ তার বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে রাজি ছিলেন না। মুসলমান-বিদ্বেষই তাদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিলো।

অবশ্য 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে শুধু মুসলিম-বিদ্বেষই নেই, খুঁজে দেখলে মুসলমান সম্রাটদের প্রশংসাও পাওয়া যাবে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এর এক জায়গায় বলছেন, 'সে সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তা সকল ছিল না। নগর সকল হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, মুসলমান সম্রাট নির্মিত অপূর্ব্ব বর্ত্ম দিয়া আসিতে হইত।...'

১ 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ,' পৃ. ৮৭।

২ "বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসলামীয় সমাজ," 'মাসিক বসুমতী,' আষাঢ়, ১৩৪৫, পৃ. ৪৮২।

৩ ঐ, পৃ. ৪৮৩-৮৪।

www.pathagar.com

'সীতারাম' উপন্যাসে কোনো মুসলমান চরিত্র মুখ্য হয়ে ওঠেনি। এ-উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সীতারামের রাজ্য ত্যাগ করে সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী চাঁদ শা ফকিরের মক্কা এবং চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কাশী গমন। তাঁদের দেশ-ত্যাগের কারণ অন্য কিছু নয়, সীতারাম, যে ধর্মভ্রষ্ট, বিবেকশূন্য, প্রজাপালনে নির্লিপ্ত, সর্বোপরি রমণী-মোহে উন্মত্ত, তার রাজ্যে বসবাস করাকে তাঁরা অর্থহীন বিবেচনা করেছেন। রাজা হিন্দু না মুসলমান—এখানে সে প্রশ্ন নয়। তাই চাঁদ শা ফকির এবং চন্দ্রচূড় ঠাকুর উভয়েই রাজ্যচালনায় অমনোযোগী রাজার প্রতি বিতৃষ্ণ। সীতারাম নারীর প্রতি অন্ধ আকর্ষণে রাজকার্যে যখন উদাসীন তখন তার মতো বীর্য, প্রাণৈশ্বর্যে পূর্ণ এবং স্বাধীনচিত্ত রাজার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সীতারামের শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরামর্শ-দাতা চাঁদ শা ফকিরের জবানীতে তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলতে বাধ্য হন 'যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।' চাঁদ শা ফকিরের এই উক্তির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানের হিন্দু-বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নি বা এই উক্তি তার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরোক্ষ প্রকাশ নয়—এ হ'লো প্রজাপালনে অক্ষম যে-কোন শাসক সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চরম ঘৃণা। এখানে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। বরং এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র শুধু অত্যাচারী, প্রজাপালনে উদাসীন মুসলমান রাজশক্তির (যেমন 'আনন্দমঠ'-এ মীর জাফর) বিরুদ্ধেই ক্ষোভ এবং ক্রোধ প্রকাশ করেন নি, অযোগ্য হিন্দু রাজাকেও এইভাবে নিষ্কুণ্ঠচিত্তে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৫

'বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক'—এ কথা শুনে শুনে আমরা এতোই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে মন্তব্যটিকে বিশ্বাস করে নিয়েছি প্রায় কোনো রকম বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই। বিষয়টি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা ক'রে দেখা যেতে পারে।

বলা হয়েছে, 'কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতি সাধন করতে প্রস্তুত থাকে।...ব্যক্তি বিশেষ এ ক্ষেত্রে গৌণ, মুখ্য হলো সম্প্রদায়।

...সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ এক জাতীয় আনুগত্যের গুরুত্ব বেশী'।[১]

১ বদরুদ্দীন উমর, 'সাম্প্রদায়িকতা,' ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ৯।

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত সূত্রটি যদি আমরা স্বীকার ক'রে নি, তাহ'লে এই নিরীখে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক ব'লে অভিযুক্ত করতে বাধা থাকে না। প্রথমত, আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনায় এমন অনেক তথ্যের উল্লেখ করেছি, যেখানে দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্র 'অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায়' অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের 'বিরুদ্ধাচরণ' করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি 'নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ এক জাতীয় আনুগত্যের' এতো বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন যে জনৈক সমালোচক তাকে এ জন্য 'সাম্প্রদায়িক' না ব'লেও 'প্রতিভাবান হিসাবে সেটি তার একটি অপরাধ' ব'লে গণ্য না করে পারেন নি।[১] তার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উল্লেখ ক'রে অপর একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে 'হিন্দু জাতীয়তার কথা' জেগেছিলো, '...সেইজন্যই তিনি মুসলমানের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। তাহার লেখার মধ্যে জাতীয় (National) ভাবের অপেক্ষা হিন্দু-জাতীয়তার ভাব বেশী ফুটিয়াছে। সেই জন্য তিনি হিন্দুদের নিকট অধিক প্রিয় হইয়াছেন এবং দেশে হিন্দু জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন।'[২]

তবু নিরপেক্ষ বিচারের প্রয়োজনে এই প্রসঙ্গে দু'একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে : বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ শ্রেণীর মুসলমানকে আক্রমণ করেছেন? কোন্ কালের মুসলমান তার আক্রমণের লক্ষ্য? সমগ্র মুসলমান জাতির কি তিনি বিরুদ্ধাচরণ করেছেন?

প্রথমটির উত্তরে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় তিনি মূলতই মোগল শাসকদের আক্রমণ করেছেন। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের বক্তব্য উদ্ধৃত করি : 'পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্ন হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না।...পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায়, যে পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্তি নিবিয়া যায়। পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালির মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়, এই সময়েই আবির্ভূত,...এই সময়েই

১ কাজী আবদুল ওদুদ, "বঙ্কিমচন্দ্র" 'শাশ্বত বঙ্গ,' পৃ. ১২৭।

২ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন,' কলিকাতা, ১৯২৫, পৃ. ৩৮। সমালোচক জে.সি. ঘোষ ও অনুরূপ মত পোষণ করেন। দ্রষ্টব্য, 'Bengali Literature,' London, 1948, p. 161. অধ্যাপক টি. ডব্লিউ ক্লার্ক বলেন, '...In him [Bankimchandra] nationalism and Hinduism merged as one.'—"Chatterji, Bankimchandra," 'Encyclopaedia Britannica,' Vol. V, Chicago etc., 1966. p. 345.

www.pathagar.com

চৈতন্যদেব ;...অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ... এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালির মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূর্বে বা পরে আর কখনও হয় নাই।

...যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন।... মোগল পাঠানের মধ্যে, আমরা মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাহিয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র।[১]... তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'মোগল জয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগ মাত্র হইয়াছিল।'[২]

মোগল ও পাঠান উভয়েই মুসলমান এবং বিদেশাগত। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে তিনি পাঠানদের 'মিত্র' বলে স্বীকার করেছেন। এবং মিত্রতার কারণও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।[৩] এই সঙ্গে তাঁর বহু বিতর্কিত ইংরেজ-প্রীতির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর ইংরেজ প্রীতির উৎস এদেশীয় শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইংরেজের পৃষ্ঠপোষণের মধ্যে নিহিত। তিনি বলেছেন ইংরেজের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য, কেননা 'ইংরেজ আমাদিগকে নতুন কথা শিখাইতেছে'।[৪] 'আনন্দ-মঠ'-এ চিকিৎসক মুসলমানের বদলে ইংরেজকে রাজা করতে চেয়েছে, কারণ ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে পণ্ডিত। এদেশীয় মানুষ তদের কাছ থেকে 'বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে'।[৫] অর্থাৎ স্বজাতির কল্যাণের জন্যে প্রয়োজন হ'লে বিজাতীয় শাসকের কাছ থেকে তাদের সদ্‌গুণগুলি গ্রহণ করতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন। মোগল-পাঠান-ইংরেজ—এরা সবাই বিজাতী, বিদেশাগত এবং পররাজ্য অপহারক। কিন্তু তিনি পাঠান ও ইংরেজ জাতিকে সমর্থন করেছিলেন

১ "বাঙ্গালির ইতিহাস", 'বঙ্গদর্শন', মাঘ, ১২৮১, পৃ. ৪৫১-৫২।

২ "বাঙ্গালির ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা," ঐ, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭, পৃ. ৩৬৯।

৩ শুধু বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির সহায়তাই নয়, ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, 'পাঠানেরা মোগলদের বাধা দিতে হিন্দুর সঙ্গে সমানে' দাঁড়িয়েছিলো। এমন কি মোগলদের সঙ্গে প্রতাপসিংহের যুদ্ধে প্রতাপের পক্ষে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সেনার সংখ্যা কম ছিলো না।—'হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা', বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ১৯।

৪ "ভারতকলঙ্ক," 'বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ, ১২৭৯, পৃ. ১৭।

৫ 'আনন্দমঠ', পৃ. ৭৮৭।

www.pathagar.com

একারণে যে পাঠান আমলে বাঙ্গালির মানসিক পরিচর্যা সাধিত হয়েছিলো এবং ইংরেজের কাছে এদেশীয় লোকেরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার শিক্ষা পেয়েছিলো। অপরপক্ষে মোগলেরা বাংলার সম্পদ ও অর্থ নিয়ে দিল্লীতে চোখ ঝলসানো অট্টালিকা নির্মাণে এবং অবিবেকী ব্যসনে মগ্ন ছিলো। ফলে মোগলের প্রতি বঙ্কিমের সমর্থনের বদলে ক্রোধ ছিলো অসীম।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, মুসলমান শাসনামলের সুদূর প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত উপন্যাসে চিত্রিত মুসলমান সম্প্রদায়কে বঙ্কিমচন্দ্র আক্রমণ করেছেন, তাঁর সমকালীন মুসলমান সমাজ বা কোনো ব্যক্তিকে নয়। সহজেই লক্ষণীয়, সমকালীন সমাজ নিয়ে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে কোনো মুসলমান চরিত্র বা প্রসঙ্গ নেই। অভিযোগ উঠতে পারে তিনি এই সমাজ ও তার অন্তর্গত মানুষের প্রতি নির্লিপ্ত অথবা অপ্রসন্ন ছিলেন বলেই তাদেরকে স্বকালের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে উপেক্ষা করেছেন। এই অভিযোগকে অসঙ্গত ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, তিনি সমকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ের সমব্যথী ছিলেন তার প্রমাণ সামাজিক উপন্যাসে না থাকলেও, প্রবন্ধে আছে। স্বজাতির শিক্ষা-দীক্ষায় ইংরেজের অপরিশোধ্য ঋণের কথা স্বীকার করেও তিনি ইংরেজের 'শাসন কৌশলে' এদেশে মঙ্গলের 'ছড়াছড়ি'র প্রতি কটাক্ষ ক'রে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন '... আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে, কাহার এত মঙ্গল? ঐ যে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্তিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চসিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাতা [মাথা] ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে ... ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে ...।'[১]

মুসলমান সমাজ এদেশেরই একটি অবিচ্ছেদ্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠি—যবন এবং ইংরেজ শাসকের হাতে হিন্দুর সাথে তারাও নিপীড়িত ও শোষিত হয়েছে, হয়েছে পরস্পরের দুঃখের অংশী। তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সেখানে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি। হাসিম শেখ আর রমা কৈবর্ত্তকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা নিগৃহীত বিত্তহীন প্রজাশ্রেণীর দুই প্রতিনিধি হিসাবেই দেখেছেন। তাই '...রমা কৈবর্ত্তের জন্য বঙ্কিমের সহানুভূতি যতটুকু দরদ, হাসিম শেখের জন্যও ততটুকু।'[২]

১ "বঙ্গদেশের কৃষক," 'বঙ্গদর্শন,' ভাদ্র, ১২৭৯, পৃ. ২২৭।

২ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, "সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র," (ঢাকা শতবার্ষিক সভাতে পঠিত), উদ্ধৃত, রেজাউল করীম, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ,' "পরিশিষ্ট," পৃ. ১৪১।

www.pathagar.com

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সর্বকালিক মুসলমান সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমান জাতিকে কখনোই আক্রমণ করেন নি। তিনি যদি অন্তরে সাম্প্রদায়িক মনোভাব লালন করতেন তাহ'লে মুসলমান প্রজার কথা এমন মমতার সঙ্গে উল্লেখ করতেন না, বরং সমকালীন সমাজের পটভূমিতে রচিত সামাজিক উপন্যাসগুলিতে সহজেই মুসলমান চরিত্র এনে তাদের হেয় এবং বিকৃত করতে পারতেন।

অবশ্য বিভিন্ন প্রবন্ধেও মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর আপত্তিকর মন্তব্য দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন, বিদেশীদের রচিত পক্ষপাতদুষ্ট ভারতবর্ষের 'ইতিহাস'-এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, কেবলমাত্র আত্মগরিমা-পরবশ, পরধর্মদ্বেষী সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না।'[১] এই একই প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র একই বিরূপ মন্তব্য করেছেন, 'আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালি নয়।'[২] মুসলমানদের সম্পর্কে তার এজাতীয় উক্তি হয়তো আরো খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সবগুলিরই লক্ষ্য সুদূর অতীতের মুসলমান ঐতিহাসিক—যারা কোনো না কোনোভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল স্বাজাত্যাভিমানে আঘাত করেছেন। শুধু মুসলমান ঐতিহাসিক নয় বিদেশী যে-কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষেই যে বাংলার নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়, একথা তিনি সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করতেন, 'মৃণালিনী' উপন্যাস আলোচনা-প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করেছি। তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো, তাহ'লো বঙ্কিম মুসলমানদের প্রতি অনুচিত মন্তব্য করেছেন, ক্ষেত্র বিশেষে হয় তো অন্যায় আক্রমণে বিদ্ধ করেছেন; কিন্তু ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কোথাও কটাক্ষ বা বিরূপ মন্তব্য করেন নি। বরং তিনি বলেছেন হিন্দু ধর্ম ছাড়া '...পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং খৃষ্ট ধর্ম...' এই তিনটি ধর্ম ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মকে জয় করার চেষ্টা করেছিলো।[৩] তিনি এখানে ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম ব'লে উল্লেখ করেছেন।

---

১ "ভারত-কলঙ্ক," 'বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ, ১২৭৯, পৃ. ৮।

২ "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা," ঐ, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭, পৃ. ৩৬৩।

৩ "হিন্দু ধর্ম," 'প্রচার,' শ্রাবণ, ১২৯১, পৃ. ২৩।

www.pathagar.com

কিন্তু সবচেয়ে যে-টি মূল্যবান কথা, বিংশ শতাব্দীতে এসেও যখন বাঙ্গালী মুসলমান তাঁদের মাতৃভাষা কি হবে এ নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত [১] এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতে দ্বিধাগ্রস্ত—বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত তার পঁচিশ বৎসর আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, বাঙ্গালী মুসলমানের বাংলাভাষা-চর্চার মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের বৃহত্তর ঐক্যের মূলমন্ত্র নিহিত। মীর মশাররফ হোসেনের একটি গ্রন্থ সমালোচনাকালে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন '...তাঁহার [মশাররফ হোসেন] রচনার ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা, হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানে এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা শূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে, যে তাঁহারা ভিন্ন শ্রেণীর, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দ্দু ফারসী চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।'[২]

---

১ এই বিতর্কের মধ্যে 'তৃতীয় সম্মিলন'-এ সভাপতির অভিভাষণে মোহাম্মদ আকরাম খাঁ বললেন '...দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। "বাঙ্গালী মুছলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দ্দু, না বাঙ্গালা?" এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত।...বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।'—'ব-মু-সা-প', মাঘ, ১৩২৫, পৃ. ২৯৬। বাংলা ভাষার পক্ষে আরো বলেন আবদুল মালেক চৌধুরী, "বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান", 'আল-এসলাম', আশ্বিন, ১৩২৩, পৃ. ৩২৯-৩৬; সৈয়দ এমদাদ আলী, "বঙ্গভাষা ও মুসলমান", 'ব-মু-সা-প,' শ্রাবণ, ১৩২৫, পৃ. ৭৯-৮৭ ও অন্যান্য। বিপক্ষে বলা হ'লো, আরবী ভাব ও শব্দমিশ্রিত বাংলাই হবে বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য উপযোগী ভাষা (দ্রষ্টব্য, খাদেমুল এসলাম বঙ্গবাসী, "বাঙ্গালীর মাতৃভাষা," 'আল্-এস্‌লাম', অগ্রহায়ণ, ১৩২২, পৃ. ৪৬৪-৬৫ ও মোজাফ্‌ফর আহমদ, "উর্দ্দু ভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান", ঐ, শ্রাবণ, ১৩২৪, পৃ. ২০৭-১১।)। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রায় দিলেন, '...আরবী চিরকাল আমাদের জাতীয় ভাষা ছিল এবং থাকিবে, উহাকে বিদেশীয় নূতন আমদানী বলা কখনই সঙ্গত হইবে না।'—"বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য," 'ব-মু-সা-প,' মাঘ, ১৩২৫, পৃ. ৪৬৩। ভাষা সংক্রান্ত বাক্-বিতর্কের বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য, আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র', "ভূমিকা," পৃ. [৪৫]-[৪৯] এবং মুস্তফা নূরউল ইসলাম, 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত', পৃ. ৩১৩-৪৩।

২ "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা," মীর মসররফ হুসেন প্রণীত "গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু," 'বঙ্গদর্শন', পৌষ, ১২৮০, পৃ. ৪৩১-৩২।

www.pathagar.com

পূর্বে উল্লিখিত তথ্য ও মন্তব্য সমূহের সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতা-বিষয়ক দীর্ঘ বিতর্কের অবসান হবে, এমন কথা বলি না। তবে এর দ্বারা বিষয়টির পুনর্বিবেচনা বা পুনর্ভাবনা হয়তো সম্ভব।

পরিশেষে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি এক সম্প্রদায়ের অন্ধ পূজা এবং আর এক সম্প্রদায়ের নির্বিচার ঘৃণা সম্পর্কে কাজী আব্দুল ওদুদের ১৯৩৮ সালের একটি মন্তব্য স্মরণ-যোগ্য : তিনি বলেন, 'শোনা যায় দার্শনিক স্পিনোজার কবরের উপরে ইহুদি আর খৃষ্টান দুই সম্প্রদায়ের লোক দুই-এক শতাব্দীকাল ধ'রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কালে তাঁদের উভয়ের যোগ্য সমাদর থেকে এই জ্ঞানী বঞ্চিত হন নি। বঙ্কিম চন্দ্রেরও তেম্‌নি সুদিন আস্‌বে কিনা সেকথা আজ ভাবা মন্দ নয়।...

...আমাদের বিশ্বাস, কালে তাঁর পূজারী আর বিদ্বেষী দুই দলই লুপ্ত হবে, কেননা দুয়েরই উপজীব্য অজ্ঞানতা—সত্য হবে তাঁর প্রতিভার জন্য তাঁর প্রতি তাঁর সাহিত্যের পাঠকবর্গের শ্রদ্ধা। প্রতিভাবান অভ্রান্ত নন, একথা তাঁরা বুঝবেন, সঙ্গে সঙ্গে একথাও তারা বুঝবেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রতিভাবান্ পরম বরণীয়—তার ত্রুটি-বিচ্যুতিও একান্ত অর্থহীন নয়।'[১]

১ "বঙ্কিমচন্দ্র", 'শাশ্বত বঙ্গ', পৃ. ১২৬—৩০।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক উপকরণ

১. পত্র-পত্রিকা

আর্য্যদর্শন (১২৮৪, ১২৮৫ ও ১২৮৮)
আল্-এসলাম (১৩২২—১৩২৫)
ইসলাম দর্শন (১৩২৭)
ইসলাম প্রচারক (১৯০৩, ১৯০৫ ও ১৩২২)
ছোলতান (১৩৩০)
জ্ঞানাঙ্কুর (১২৮৩)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (১৩৮৮)
চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ (১৩০১)
দাসী (১৮৯৫)
নবনূর (১৩১০—১৩১৩)
নব্যভারত (১২৯০)
পরিক্রম (১৩৬৯)
পাক্ষিকসমালোচক (১২৯১)
প্রচার (১২৯১, ১২৯৩—৯৫)
প্রদীপ (১৩০৫—১৩০৭)
প্রবাসী (১৩২২, ১৩২৫, ১৩৪৪)
বঙ্গদর্শন (১২৭৯—১২৮১, ১২৮৭, ১৩০৯, ১৩২৬)
বঙ্গীয়-মুসলিম-সাহিত্য পত্রিকা (১৩২৫—১৩২৬, ১৩২৮, ১৩৩০)
বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা (১৩৮৩-৮৪, ১৩৮৪)
বামা বোধিনী পত্রিকা (১২৯০)
ভারতী (১৩০২, ১৩১৮)
মানসী (১৩২১)
মাসিক বসুমতী (১৩৪৫)
মাসিক মোহাম্মদী (১৩৩৫)
মাসিক সমালোচক (১২৮৬)
সওগাত (১৩২৫, ১৩৩৫)
সাধনা (১৩০১)
সাহিত্য (১৩০৯)
সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা (১৩০২)
Modern Review, (1916)

www.pathagar.com

২. ব্যবহৃত উপন্যাস

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (স.) আনন্দমঠ, তৃ, স, (শতবার্ষিক সংস্করণ) কলিকাতা, ১৩৬৪। দুর্গেশনন্দিনী, শতবার্ষিক সংস্করণ, কলিকাতা। দেবী চৌধুরাণী, প. স. কলিকাতা, ১৩৬২। রাজসিংহ, তৃ. মু. কলিকাতা, ১৩৫৯। সীতারাম, তৃ. স. কলিকাতা, ১৩৬২। যোগেশচন্দ্র বাগল (স.), বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প. প্র. কলিকাতা, ১৩৭৬।

খ. অন্যান্য

আর্জুমান্দ আলী, প্রেম-দর্পণ, মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম (স). তৃ. স. ঢাকা-রাজশাহী, ১৯৬৫।
ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শিরাজী রচনাবলী, উপন্যাস খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৭।
উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, পৃথ্বীরাজ, কলিকাতা, ১৮৮০।
কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী, রোশিনারা, ১৮৬৯।
ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, জ্ঞানভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯২৪।
দামোদর মুখোপাধ্যায়, প্রতাপসিংহ, কলিকাতা, ১৮৮৪।
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী (স.) ভূদেব-রচনাসম্ভার, কলিকাতা, ১৩৭৫।
মতীয়র রহমান, মতীয়র রহমান গ্রন্থাবলী, ঢাকা, ১৯৬০।
মোহাম্মদ নজিবর রহমান, চাঁদ তারা বা হাসান গঙ্গাবাহমনি, ৮. স. কলিকাতা, ১৩৫৮।
যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সুন্দরী, কলিকাতা, ১৯০১।
রমেশচন্দ্র দত্ত, রমেশ রচনাবলী, প্রমথনাথ বিশী (স.), কলিকাতা, ১৩৭৯।
স্বর্ণকুমারী দেবী, দীপ-নির্বাণ, কলিকাতা, ১৮৭৬।
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কমলাদেবী, কলিকাতা, ১৮৮৬।
হারাণচন্দ্র রক্ষিত, বঙ্গের শেষ বীর, কলিকাতা, ১৮৯৭।

গ. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত উপন্যাস,

শেখ হবিবর রহমান, "আলমগীর," 'আল্-এস্‌লাম', বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩২৫।

৩. নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বপ্নময়ী, কলিকাতা, ১৮৭৮।

৪. কাব্য ও কবিতা

জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা, 'গোলাপ ও বুলবুল' [জেবউন্নিসার কবিতার অংশ বিশেষের অনুবাদ]।
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ভারত-বন্দিনী, কলিকাতা, ১২৮২।
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মিনী উপাখ্যান, কলিকাতা, ১৮৫৮।

৫. সহায়ক সমালোচনা গ্রন্থ

অপর্ণা প্রসাদ সেন গুপ্ত, বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলিকাতা, ১৩৬৭।
অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম-মানস চ, মু, কলিকাতা, ১৯৬৬।

www.pathagar.com

আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪।
মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ঢাকা, ১৯৬৯।
স্বরূপের সন্ধানে, ঢাকা, ১৯৭৬।
কাজী আব্দুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৫৮।
কাজী আব্দুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, দ্বি, স. ঢাকা, ১৯৬৯।
জীবেন্দ্র সিংহ রায়, সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, ২য় পর্ব, কলিকাতা, ১৩৬৮।
পূর্ণচন্দ্র বসু, কাব্যসুন্দরী, কলিকাতা, ১২৮৭।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯২৫।
রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৭১।
প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, কলিকাতা ১৩৬৮।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল (স.), বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, চ. মু. কলিকাতা, ১৩৭৬।
বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা, ১৯৬৬।
বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলিকাতা, ১৩৬৯।
ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ২য় পর্যায়, কলিকাতা, ১৯৫৭।
মুনীর চৌধুরী, ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়, ঢাকা, ১৯৬৩।
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা, ১৯৭৭।
মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্কিম-বরণ, কলিকাতা, ১৩৫৬।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক সাহিত্য', রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৫৮।
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বি. স. কলিকাতা, ১৮৭৫।
রেজাউল করীম, বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, কলিকাতা, (১৯৪৪)।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ৬ষ্ঠ সম্ভার, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, (এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি. সংস্করণ), কলিকাতা (সন বিহীন)।
শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯৫৭।
শ্রী কালীপদ সেন, 'চন্দ্রশেখর', বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৩৬০।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, চ. ম. কলিকাতা, ১৩৬৯ ও ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮০।
সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, চ. স কলিকাতা, ১৯৬৯।
সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৭০।
সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৬৮।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, কলিকাতা, ১৮৮৪ (শকাব্দ)।
Humayun Kabir, The Bengali Novel, Calcutta, 1968.
J. C. Ghosh, Bengali literature, London, 1948.

www.pathagar.com

Jayanta Kumar Das Gupta, A Critical Study of the life and Novels of Bankim Chandra, Calcutta, 1937.

T.W. Clark, 'Chatterji, Bankimchandra', Encylopaedea Britannica, Vol. 5, Chicago etc., 1966.

৬. ইতিহাস

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, মীর কাসিম, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, (সন বিহীন)।

ক্ষিতিমোহন সেন, হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৫৬।

নীলমণি বসাক, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রথম ভাগ, হিন্দু সাম্রাজ্য কাল) কলিকাতা, ১৮৫৮।

নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), কলিকাতা, ১৩৬৯।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, প্রথন নবভারত সংস্করণ, ১৯৭১।

সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, (সন বিহীন)।

Abul Fazl, Ain-i-Akbari, Vol. I, H. Blochmaun (Tr.), Calcutta, 1873.

Al-Badaoni, Muntakhabu-t Tawarikh, W.H. Lowe (ed.), Vol. II, Patna, 1973.

Beni Prasad, History of Jahangir, Allahabad, 1962.

C. Stewart, History of Bengal, 1813.

Francois Bernier, Travels in the Mogul Empire (A.D. 1656—1668), A revised and improved edn., based upon Irving Brock's translation, by Archibald Constable, Westminister, MDCCCXCI.

Jadunath Sarkar, History of Aurangzib, Vol, I, Calcutta, 1912.
History of Aurangzib, Vol. III, Calcutta, 1921, and 3rd edn, (1st Orient Longman's Impression), Calcutta, 1972.
Short History of Aurangzib, Calcutta, 1962.
Mughal Administration, Calcutta, 1952.
(ed.) History of Bengal, Vol. II, Dacca, 1948.

J.C. Sinha, Economic Annals of Bengal, London, 1921.

J. Westland, A Report on the District of Jessore, Calcutta, 1874.

J.M. Ghosh; Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal, Calcutta, 1930.

James Mill, History of British India, Vol. III, 5th edn., London, M.DCCC. LVIII.

James Tod, Annals and Antiquities of Rajsthan, London, 1950.

Manucci, Storia do Mogor, Vol. I and II, (Tr.) W. Irvine, London, 1907 and Reprint, Calcutta, 1895, 1966.

Minhaj-ud-din, Tabakat-i-Nasiri, Vol. I, (Tr.) Major H.G. Raverty, London, 1881.

Moulavi Abdus Salam, Riyazu-s-Salatin, Calcutta, 1902.

Muhammad Hasim Khafi Khan, Muntakhabu-L-Lubab, (ed.) John Dowson, 3rd edn., Calcutta, 1960.

www.pathagar.com

N.K. Sinha, The Economic History of Bengal, Vol. II, Calcutta, 1962.

Orme, Historical Fragments of the Mogul Empire, London, MDCCCV.

P.E. Roberts, History of British India, 3rd edn., London, 1967.

R.C. Majumdar, (ed.) History of Bengal, Vol. I, Dacca, 1943.

Shaik Ghulam Maqsud Hilali, Islamic attitute towards non-Muslims, Rajshahi, 1952.

Sir W. Haig (ed.), The Cambridge History of India, Vol. III, Cambridge, 1928.

Stanely Lane Poole, Rulers of India, Aurangzib, Delhi, (No date).

Syed Gholam Hossein, Seir Mutaqherin, Calcutta, 1787.

Sri Ram Sharma, The Religious Policy of the Mughal Emperors, Bombay, 1962.

Thomas and Garratt, Rise and Fulfilment of British India, Allahabad, 1958.

V.A. Smith, Oxford History of India, London, 1919 and 3rd edn., Oxford, 1961
Akbar The Great Mogul, 3rd Imp. London, 1926.

W.W. Hunter, The Annals of Rural Bengal, Vol. I, London, 1871.

৭. পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

আর্য্য দর্শন

অজ্ঞাত, 'দলনী বেগম', আষাঢ়, ১২৮৫।

পূর্ণচন্দ্র বসু, 'আয়েষা', ঐ, ১২৮৮।

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিষবৃক্ষ', মাঘ, ১২৮৪।

আল্-এস্‌লাম

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, 'সাহিত্য গুরুর বাঙ্গালী প্রীতি,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

আবুল মালেক চৌধুরী, 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান,' বৈশাখ, ১৩২২।
'বঙ্গ সাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান, 'আশ্বিন, ১৩২৩।

এস, এম, আকরাম উদ্দীন, 'বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান', পৌষ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

এসলামাবাদী, 'আওরঙ্গজেব', অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৩।
'মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার', আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ১৩২২।

বেগম সৌদামিনী খাতুন, 'আওরঙ্গজেব', শ্রাবণ, ১৩২৫।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ, 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান', ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৩।

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'আমাদের (সাহিত্যকে) দরিদ্রতা', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

সিরাজী, 'সাহিতে ও জাতীয় জীবন', আষাঢ়, ১৩২৩।

ইসলাম দর্শন

মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান', ফাল্গুন, ১৩২৭।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারক

একিনউদ্দীন আহমদ, 'নব্য ভারতে মুসলমান চিত্র', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

ওসমান আলী, বি, এল, 'সম্রাট আওরঙ্গজেব ও সত্তরামী বিদ্রোহ', মার্চ্চ-এপ্রিল, ১৯০৩।

মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ, 'সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্ত্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকার ও মহাবীর আব্দুর রাজ্জাক লারীর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি; নভেম্বর, ১৯০৪, ফেব্রুয়ারী, জুন, ১৯০৫।

শেখ ফজলল করিম, 'উন্নতির উপায় কি?', জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১০।

ছোলতান

সিরাজী, 'ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা ও মোছলমানের কর্ত্তব্য', ভাদ্র, ১৩৩০।

জ্ঞানাঙ্কুর

'প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা', জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৩।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সারোয়ার জাহান, 'উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনা ও বঙ্কিমচন্দ্র', আষাঢ়, ১৩৮৮।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিকাশ ও সমীরণ

অজ্ঞাত, 'ষ্টারে চন্দ্রশেখর', কার্ত্তিক, ১৩০১।

দাসী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', জুলাই, ১৮৯৫।

নবনূর

আফতাবউদ্দিন আহমদ, 'হিন্দু লেখক ও মুসলমান সমাজ' আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩১০।

ইমদাদুল হক, 'গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য', আশ্বিন, ১৩১২।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী, 'সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন, জ্যৈষ্ঠ', ১৩১০।

এস এম, আহাদ, 'সম্রাট আওরঙ্গজেব', অগ্রহায়ণ, মাঘ, ১৩১০, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩১১।

কেনচিৎ মর্ম্মাহতেন হিতকামিনা, 'মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার', ভাদ্র, ১৩১০।

ডাক্তার হবিবর রহমান, 'ওসমান ও জগৎসিংহ', বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।

তসলিমউদ্দিন আহ্‌মদ, 'আওরঙ্গজেবের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ', আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩।

নির্মলচন্দ্র ঘোষ, 'গোটা দুই কথা' মাঘ, ১৩১০।

ফজলর রহমান খাঁ, 'মহাশ্মশান কাব্য' মাঘ, ১৩১২।

মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা, 'বঙ্গসাহিত্য হিন্দু মুসলমান', কার্ত্তিক, ১৩১১।

(সম্পাদক) ''দুর্গাদাসে'' আওরঙ্গজেব', পৌষ, ১৩১৩।

সৈয়দ এমদাদ আলী, 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান,' পৌষ, ১৩১৩।

নব্যভারত

লোকনাথ চক্রবর্ত্তী, 'চন্দ্রশেখর', অগ্রহায়ণ, ১২৯০।

পরিক্রম

আনিসুজ্জামান, 'জাতীয়তাবাদ ও আমাদের সাহিত্য', চৈত্র, ১৩৬৯।

www.pathagar.com

পাক্ষিক সমালোচক

অজ্ঞাত, 'সাহিত্য সমালোচনা' মাঘ, (২য় খণ্ড), ১২৯১।

প্রচার

চন্দ্রনাথ বসু, 'দুইটি হিন্দুপত্নী', ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৯৫।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'হিন্দুধর্ম', শ্রাবণ, ১২৯১।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনী', ৩য় খণ্ড (মাসের উল্লেখ নেই), ১২৯৩-৯৪।

প্রদীপ

কালীনাথ দত্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র', আষাঢ়, ১৩০৬।
চন্দ্রনাথ বসু, 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র', আষাঢ়, ১৩০৫।
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'ঐতিহাসিক চিত্রোদ্ধার', আশ্বিন, ১৩০৭।

প্রবাসী

কাজী আবদুল ওদুদ, 'মুসলমান সাহিত্যিক', পৌষ ১৩২৫।
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'বন্দে মাতরম্,' ''বন্দেমাতরম্'' গান সম্বন্ধে আন্দোলন, 'রবীন্দ্রনাথ ও স্বাধীনতা', অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের নাম', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

বঙ্গদর্শন

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'যবন' ভাদ্র, ১৩০৯।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস, মাঘ, ১২৮১।
'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', অগ্রহায়ণ, ১২৮৭।
'ভারত কলঙ্ক', বৈশাখ, ১২৭৯।
'বঙ্গদেশের কৃষক', ভাদ্র, ১২৭৯।
'মীর মসররফ হুসেন প্রণীত গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু' [সমালোচনা], পৌষ, ১২৮০।
'বাঙ্গালির বাহু বল', শ্রাবণ, ১২৮১।
ঐতিহাসিক ভ্রম, ভাদ্র, ১২৮১।
লোকনাথ চক্রবর্তী, 'ভ্রমর প্রসঙ্গ', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বাঙ্গালা সাহিত্য। বর্ত্তমান শতাব্দীর,' ফাল্গুন, ১২৮৭।

বঙ্গীয়-মুসলিম-সাহিত্য-পত্রিকা

আহমদ মিয়া, 'মিলনের উপায়', শ্রাবণ, ১৩২৬।
এম, আনসারী, 'সাহিত্য বৈচিত্র্য', কার্ত্তিক, ১৩২৮।
গোলাম মোস্তফা, '(আনোয়ারা) সমালোচনা,' বৈশাখ, ১৩২৬।
মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, 'তৃতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন'-এ সভাপতির অভিভাষণ,' মাঘ, ১৩২৫।
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য', মাঘ, ১৩২৫।

www.pathagar.com

সফিয়া খাতুন, 'বাংলা সাহিত্যে অনুদারতা', মাঘ, ১৩৩০।
সৈয়দ এমদাদ আলী, 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান', শ্রাবণ, ১৩২৫।

বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা

সারোয়ার জাহান, 'বঙ্কিম উপন্যাসের উপসংহার', মাঘ—আষাঢ়, ১৩৮৩—৮৪।
'প্রতিক্রিয়ার ফসল : শিরাজীর উপন্যাস', ১৩৮৪।

বামাবোধিনী পত্রিকা

অজ্ঞাত, 'নবেলের পাঠোপযোগিতা', শ্রাবণ, ১২৯০।

ভারতী

কিশোরী মোহন রায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান', বৈশাখ, ১৩০২।
হেমেন্দ্র কুমার রায়, 'বঙ্কিম বাবুর কথা (২)', কার্ত্তিক, ১৩১৮।

মানসী

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও বঙ্কিমচন্দ্র', কার্ত্তিক, ১৩২১।

মাসিক বসুমতী

যদুনাথ সরকার, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসলামীয় সমাজ', আষাঢ়, ১৩৪৫।

মাসিক মোহাম্মদী

রেজাউল করিম, 'যিজয়া', আষাঢ়, ১৩৩৫।

মাসিক সমালোচক

অজ্ঞাত, 'রেবেকা ও আয়েষা', ১ম খণ্ড [মাসের উল্লেখ নেই], ১২৮৬।

সওগাত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মোগল বিদুষী, (জেব-উন্নিসা)', ফাল্গুন, ১৩২৫।
মতিনউদ্দীন আহমদ, 'যবন', ভাদ্র, ১৩৩৫।

সাধনা

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, 'বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ', শ্রাবণ, ১৩০১।

সাহিত্য

হেমচন্দ্র বসু, 'বঙ্কিমচন্দ্র', ফাল্গুন, ১৩০৯।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা

বীরেশ্বর পাঁড়ে, 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ', বৈশাখ, ১৩০২।

Modern Review

Jadunath Sarkar, 'Zeb-un-nissa's love affair', January, 1916

www.pathagar.com

নবীশ্রেষ্ঠ

[কুরআন-তত্ত্বঃ তৃতীয় খণ্ড]

মোবিন্নুদ্দিন আহমদ জাহাঁগীর-নগরী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষে
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

www.pathagar.com

নবীশ্রেষ্ঠ

[কোরআন-তত্ত্ব : তৃতীয় খণ্ড]

মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঁগীর-নগরী

ই.সা.কে.ঢা. প্রকাশনা : ৮৯

ই.ফা.বা. প্রকাশনা : ৪৩৭

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩ বিষয় : মুহম্মদ (সাঃ)

প্রকাশক :

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষে

অধ্যাপক এ. এস. এম. ওমর আলী

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ

৪০/এ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-২

প্রথম সংস্করণ : ১৯২৫

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৩১

তৃতীয় সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৮১

মুহাররাম, ১৪০২

কার্তিক, ১৩৮৮

প্রচ্ছদ : এম. এ. কাইয়ুম

মুদ্রক :

মহীউদ্দীন আহমদ

জাতীয় মুদ্রণ

১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১

বাঁধাইকার :

ফেমাস বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

২৩, পূর্ণচন্দ্র ব্যানার্জী লেন

(সিংটোলা) ঢাকা-১

মূল্য : আটত্রিশ টাকা

NABEE-SHRESHTHA : [Prophet, the Greatest : Biography of the Holy Prophet (sm.)] : written by Mobinuddin Ahmad Jahangir-Nagaree in Bengali and published by Islamic Cultural Centre, Dacca Division, Dacca-2, on behalf of Islamic Foundation, Bangladesh. Third Edition : September 1981.

Price : Tk. 38·00 (Inland) US $ 5·00 (Foreign)

ICCDP 368/81-82/3250/2. 11. 1981

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

মেফ্‌তাহুল ফোরকান বা কোরআন-তত্ত্ব নামক পুস্তকটির তৃতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে, দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা থেকে ছাপা হয় ১৯৩১ সনে। পুস্তকটি মোট ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিলো। পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে সেকালের পণ্ডিতজন এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। আসলে বাংলা ভাষায় এ জাতীয় পুস্তক তখন আর একটিও ছিলো না এবং পরবর্তীকালেও যে এর সমমানের কোনো পুস্তক বাংলায় রচিত হয়েছে তেমন প্রমাণ বিরল।

লেখক মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঁগীর-নগরী আল-কুরআনের ভিত্তিতে ইসলামের একটা পূর্ণ পরিচয় এই গ্রন্থে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এ প্রয়াসে তাঁর সাফল্য সন্দেহাতীত। 'ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা' এ দাবির যাথার্থ প্রমাণ করার জন্য তিনি আবশ্যক মৌল নীতি-মালার সন্ধান করেছেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সংগে আল্-কুরআনে বিধৃত মৌল নীতিগুলির ভিত্তিতে ইসলামের সামগ্রিক কাঠামোর উপর আলোকপাত করেছেন। বাংলা ভাষায় এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। বিশেষ করে এ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি, কুরআনের পয়গাম যিনি বুকে ধারণ করেছিলেন এবং সেই পয়গামের বাস্তব নজীর হিসাবে জগতের সামনে নিজেকেই পেশ করেছিলেন, তাঁরই জীবন-চরিতের সারকথা হিসাবে অতুলনীয় মর্যাদার দাবি রাখে।

এ পুস্তকটিতে লেখকের ব্যাপক মৌলিক গবেষণার ও কুরআন-হাদীস-ইতিহাসে গভীর অধ্যয়নের পরিচয় মিলে। হাদীস এবং ইতিহাস থেকে ঘটনা উদ্ধার করে আল্-কুরআনে নবী-চরিতের বিভিন্ন দিকের যেসব প্রত্যক্ষ উল্লেখ ও পরোক্ষ ইংগিত আছে তা অত্যন্ত নিপুণতার সংগে তিনি তুলে ধরেছেন। এর ফলে এ খণ্ডটি একটি অতুলনীয় জীবন-চরিত হয়ে উঠেছে, যার প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হচ্ছে আল্-কুরআন। কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা এধরনের বই লেখা যায় না। লেখক নিজে ইংরেজী, আরবী, বাংলা, ফারসী ইত্যাদি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য অন্যত্র। জনৈক সম্পাদক কুরআন-তত্ত্বের তৃতীয় খণ্ড পাঠ করার পর লিখেছিলেন—"বিশ্বাস ও বিবেকের আলোকে (লেখকের)

www.pathagar.com

হৃদয় আলোকিত। নবীর ভাব না পাইলে নবী-তত্ত্ব কেহ লিখিতে ও বলিতে পারে না। এ বিষয়ে আপনার কৃতিত্ব ঈশ্বর প্রেরিত।" সমালোচক সত্যই বলেছেন, এ জাতীয় পুস্তকের যতই প্রচার হয় ততই মানব জাতির কল্যাণ।

লেখক যে সময় এ পুস্তক রচনা করেছিলেন তখনকার ভাষাশৈলী আজকের দিনে অনেক বদলে গেছে। তা সত্ত্বেও তাঁর রচনা এখনো সুখপাঠ্য, হৃদয়স্পর্শী। এ বিচারে এ গ্রন্থটি আমাদের সাহিত্যে একটি ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা 'মেফতাহুল ফোরকান বা কোরআন-তত্ত্ব' নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উদ্ধার করে একটি উজ্জল দীপ শিখারূপে 'নবী-শ্রেষ্ঠ' নামে এদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন—এর আলোয় আমাদের চলার পথ আলোকিত হবে সন্দেহ নেই।

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

শাহেদ আলী
পরিচালক

www.pathagar.com

مَنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝

আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা

খান সাহেব মৌলভী আমিনুদ্দীন আহমদ

যাঁহার যত্ন ও ভালবাসায় আমি এই
'মহারত্ন' চয়নে সমর্থ হইয়াছি, যাঁহার মধুর
চরিত্র নবীর মহা-আদর্শে প্রদীপ্ত,
তাঁহারই কর-কমলে 'নবীর জীবনী' শোভা পাইবে।
তাঁহার অনুপম 'এহসানের' কৃতজ্ঞতার
চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার হস্তে এই গ্রন্থ অর্পিত হইল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط (৩-২)

হযরত মুহম্মদ মোস্তফা শেষ যুগের রসূল—রাহমাতুল্লিল আ'লামীন। তাঁহার আদর্শ চরিত্র অনুকরণ ও তাঁহার মহাবাণী প্রতিপালন কুরআন মজীদের আদেশ। মুসলমান এই আদেশ লংঘন করিলে মহাপাতকী ও অবজ্ঞা করিলে কাফের হইবে; পক্ষান্তরে জগতের এক-পঞ্চমাংশ লোক প্রগাঢ় ভক্তির সহিত হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে হযরত মুহম্মদ মোস্তফাকে শেষ নবীর মহা গৌরবান্বিত আসন প্রদান করিতেছেন, ইহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা জগদ্‌বাসীর একটি মহা-কর্তব্য। সুতরাং এই আদর্শ মহা-পুরুষের জীবনী পাঠ মুসলমান, অ-মুসলমান সকলেরই কর্তব্য। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তাঁহার পবিত্র জীবনী অজ্ঞ, কুসংস্কারাপন্ন, ইসলাম-বিদ্বেষী লেখকের হিংসাপূর্ণ লেখনী সঞ্চালনের প্রভাবে অনেক স্থলে কদর্যভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

খাতেমুন্-নবীয়্যিন্ হযরত মুহম্মদ মোস্তফার জীবনীর প্রথম সূত্র কুরআন বা আল্লাহ্‌র বাণী, দ্বিতীয় সূত্র বিশুদ্ধ হাদিস বা নবীর মুখ-নিসৃত বাণী এবং তৃতীয় সূত্র সীরাত বা পরবর্তী যুগে লিখিত তাঁহার জীবনচরিত।

কুরআন মজীদে তাঁহার জীবনী-সংক্রান্ত যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, সহস্র মুসলমান ও অ-মুসলমান ঐ সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, এবং বিনা তর্কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার

www.pathagar.com

জীবনীর এই অংশ আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য; ইহার সত্যতা সম্বন্ধে মতান্তর হয় নাই এবং হইতেও পারে না। কোন হাদিসের গ্রন্থে বা সীরাতে ইহার বিপরীত কোন্ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইলে আমরা অবশ্য ইহাকে অবিশ্বাস্য মনে করিব ও দ্বিধাহীন অন্তরে অগ্রাহ্য করিব।

হযরত মুহম্মদ মোস্তফার জীবনীর দ্বিতীয় সূত্র হাদিস। তাঁহার বাণী (قول) ও তাঁহার কার্য (فعل) হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। যে কার্যে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া প্রকারান্তরে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহাকেও তাক্‌রিরী (تقريرى) হাদিস বলা হইয়া থাকে। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে, খলিফা ওমর-বিন্ আবদুল আজিজের খিলাফতের সময়, হাদিস সর্বপ্রথম সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হাদিস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করা আলিম-মণ্ডলীর একটি গুরুতর কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হয় এবং এই কর্তব্য অতি দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন হয়। সূত্র-পরম্পরায় রাবীর (বর্ণনাকারী) ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বস্ততার হিসাবে এই সকল হাদিস প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমত সহীহ—নির্ভুল বা প্রামাণিক, দ্বিতীয়ত হাসান—বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে, তৃতীয়ত জয়ীফ্—দুর্বল অর্থাৎ অপ্রামাণিক। মানুষ কর্তৃক এই শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে; সুতরাং ইহাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। হাদিসের গ্রন্থের মধ্যে মুসলিম ও বোখারী শীর্ষস্থানীয়, এবং এই গ্রন্থদ্বয়ের হাদিসসমূহ বহুকাল হইতে সহীহ্ অর্থাৎ নির্ভুল বলিয়া গৃহীত হইতেছে। সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা দেখা যায়, এই গ্রন্থদ্বয়ের কোন কোন হাদিস বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমরা আশা করি, এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হইবে। মুসলিম ও বোখারী হইতে জানা যায়, হযরত আনাস বলিয়াছেন, "যখন এই আয়াত—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ [১]

'হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা তোমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিও না' নাযিল হয়, ছাবিত-বিন্ কায়েস নামে জনৈক সাহাবী হযরতের খেদমতে হাযির হওয়া বন্ধ করেন, কারণ তাঁহার কণ্ঠ-

১. কুঃ ৪৯—১

www.pathagar.com

স্বর স্বভাবত অত্যন্ত উচ্চ ছিল। কতিপয় দিবস অন্তে নবী-করীম সা'দ-বিন্ মা'জকে ইহার কারণ সন্ধান করিতে বলেন। সা'দ্ তাঁহার গৃহে গমন করিয়া তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাবিত স্বীয় কণ্ঠস্বর ও সদ্য-অবতীর্ণ উপরোক্ত আয়াতের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'দোযখের ভয়ে হযরতের খেদমতে হাযির হইতেছি না।' নবী-করীম ইহা শুনিয়া ছাবিতকে অভয় প্রদান করিলেন।"[২] যদিও এই হাদিস বোখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে সহীহ্ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না ; কারণ, এই আয়াত নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হইয়াছে[৩] এবং সা'দ পঞ্চম হিজরীতে আহ্যাব-যুদ্ধে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।[৪] শ্রুতি-ভ্রম, অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রভাবে এবং জিন্দীকগণের[৫] প্ররোচনায় বহু মাওজু' (موضع)—মিথ্যা হাদিস, হাদিসের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; অবশ্য সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে ইহাদের ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একটি মাওজু' হাদিসের উল্লেখ করিতেছি। সাহাবী আবু হুরায়রা বলিতেছেন—রসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেন,

يكون فى امتى رجل يقال له محمد بن ادريس اضر

على امتى من ابليس و يكون فى امتى رجل يقال له

ابو حنيفة هو سراج امتى ٥

'আমার উম্মতের মধ্যে মুহম্মদ-বিন্ ইদ্রীস (ইমাম শাফেয়ী) নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবে, যে আমার উম্মতের উপর ইব্লীস অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট সাধন করিবে ; পক্ষান্তরে আমার উম্মতের মধ্যে আবু

২. মুসলিম, বোখারী, মিশকাত দ্রষ্টব্য।

৩. বোখারী, ফাতহুল-বারি দ্রষ্টব্য।

৪. মুসলিম, বোখারী, ইসাবা প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৫. জিন্দীক—পারস্যের জেন্দা-বেস্তা ধর্মে বিশ্বাসী যে সকল লোক স্বার্থের বশবর্তী হইয়া কপট হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইসলামকে জগতের চক্ষে হেয় করিতে অগ্রণী ছিল।

www.pathagar.com

হানিফা নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবে, সে আমার উম্মতের প্রদীপ হইবে।"[৬] উভয় ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী' আহ্‌লে সুন্নত জমাতের ইমাম।[৭] প্রাথমিক যুগে যখন এই ইমামদ্বয়ের মত-বিরোধ হেতু তাহাদের গোঁড়া অনুবর্তিগণ মধ্যে অনবরত কলহ-বিবাদ, এমনকি রক্তপাত পর্যন্ত হইতেছিল, তখন ঈদৃশ হাদিসের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন বিশ্বস্ত হাদিসের গ্রন্থে এই হাদিস পরিদৃষ্ট হয় না। নবী-করীম এই প্রসঙ্গে এইমাত্র বলিয়াছেন,

وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ

كِتَابَ اللهِ—

"আমি তোমাদের মধ্যে একটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি,—উহা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ, যদি তোমরা ইহাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর, তোমরা পথভ্রান্ত হইবে না।" অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলাম-বিদ্বেষী লেখকগণ হাদিসের সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া জয়ীফ—অপ্রামাণিক ও মাওজু'—মিথ্যা হাদিসের আনুকূল্যে হযরত মুহম্মদ মোস্তফার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। আমরা যথাস্থানে তাঁহাদের উক্তির প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

হযরত মুহম্মদ মোস্তফার জীবনীর তৃতীয় সূত্র সীরাত বা পরবর্তী যুগে লিখিত তাঁহার জীবনচরিত। খলিফা ওমর-বিন্ আবদুল আজিজের খিলাফতের সময় ইমাম যুহরী[৮] সর্বপ্রথম তাঁহার জীবনী স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিতে অগ্রসর হন এবং তাঁহার শাগরিদ মুহম্মদ-বিন্ ইসহাক একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। আবদুল মালিক ইবনে হিশাম'[৯]

৬. আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ, মাওজুআতে কবির প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৭. চতুর্থ খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮. ইমাম যুহরী তাৎকালিক একজন সুবিখ্যাত আ'লেম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। ৫০ হিজরীতে তাঁহার জন্ম ও ১২৪ হিজরীতে মৃত্যু হয়। খলিফা আবদুল মালিক ও খলিফা ওমর তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন।

৯. আবদুল মালিক হিমিয়ার রাজবংশীয় জনৈক আলেম ছিলেন। ২১৩ হিজরী অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

এই গ্রন্থ কতিপয় টীকাসহ প্রচার করেন। এই গ্রন্থ 'সীরাতে ইব্‌নে হিশাম' নামে খ্যাত। অনন্তর মুহম্মদ-বিন্ ওমর ওয়াকেদী হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে হযরতের জীবনী সম্বন্ধে 'কিতাবুস সীরাত' নামে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইতিহাসের হিসাবে এই গ্রন্থদ্বয়ই প্রাচীনতম; কিন্তু ইব্‌নে ইসহাক ও ওয়াকেদী সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে বহু অমূলক কাহিনী এবং জয়ীফ ও মাওজু হাদিস সন্নিবেশ করিয়া সত্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন নাই। মুহম্মদ-ইব্‌নে সা'দ নামে জনৈক ইতিহাসবিদ ওয়াকেদীর সমসাময়িক ও তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে একখানা বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ 'তাব্‌কাতে ইব্‌নে সা'দ' নামে খ্যাত। এই গ্রন্থের প্রথম তিন খণ্ডে নবী করীমের বিস্তৃত জীবনী আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর আবুজাফর ইবনে জরীর তাবারী [১০] দ্বাদশ খণ্ডে এক বিরাট ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে নবী করীমের জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইতিহাসের হিসাবে এই সকল গ্রন্থই নবী-করীমের জীবনীর প্রধান উপকরণ। তিনি প্রতিমুহূর্তে যাহা করিয়াছেন ও যাহা বলিয়াছেন, হাদিস ও সিরাতের বহু গ্রন্থে ঐ সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বঙ্গবাসী অধিকাংশ লোক আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ। কুরআন, সহীহ্ হাদিস ও মূল ঐতিহাসিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া হযরত মুহম্মদ মোস্তফার সংক্ষিপ্ত জীবনী বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এই দুরূহ কার্যে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, বলিতে পারি না; তবে ইহা দ্বারা ধর্ম-জগতের কণামাত্র উপকার সাধিত হইলে পরিশ্রম সার্থক ও জীবন কৃতার্থ মনে করিব।

আমার বিদ্যা ও জ্ঞান অতি সামান্য; সুতরাং প্রথম সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি থাকা সম্ভবপর। ধর্ম-গ্রন্থ সংশোধন এবং উহার উন্নতিবিধান প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর একটি প্রধান কর্তব্য। বঙ্গীয় সুবিজ্ঞ আলিমমণ্ডলী এই কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে পরবর্তী সংস্করণ ইন্‌শাআল্লাহ্ তায়ালা' সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হইবে।

---

১০. আবু জাফর ইমাম বোখারীর অব্যবহিত পরে ইসলাম জগতে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি স্থানবিশেষে অন্ধের ন্যায় ওয়াকেদীর অনুসরণ করিয়াছেন। ২১০ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

যে সকল সদাশয় ব্যক্তি আমার এই দুরূহ কার্যে সাহায্য করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের জাযা প্রদান করুন, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

ইহার পরবর্তী চতুর্থ খণ্ডে তাবলিগুল-ইসলাম, খিলাফত, মুসলিম সুলতানাত ও জগদ্‌মান্য সূফী মহোদয়গণের ইতিবৃত্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুধীমণ্ডলী ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ঢাকা।
১৬ই অক্টোবর, ১৯২৫

জাহাঁগীর-নগরী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯২৫ সালে কোরআন-তত্ত্বের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৬ সালে এই গ্রন্থ ঢাকার টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক 'প্রাইজ ও লাইব্রেরীর' জন্য লিস্টভুক্ত হয়। ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালীর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বোর্ড-স্কুলের জন্য কোরআন-তত্ত্ব ক্রয় করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় মুসলিম-সমাজ প্রথম সংস্করণ আশাতীত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অবশ্য আমার অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। নানাবিধ প্রতিকূল কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ করিতে বিলম্ব হইয়াছে, আমার এই অনিচ্ছা-কৃত ত্রুটি কেহ গ্রহণ করিবেন না। এই সংস্করণে গ্রন্থের বহুল সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য

হযরত মুহম্মদ মোস্তফার নাম শ্রবণ বা পাঠ মাত্র বলিবে, صلى الله عليه وسلم "সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম্"—আল্লাহ্ তাঁহার উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

হযরত আদম (Adam), হযরত ইবরাহীম (Abraham), হযরত মূসা (Moses), হযরত ঈসা (Jesus) প্রভৃতি নবী ও রসূলগণের নামের সঙ্গে বলিবে, عليه السلام "আলায়হিস্ সালাম"—তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী প্রভৃতি রসূলুল্লাহ্র প্রিয় শিষ্য ও সাহাবীগণের নামের সঙ্গে বলিবে, رضى الله عنه "রাদিয়াল্লাহু আন্হু" —আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকুন।

রমণীকুল-শ্রেষ্ঠা হযরত খাদিজা, হযরত আয়শা, হযরত ফাতেমা যাহ্রা প্রভৃতির নামের সঙ্গে বলিবে, رضى الله عنها "রাদিয়াল্লাহু আনহা"—আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন।

কুরআন শব্দের ধাতুগত অর্থ পঠনীয় গ্রন্থ। কুরআন শব্দ দ্বারা কালামুল্লাহ্ বা ঈশ্বর-বাণী বুঝিতে হইবে। কুরআন মজীদের প্রত্যেক বাক্যকে 'আয়াত', কতিপয় বাক্যের সমষ্টিকে 'রুকু', প্রত্যেক অধ্যায়কে 'সূরা' এবং সমত্রিংশদ্ ভাগের প্রত্যেক ভাগকে 'পারা' বলা হইয়া থাকে। কুরআন মজীদ হইতে উদ্ধৃত অংশের অধ্যায় ও রুকু এইরূপে দেখান হইয়াছে, কু: ৫—৪ অর্থাৎ কুরআন মজীদের পঞ্চম সূরা নায়দার চতুর্থ রুকু।

হযরত মূসা, হযরত ঈসা, হযরত মুহম্মদ মোস্তফা প্রভৃতি নবী (আল্লাহ্র মনোনীত তত্ত্ববাহক) ও রসূলগণ (আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষ) যে সনাতন

পুংলিঙ্গ একবচনে 'হু' ও স্ত্রীলিঙ্গ একবচনে 'হা' এবং দ্বিবচনে 'হু' ও 'হা' স্থলে 'হুমা' ও বহুবচনে 'হুম্' বলিতে হইবে।

www.pathagar.com

ধর্ম যুগে যুগে প্রচার করিয়াছেন, উহার নাম ইসলাম। পূর্বযুগের ইসলাম ও মুহম্মদী ইসলামে মূলত কোন পার্থক্য না থাকিলেও ইহার বিকাশে পার্থক্য আছে। প্রাচীন ইসলাম ক্রমে বর্ধিষ্ণু হইয়া হযরত মুহম্মদ মোস্তফার নবুয়তে পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। এই পূর্ণাঙ্গ ইসলামে বিশ্বাসীকে 'মুমিন্', অবিশ্বাসীকে 'কাফের', বহু-ঈশ্বরবাদীকে 'মুশ্‌রিক', কপটবিশ্বাসীকে 'মুনাফিক' ও এই ধর্ম গ্রহণকারীকে 'মুসলিম' বলা হইয়া থাকে। ايمان ঈমান বা পূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা এই ধর্মের সূচনা, عمال صالحة। (আমালে সালেহা) বা সৎকর্মাবলী দ্বারা ইহার সাধনা এবং علم (ইল্‌ম্) বা অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা ইহার পরিপুষ্টি হইয়া থাকে।

হযরত মুহম্মদ মোস্তফার নীতি-বাণীকে حديث (হাদিস) ও এই হাদিসে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতকে محدث (মুহাদ্দিস) এবং কুরআন মজীদের ব্যাখ্যাকে تفسير তাফ্‌সীর ও ব্যাখ্যাকারীকে مفسر মুফাস্‌সির বলা হইয়া থাকে।

আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ কোন ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। অথর্ববেদে আল্লাহ্ শব্দের প্রতিশব্দ 'অল্লো' এবং বাইবেলে 'ইলাহ্' ব্যবহৃত হইয়াছে। God বা ঈশ্বর শব্দের ন্যায় আল্লাহ্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বা বহুবচন নাই। God (ঈশ্বর বা খোদা) শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। আল্লাহ্ শব্দে সেই অনাদি, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য, সর্বশক্তিমান মহাপ্রভুকে বুঝিতে হইবে যাঁহার মধ্যে সর্ববিধ পূর্ণ গুণাবলী (সিফাতে-কামিলা) অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান আছে। এই আল্লাহ্ শব্দ কোন সময় ও কোন অবস্থায় অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। আল্লাহ্ তায়ালার 'সিফাতে-কামিলার' মধ্যে রাব্ব, রহ্‌মান ও রহীম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।

রাব্ব্ শব্দের প্রতিশব্দও অন্য কোন ভাষায় নাই। কুরআন মজীদে প্রধানত প্রার্থনা স্থলে রাব্ব্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দে অস্তিত্ব প্রদান, প্রতিপালন এবং লক্ষ্যপথ প্রদর্শন-ভাব নিহিত আছে। রাব্ব্ শব্দে সেই মহাপালনকর্তাকে বুঝিতে হইবে যিনি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন এবং ক্রমোন্নতি প্রদান করিয়া সকলের জন্য চরম লক্ষ্য (Goal) লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রহমান—অসীম দাতা ; রহীম—করুণাময়। রহমান ও রহীম শব্দদ্বয় رحم ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই উভয় শব্দই 'রহমত' অর্থাৎ

www.pathagar.com

দান ও করুণা পরিজ্ঞাপক; কিন্তু 'ওজনের' তারতম্য হেতু রহমান শব্দে এই মহাগুণের অত্যধিক প্রাচুর্য ও রহীম শব্দে উহার পুনঃপুন বিকাশ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আল্লাহ্ তায়ালাই একমাত্র রহমান, কারণ তাঁহার দান ও করুণা অসীম, পাত্রাপাত্র ভেদ নাই, তাঁহার প্রাকৃতিক দানে সকলেই সমভাবে অধিকারী। তিনি রহীম, কারণ তাঁহার করুণা কর্মের অনুপাতে অনেক অধিক।

তওহীদ—একেশ্বরবাদ।

তওহীদ-বাণী—আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদমূলক বাণী।

মুশ্‌রিক—বহু-ঈশ্বরবাদী

নবী—(Prophet), আল্লাহ্‌র মনোনীত তত্ত্ববাহক।

নবুয়ত—(Prophethood), নবীর আসন।

নবী-করীম—মহানুভব নবী।

রসূল—Apostle, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ।

রসূলুল্লাহ্—আল্লাহ্‌র রসূল অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ।

হযরত—শ্রদ্ধাস্পদ।

মোস্তফা—মক্‌বুল অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে গৃহীত।

সাহাবা—রসূলুল্লাহ্‌র সহচরগণ।

খলিফা-চতুষ্টয়—হযরত আবুকর সিদ্দীক, হযরত ওমর, হযরত ওছমান ও হযরত আলী।

ফেরেশ্‌তা—Angel, ঈশ্বরের দূত।

ইমাম—ধর্ম-নেতা।

কিয়ামত—Resurrection, পুনরুত্থানের দিন।

দরূদ—শুভাশীষ।

শহীদ—Martyr, ধর্মপথে নিহত ব্যক্তি।

শাহাদত—Martyrdom, শহীদের মর্যাদা লাভ।

বনী বা বনু—বংশধর।

বনী ইসমাঈল—ইসমাঈলের বংশধর।

কোরা—পাশা।

রহমত—করুণা।

তাহেরা—পবিত্রা।

আল্-আমীন—The Trusty, বিশ্বাস-ভাজন।

মুরাকিবা—নির্জন সাধনা।

রুকু—প্রণত হওয়া।

সিজদা—সাষ্টাঙ্গে আভূমি প্রণিপাত।

জিবরাইল—Gabriel, নামুসে-আক্‌বার, জিবরাইল নামে স্বর্গীয় দূত।

ওহি—Inspiration, প্রত্যাদেশ।

খাদেম—সেবক, ভৃত্য।

মুয়াযযিন—আযান দ্বারা নমাযে আহ্বানকারী।

হারম্-শরীফ—পবিত্র কা'বা-প্রাঙ্গণ।

শাফাআত—মুক্তির প্রার্থনা।

তেলাওয়াতের সিজদা—কুরআন পাঠ কালে বিশেষ সিজদা।

www.pathagar.com

শয়তান—Satan।

হিজরত—ধর্মের জন্য জন্মভূমি ত্যাগ।

ইহ্‌রাম—হজ্জের জন্য বিশেষ পোশাক।

জানাযার নমায—মৃত ব্যক্তির মুক্তির জন্য বিশেষ নমায।

কসম—শপথ। ওফাত—মৃত্যু।

আলিম—ইসলামের ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞানী ব্যক্তি।

উম্মুল্-মুমিনীন—মুসলিমগণের জননী।

খেদমত—সেবা।

কদম-বুসি—পদ-চুম্বন।

দস্ত-বুসি—হস্ত চুম্বন।

বাইয়াত গ্রহণ—হস্ত ধারণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ বা অঙ্গীকার প্রদান।

আজম—আরবের বহির্ভূত দেশ।

রেজামন্দী—প্রসন্নতা।

জান্নাত—স্বর্গোদ্যান,

নিয়া'মত—Blessing, অনুকম্পা।

রওজা-শরীফ—সমাধি-উদ্যান।

মাজার—কবর, সমাধিস্থান।

দেন-মোহর—বিবাহের পূর্বে পত্নীকে ইসলামীয় ধর্ম-বিধান মতে যে অর্থ দান বা দানের অঙ্গীকার করা হয়।

সদকা—দান।

তাবেদারী—অনুসরণ।

জেহাদ—ধর্মযুদ্ধ।

কিবলাহ্—উপাসনার দিক।

গজব্—রোষ।

রাবি—Narrator, বর্ণনাকারী।

গনিমত—যুদ্ধে প্রাপ্ত দ্রব্য।

এতিম—Orphan, পিতৃহীন বালক-বালিকা।

কওম—People, সম্প্রদায়।

নূর—জ্যোতি।

কুরবান—আত্মবলি।

তালাক—Divorce, স্ত্রীবর্জন।

খোতবাহ্—ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা।

নকীবে-ইসলাম—ইসলামের প্রতিনিধি।

তাওয়াফ—প্রদক্ষিণ।

লাব্বায়কা—[হে আল্লাহ্], তোমার সম্মুখে হাযির।

আমীর—Chief, শাসনকর্তা।

সায়ী' করা—দৌড়ান।

গোসল—অবগাহন।

ই'তেকাফ্—গোশানেশীন্ হওয়া, রমযান মাসে কতিপয় নির্ধারিত দিন সমগ্র দিবা-রজনী উপাসনার জন্য মসজিদে অবস্থিতি।

জিয়ারত—Visitation, দর্শন।

জগতের রহমত—জগতের কল্যাণ অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ মোস্তফা।

মাদফুন—কবরস্থ, সমাহিত।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়—শেষ রসূলের আবির্ভাব

আরব উপদ্বীপ ১
আরবের অধিবাসী :
আরাবুল-বায়িদাহ বা আদ ও সামুদ বংশধর ২
আরাবুল-আরিবা বা বনী আমালিকা ও বনী কাহ্‌তান ২
মুস্তা'আরিবা বা বনী ইসমাঈল :
মক্কা ৩
কা'বা ৪
কা'বার মুতাওয়াল্লী ৪
কা'বায় প্রতিমা ৪
কোরেশ ৫
কুসাই ৫
আবদুদ্দার ৫
আব্‌দ শামস ৬
হাশিম ৬
বনী হাশিম ও বনী উমাইয়া ৬
শায়বা ৭
মুত্তালিব ৭
আবদুল মুত্তালিব ৭
আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ ৮
আবদুল্লাহ ৮
আমিনা খাতুনের সহিত আবদুল্লাহ্‌র বিবাহ ৯
আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু ৯
কা'বা আক্রমণ ১০
বনী ইসমাঈলের প্রাকৃতিক তত্ত্ব ১১
হযরত মুহম্মদ মোস্তফার জন্ম ১৪
ভবিষ্যদ্বাণী ১৯
মুহম্মদ মোস্তফার বংশাবলী ২৩
শৈশব ২৩
সিনা-চাক বা বক্ষ-বিদারণ ২৪
কল্পনা-প্রসূত হযরতের মূর্ছা রোগ ২৬
মাতৃ-বিয়োগ ২৮
পিতামহ বিয়োগ ২৮
বাল্য-জীবন ২৯
সিরিয়ায় গমন ২৯
যৌবন :
ফিজারের যুদ্ধ ২৯
শান্তি-সংঘ গঠন ৩০
কা'বা পুনর্নির্মাণ ৩১
জ্ঞান বিকাশ ৩৩
খাদিজা খাতুন ৩৪
বাণিজ্য যাত্রা ৩৫
বিবাহ ৩৫
সন্তান-সন্ততি ৩৬
দাসত্ব প্রথা অননুমোদন ৩৭

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়—নবুয়ত লাভ

একনিষ্ঠ ধ্যান ৩৮
প্রথম ওহী বা প্রত্যাদেশ ৩৯
ওহী বা প্রত্যাদেশের গূঢ় তত্ত্ব ৪৪
সূরাতুস্-সালাত বা প্রার্থনা-বাণী ৪৭
তওহীদবাদ ঘোষণা ৫১
নীরব প্রচার ও ইসলাম বিস্তার ৫৩

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম প্রচার ৫৮
ইসলাম-বিদ্বেষ ৫৯
মুসলিম নির্যাতন ৬৩
হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ ৬৬
আবিসিনিয়ায় হিজরত ৬৭
ইসলামের বিজয়-বাণী ৭১
প্রলোভন ৭২
লবীদের ইসলাম গ্রহণ ৭৪
হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ ৭৫
ভ্রান্ত জনশ্রুতি ও সূরা নজম পাঠ ৭৮
সমাজ-চ্যুতি ৮৭
আবু তালিব ও হযরত খাদিজা খাতুনের ইহসংসার ত্যাগ ৮৯
পুনর্বিবাহ ৯১
তায়েফে ইসলাম প্রচার ৯৪
জিন সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ ৯৭
মে'রাজ ৯৮
হযরত মুহম্মদ মোস্তফার শ্রেষ্ঠত্ব ১০২
তোফায়িলের ইসলাম গ্রহণ ১০৭
আবু মূসা আশআ'রীর ইসলাম গ্রহণ ১০৮
জিমাদের ইসলাম গ্রহণ ১০৮
আবু জরের ইসলাম গ্রহণ ১০৯

চতুর্থ অধ্যায়

মদীনায় ইসলাম বিস্তার ও হিজরত ১১১

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

রাজশক্তির সূচনা	১২৫	নবীর বাসগৃহ নির্মাণ	১৩৩
আনসার	১২৫	আসহাবে সুফ্‌ফাহ	১৩৪
মুনাফিক সম্প্রদায়	১২৭	আযান	১৩৫
মদীনার ইহুদী	১২৯	সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণ	১৩৬
মসজিদুন-নবী নির্মাণ	১৩১		

ষষ্ঠ অধ্যায়—জেহাদ আরম্ভ

কেবলাহ পরিবর্তন	১৩৯	বন্দী মুক্তি	১৫৯
ইহুদী-বিদ্বেষ	১৪১	হযরত আব্বাসের ইসলাম গ্রহণ	১৬০
কোরেশের প্রকাশ্য শত্রুতা	১৪২	আবুল আ'সের ইসলাম গ্রহণ	১৬০
সন্ধি সংস্থাপন জন্য অভিযান	১৪৪	বদর যুদ্ধে ফেরেশতার আগমন	১৬২
সংবাদ সংগ্রহের জন্য অভিযান	১৪৫	গনিমত ও আল-ফায় বিভাগ	১৬৫
নাখলার অভিযান	১৪৬	ওমায়ের-বিন ওয়াহাবের ইসলাম গ্রহণ	১৬৭
বদর যুদ্ধ	১৪৮	বদর যুদ্ধের গূঢ় তত্ত্ব	১৬৮
বদর যুদ্ধে অভিযান	১৫২	সাবীকের অভিযান	১৭৫
বিজয় বাণী	১৫২	হযরত ফাতিমা জাহ্‌রার বিবাহ	১৭৬
বিজয়	১৫৫		
বন্দীর প্রতি সদয় ব্যবহার	১৫৮		
বিচার	১৫৯		

সপ্তম অধ্যায়

পৌত্তলিক শক্তি বিলোপ	১৭৭	সাম্প্রদায়িক শত্রুতা	১৮৮
ওহোদ যুদ্ধ	১৭৭	সালমার অভিযান	১৮৮
হামরাউল আসাদে অভিযান	১৮৫	ইবনে আনিসের অভিযান	১৮৮
বদরের দ্বিতীয় অভিযান	১৮৭	বীর মা'উনার হত্যা	১৮৯

www.pathagar.com

রাজীর হত্যা ১৮৯
জাতুর-রোকার অভিযান ১৯১
দুমাতুল জন্দলে অভিযান ১৯২
মোরায়সীর যুদ্ধ ১৯২
হযরত জুয়ায়রিয়াকে পত্নীত্বে বরণ ১৯২
আবদুল্লাহ্-বিন উবাই'র শত্রুতা ১৯৩
হযরত আয়েশার প্রতি কলঙ্কারোপ ১৯৪
বিজয়সূচক আশ্বাস-বাণী ১৯৫
আহযাব যুদ্ধ ১৯৫
তালাক-প্রদত্তা জয়নাবকে পত্নীত্বে বরণ ২০২

অষ্টম অধ্যায়

ইহুদী-শক্তি বিলোপ ২০৭
বনী কাইনুকার বিদ্রোহাচরণ ও নির্বাসন ২১০
বনী নজীরের বিদ্রোহাচরণ ও নির্বাসন ২১১
বনী কোরায়জার শোচনীয় পরিণাম ২১৫

নবম অধ্যায়—কোরেশের সহিত সন্ধি

ওমরার জন্য মদীনা ত্যাগ ২২০
কোরেশের সহিত সন্ধির প্রস্তাব ২২১
বাইয়াতুর-রিজওয়ান ২২২
হুদায়বিয়ার সন্ধি ২২৩
আবু জন্দাল ও সন্ধি-শর্ত ২২৫
বিজয়-বাণী ২২৫
খালিদ ও আমরের ইসলাম গ্রহণ ২২৭
আবু বসীর ও সন্ধির পঞ্চম শর্ত প্রত্যাহার ২২৮
ওমরাতুল কাজা উদ্‌যাপন ২২৮

দশম অধ্যায়

নৃপতিগণকে ইসলামে আহ্বান ২৩০
রোম সম্রাটকে ইসলামে আহ্বান ২৩১
পারস্য সম্রাটকে ইসলামে আহ্বান ২৩৫
পারস্যের শাসনকর্তা ও দূতদ্বয়ের ইসলাম গ্রহণ ২৩৭
রাজা নজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ ২৩৮
উম্মে হাবীবাকে পত্নীত্বে গ্রহণ ২৩৮
মিসরাধিপতিকে ইসলামে আহ্বান ২৩৮

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

রাজ্য লাভ ২৪১
মদীনা আক্রমণের প্রয়াস ২৪২
জেহাদ ঘোষণা ২৪৩
হযরত সফিয়্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ ২৪৬
হযরতকে হত্যা করার প্রয়াস ২৪৮
ওয়াদী-উল-কারায় অভিযান ২৪৮
মুতায় অভিযান ২৪৯
মক্কা জয় ২৫১
আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ ২৫৩
হোনায়নের যুদ্ধ ২৬১
তায়েফ অবরোধ ২৬৪
তাবুকে অভিযান ২৬৬

দ্বাদশ অধ্যায়

আরবে ইসলাম বিস্তার ২৬৮
হানিফী সম্প্রদায়ে ইসলাম ২৬৮
দায়ুছ সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ ২৬৯
আশ্আ'র সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ ২৭০
আজদে শানওয়া সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ ২৭০
গিফার সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ ২৭১
আসলামা সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ ২৭২
মুজায়না, আশজা'ও জুহায়না সম্পদায়ের ইসলাম গ্রহণ ২৭২
তায়েফে ইসলাম ২৭৪
ইয়ামনে ইসলাম ২৭৬
পারসিকগণের ইসলাম গ্রহণ ২৭৭
হেমিয়ারে ইসলাম ২৭৮
হামদান সম্প্রদায়ে ইসলাম ২৭৮
মজহাজ সম্প্রদায়ে ইসলাম ২৭৯
বনী তাঈ সম্প্রদায়ে ইসলাম ২৭৯
হাদরামাউতে ইসলাম ২৮০
আম্মানে ইসলাম ২৮১
বাহরায়েনে ইসলাম ২৮১
আবদুল-কায়েস সম্প্রদায়ে ইসলাম ২৮১
বনু তামীম সম্প্রদায়ে ইসলাম ২৮২
বাহরায়েনের শাসনকর্তার ইসলাম গ্রহণ ২৮২
বনু সা'দ সম্প্রদায়ে ইসলাম ২৮২
বনু আসাদ সম্প্রদায়ে ইসলাম ২৮৩
বনু ফাজারাহ্ সম্প্রদায়ে ইসলাম ২৮৩

www.pathagar.com

বনু আমের সম্প্রদায়ে ইসলাম	২৮৩	মদীনার খ্রীস্টীয় প্রতিনিধি-গণের আগমন	২৮৬
বনী জাযিমা সম্প্রদায়ে ইসলাম	২৮৪	খ্রীস্টীয় শাসনকর্তা ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণ	২৮৯
কবি কা'বের ইসলাম গ্রহণ	২৮৪	মদীনার মুনাফিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লোপ	২৯২
নাজরানে ইসলাম	২৮৬	মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লোপ	২৯৩
বনু হারিছ্-বিন কা'ব সম্প্রদায়ে ইসলাম	২৮৬		

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জীবন-ব্রত সমাপন	২৯৯	ওফাত বা ইহধাম ত্যাগ	৩০৫
হজ্জাতুল-বিদা	৩০০		

চতুর্দশ অধ্যায়—হযরতের আদর্শ চরিত্র

বিবাহ	৩১১	চরিত্র মাধুর্য	৩১৯
আকৃতি	৩১৮	সমালোচনা	৩৬৫

www.pathagar.com

নবী-শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র